প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

সপ্তম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০১৭

সম্পাদক

মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক

খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ

নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ

অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক

খলিলউল্লাহ্ ও গোলাম মুস্তাফা

দাম : ৫০ টাকা

ISSN 2310-2403

ওয়েবসাইট : www.protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-March Issue, 2017; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

সমাজ

বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল? ৯
আকবর আলি খান

অর্থনীতি

আমার অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠা ২৯
নুরুল ইসলাম

সমাজ

বাংলাদেশে জ্ঞান উৎপাদন : সিভিল সমাজের কতিপয় সমস্যা ৫৩
ম্যাথিল্ড ম্যাইটরট

পর্যালোচনা নিবন্ধ

ইতিহাসের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৭
রাশেদ রাহম

পরিবেশ

বাদাবনের বিজ্ঞান ১২৫
পাভেল পার্থ

বই আলোচনা

পুঁজিবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তন ১৭৩
খলিলউল্লাহ্

প্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনার তালিকা ১৮৬

লেখক পরিচিতি ১৯১



যেকোনো কার্যকর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সিভিল সমাজ একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পৃথিবীতে যে কয়টি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র আজ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, সে সব কটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং ন্যায়ের শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই যুক্তির রেশ ধরেই গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রগুলোতে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ, কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সম্পর্কে সরকারের বৈরী মনোভাব প্রতিফলিত হয়। সিভিল সমাজকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আবার সিভিল সমাজ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে, এমনটাও বলা যাবে না। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে সিভিল সমাজের এমন সম্পর্ক কার্যকর গণতন্ত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। রাষ্ট্র ও বাজার—এই দুটি উপাদানের মধ্যে সিভিল সমাজের যে ভূমিকা রাখার কথা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিভিল সমাজ তা কতটুকু করতে পেরেছে তা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলাদেশ কার্যকর গণতন্ত্রে পৌঁছাতে পারল না। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অন্যান্য উপাদানের মতো সিভিল সমাজের ভূমিকারও মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় আমরা বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর বিকাশ, কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক আলোচনায় সচেষ্ট হয়েছি।

প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছেন আকবর আলি খান। প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?' প্রবন্ধটি লেখকের সম্প্রতি প্রথমা প্রকাশন হতে প্রকাশিত বই *অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি (২০১৭)* থেকে নেওয়া হয়েছে। যারা বইটি পড়েননি তাঁদের আগ্রহী করতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি ছাপা হল। এই প্রবন্ধের শুরুতে লেখক সিভিল সমাজের সংজ্ঞা এবং তাত্ত্বিক দিকগুলো আলোচনা করেছেন। এরপর লেখক বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের মতে,

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সিভিল সমাজ সংগঠনের মতো সংগঠন ঠিকই আছে, কিন্তু এসব রাষ্ট্রে তা একটি ধারণামাত্র। সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো তাদের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারে না। বিদেশি অর্থের ওপর নির্ভরশীলতা সিভিল সমাজের যথাযথ ভূমিকা পালনে বাধা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সংগঠনের বিকল্প হতে পারে কি না, লেখক সেই প্রশ্নও তুলেছেন। লেখকের মতে, সিভিল সমাজ কখনোই রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিকল্প হতে পারে না। গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সিভিল সমাজ সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে 'দুই অর্থনীতি' তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি। এই তত্ত্বপ্রণেতাদের অন্যতম হলেন অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম। তিনি দীর্ঘকাল ধরে কাজ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায়। কাজ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান উন্নয়ন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা কমিশন এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থায়। বর্তমানে তিনি ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইমেরিটাস ফেলো। এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনে নানা প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর নীতি ও ভূমিকা তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এই বৈচিত্র্যময় কাজের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। *প্রতিচিন্তার* বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধটির শিরোনাম 'আমার অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠা'। মূল প্রবন্ধটি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জার্নালে ইংরেজিতে ছাপা হয়েছিল। প্রতিচিন্তার উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য প্রবীণ এই অর্থনীতিবিদের পেশাজীবনের গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক আমরা এই লেখাটি প্রতিচিন্তার পাঠকদের জন্য ছেপেছি।

জাতিগঠন, তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা এবং রুচি তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন জাতির ইতিহাস নির্মাণে আঁতুড়ঘরের কাজ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কথাগুলো একটা সময় পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই সত্য ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় সব জাতীয় আন্দোলনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নেতৃত্বের জোগান দিয়েছিল, সরবরাহ করেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক মালমসলা। একইভাবে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনগুলোতেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু একটা সময়ে এসে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু করল এবং এই আলোচনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হালহকিকতও বাদ পড়ল না। বিশেষত গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান এবং সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেহাল দশা আজ সর্বজনবিদিত। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে যে নিয়ামকগুলো কাজ করেছে, সেগুলো উদ্‌ঘাটন করা না গেলে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাওয়ার পথ প্রায় রুদ্ধ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ, গবেষণা, নীতি প্রণয়নে এগুলোর প্রভাব ইত্যাদি

বিষয় নিয়ে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বাংলাদেশে জ্ঞান উৎপাদন : সিভিল সমাজের কতিপয় সমস্যা'। মূল প্রবন্ধটির লেখক ম্যাথিল্ড ম্যাইটরট। এই প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশে নীতি প্রণয়ন এবং জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। লেখকের মতে, অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদের ঘাটতি এবং থিংক ট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ফলে সেগুলোর বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এরপরের প্রবন্ধটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর প্রথম উপাচার্য ফিলিপ হার্টগকেন্দ্রিক। রাশেদ রাহম লিখিত প্রবন্ধটির শিরোনাম 'ইতিহাসের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। ২০১৬ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তিনটি বইয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি বইয়ের লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা* এবং *স্যার ফিলিপ হার্টগ*। অন্যটি হচ্ছে ইমতিয়াজ আহমেদ এবং ইফতেখার ইকবাল সম্পাদিত বই *ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা : মেকিং, আনমেকিং, রিমেকিং*। এই প্রবন্ধটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, এর বিকাশ, শিক্ষা ও গবেষণার মান, ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি, আবাসন ব্যবস্থাসহ একটি সামগ্রিক আলোচনা উঠে এসেছে।

রাজনৈতিক বিতর্কে সম্প্রতি সুন্দরবন নতুন করে বিশেষ স্থান পেয়েছে। বিশ্বঐতিহ্যের অংশ ও বিশ্বের বৃহত্তম শ্বাসমূলীয় এই বনের কাছাকাছি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত। বিদুৎকেন্দ্র নির্মাণ হলে ক্ষতি হবে কি হবে না বা হলে কতটুকু হবে সে বিতর্ক চলমান রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, এর প্রাণপ্রকৃতি এবং বনের ওপর নির্ভরশীল মানুষকে নিয়ে যে হাজার বছরের বাস্তসংস্থান বিদ্যমান, সে সম্পর্কে সেখানকার স্থানীয় মানুষের জ্ঞান ও ধারণা জানা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত জ্ঞানভাষ্যে এই জ্ঞান অনুপস্থিত। কিন্তু সুন্দরবনকে ঘিরে যেকোনো সিদ্ধান্ত স্থানীয় মানুষের জ্ঞানকে বিবেচনায় রেখে নেওয়া দরকার। মানুষ ও অসংখ্য প্রাণপ্রকৃতি নিয়ে যে জটিল সম্পর্কের আধার এই বন, তা হাজার বছর ধরে তিলে তিলে অর্জিত লোকায়ত জ্ঞানের আলোকেই সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব। *প্রতিচিন্তা*র পাঠকদের জন্য গবেষক পাভেল পার্থ লোকায়ত জ্ঞানের আলোকে সেই জটিল সম্পর্ক তুলে আনার চেষ্টা করেছেন । তাঁর লেখার শিরোনাম 'বাদাবনের বিজ্ঞান'।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংকট জলবায়ু পরিবর্তন। এর ভয়াবহ প্রভাব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সংকট মোকাবিলার জন্য দরকার সমন্বিত বৈশ্বিক প্রয়াস। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উগ্র বাজারভিত্তিক অর্থনীতির চালকেরা বড় বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মুনাফা কমে যাওয়ার আশঙ্কায় বড় কার্বন নির্গমনকারী কোম্পানিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা স্বীকার করতে চাইছে না। রাজনৈতিক অর্থনীতিই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক প্রয়াস গ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক নাওমি ক্লাইনের *দিস চেঞ্জেস এভরিথিং : ক্যাপিটালিজম ভার্সেস দ্য ক্লাইমেট* বইটি বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগিয়েছে। *প্রতিচিন্তা*র পাঠকদের জন্য এবারের বই আলোচনা অংশে নওমি ক্লাইনের এই বইটি আলোচনা করেছেন খলিলউল্লাহ্।

খাতি
সমাজ
চিন্তা

বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?

আকবর আলি খান

১. সিভিল সমাজের সংজ্ঞা ও তত্ত্ব

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে একটি পরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তির নাম ছিল 'Holy Roman Empire'. কিন্তু আসলে তা রোমান ছিল না (কেননা, একই সঙ্গে পনেরো শতক পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বেঁচে ছিল), প্রকৃত অর্থে এটি সাম্রাজ্য ছিল না (এ সাম্রাজ্যে অনেক স্বশাসিত রাজ্য ছিল) এবং এ সাম্রাজ্য মোটেও 'পবিত্র' ছিল না (সব খ্রিষ্টানের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না)। ইংরেজরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নাম দিয়েছিল 'Indian Civil Service'। আসলে তা ভারতীয় ছিল না (বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন ইংরেজ), মোটেও 'সিভিল' ছিল না (তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন দুর্বিনীত), তাঁদের মধ্যে সার্ভিস বা সেবার ছিটেফোঁটাও ছিল না (তাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক)। সম্প্রতি অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ইংরেজি 'সিভিল সোসাইটি'র বাংলা পরিভাষা করেছেন 'সুশীল সমাজ'। 'হলি রোমান এম্পায়ার' ও 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে'র মতো অবস্থা সুশীল সমাজেরও। প্রচলিত অর্থে সুশীল সমাজ মোটেও সুশীল নয় (সৎ ও ভদ্র নয়) এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ নয়। সুশীল সমাজ সিভিল সোসাইটির সঠিক পরিভাষা নয়। ইংরেজি 'সিভিল' শব্দের দ্যোতনা সুশীল শব্দে প্রতিফলিত হয় না। তাই এ প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটির পরিভাষা হিসেবে 'সিভিল সমাজ' ব্যবহার করা হয়েছে। যদি বাংলা একাডেমির নামের সঙ্গে ইংরেজি 'একাডেমি' শব্দের ব্যবহার জায়েজ হয়, তবে সিভিল সমাজও সিভিল সোসাইটির পরিভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য দেন দার্শনিক হেগেল। তিনি মনে করতেন, আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার এত শক্তিশালী হয়ে পড়ছে যে এখানে ব্যক্তির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে

যাচ্ছে। তাই ব্যক্তিরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। হেগেল মনে করতেন, সিভিল সোসাইটি যেমন রাষ্ট্রের খবরদারি করে, রাষ্ট্রেরও তেমনি সিভিল সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে বাজারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? ডানপন্থীরা দাবি করেন যে যেহেতু বাজার ব্যক্তিগত অধিকারের সমর্থক, সেহেতু বাজারসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে এই বক্তব্যের সমালোচকেরা দাবি করেন যে বাজারও ব্যক্তিকে শোষণ ও বঞ্চনা করে, বাজারের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিকে লড়তে হয়। বণিকদের সংগঠন সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না, সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। তাই বণিকদের সংগঠন সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

সিভিল সমাজের আন্তর্জাতিক সংগঠন Civicus World Alliance for Citizen Participation সিভিল সমাজের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে : 'The arena outside of the family, the state and market where people associate to advance common interests.' পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে গির্জার মতো ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, বিতর্ক সমিতি, স্বাধীন গণমাধ্যম, উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান (ইংরেজিতে যাকে বলা হয় একাডেমিয়া), সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের সংগঠন, তৃণমূল সমাজসেবী বা সমবায় সংগঠন, পেশাভিত্তিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও, লিঙ্গ ও পরিবেশসহ বিভিন্ন দাবিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল। অবশ্য রাজনৈতিক দলকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড সিভিল সমাজের বাইরে থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। এই মতবাদের সমালোচকেরা বলেন, সিভিল সমাজে পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ও লেনদেন ঘটে। এ ধরনের সম্পর্কের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সিভিল সমাজের সংজ্ঞা নির্ধারণের একটি বড় অসুবিধা হলো, 'সিভিল সমাজ' নামক মোড়কে একই সঙ্গে তিনটি ধারণা রয়েছে। মাইকেল এডওয়ার্ডের ভাষায়, সিভিল সমাজ হচ্ছে একই সঙ্গে লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের উপায় এবং লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে জনগণের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও সম্পর্ক স্থাপনের কাঠামো।[১] সিভিল

সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক সম-অধিকার ও বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার নিষ্পত্তি করা। সিভিল সমাজ বিশ্বাস করে, ভালো সরকার থাকলেও দেশে সিভিল সমাজের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ভালো সরকার কখনো সৎ প্রতিবেশীর বিকল্প হতে পারে না। সমাজের সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে। প্রতিবেশীদের মধ্যেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নীরা চন্দক লিখছেন,

> 'The concept of civil society highlighted one basic precondition of democracy: state power has to be monitored, engaged with and rendered accountable through intentional and engaged citizen action.'[২]

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য একই ধরনের নয়। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। তাই এদের মতবিনিময় ও পারস্পরিক লেনদেনের জন্য একটি কাঠামো দরকার। এই কাঠামোকে 'Public Sphere' বা গণক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র, বাজার আর পরিবারের বাইরে যে সমাজ রয়েছে, তা পুরোটিই গণক্ষেত্র। এই গণক্ষেত্রের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এর আগে ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল সীমিত। আঠারো শতকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর শহরগুলোতে মোড়ে মোড়ে নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য কফি হাউস গড়ে ওঠে। এসব দোকানে নিম্নমধ্যবিত্তরা কফি খেতেন আর আড্ডা দিতেন। এই কফি হাউসগুলোতে মানুষের মধ্যে মতবিনিময় শুরু হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লাব গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মাধ্যমে তর্কবিতর্ক হয় আরও জমজমাট। গণক্ষেত্র হয়ে ওঠে একটি রঙ্গমঞ্চ, যেখানে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিভিল সমাজ তত্ত্বের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক আলেকসিস দ্য তোকভিল। তিনি সরাসরি সিভিল সমাজ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেননি, তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটির মৌলিক উপাদান। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তোকভিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে সারা দেশে ছড়ানো স্থানীয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলো। এসব সংগঠনই রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোকভিল মনে করতেন, ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়। অনেক সময় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকার হরণ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিকে তিনি

সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলো এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধের জন্য অত্যাবশ্যক। তোকভিল তাই মনে করতেন তৃণমূল জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি। তাঁর বিশ্লেষণে সমাজে দুই ধরনের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো Hegemony বা আধিপত্য। আরেকটি হলো Domination বা বলপূর্বক শাসন। রাষ্ট্র বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের সম্মতির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ অনেক সময় রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। আবার যেসব রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রের বিপক্ষে, সেসব ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিহত করে।

গ্রামসির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে সিভিল সমাজ কখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে আবার কখনো সংঘাতের জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সিভিল সমাজের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এক ঘরানার দার্শনিকেরা বলছেন যে সিভিল সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে ঐকমত্য গড়ে তোলা। প্রতিদ্বন্দ্বী ঘরানার দার্শনিকেরা বলছেন, সিভিল সমাজের কাজ হচ্ছে সংঘাতের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা।

প্রথম ঘরানার প্রধান প্রবক্তা হলেন জারগান হাবেরমাস। সমাজবিজ্ঞানে তাঁর একটি বড় অবদান হলো জনমত গঠনে গণক্ষেত্র বা Public Sphere-এর ভূমিকার বিশ্লেষণ। তাঁর মতে, গণক্ষেত্রে সিভিল সমাজের যে অংশ সক্রিয় রয়েছে, তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী ভাববিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট সবার সম-অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে ওঠে।

হাবেরমাসের বিশ্লেষণে একটি আদর্শ ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতার যোগাযোগ ক্ষীণ। সমাজের চালিকাশক্তি সব সময় যুক্তি নয়, অনেক সময় ক্ষমতা। সংবিধান ও আইনকানুন না মানলে এসব দলিল নিছক কাগজ। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করা যায় না।

মিশেল ফুকোর বক্তব্য হলো (Michel Foucault, 1926-84): সমাজ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না, সমাজের চালিকাশক্তি হলো সংঘাত। এই সংঘাত হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। সাধারণত হাবেরমাসের মতো চিন্তাবিদেরা সংঘাতকে সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এই ধরনের মতবাদ খণ্ডন করে ফুকোর সমর্থকেরা লিখছেন,

> 'There is mounting evidence, however, that social conflicts produce themselves the valuable ties that hold modern democratic societies together and provide them with the strength and cohesion they need, that social conflicts are the true pillars of democratic society (Hirschman 1994, 206). Governments and societies that suppress conflict do so at their own peril. …In a Foucauldian interpretation, suppressing conflict is suppressing freedom, because the privilege to engage in conflict is part of freedom.'[৩]

সংঘাতকে অস্বীকার করে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা কখনো টেকসই হয় না। জোর করে সংঘাত দমন করলে সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা পরে আরও তীব্রতর আকারে ফিরে আসে।

তবে ফুকোর 'সিভিল সমাজ' তত্ত্বের একটি বড় দুর্বলতা রয়েছে। সিভিল সমাজে সংঘাত দুই ধরনের। একটি হলো সিভিল সমাজের সঙ্গে বাইরের সংঘাত। এ সংঘাত রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যে চলে। এর ভালো দিক রয়েছে, কেননা, সিভিল সমাজ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচার খর্ব করে। আরেকটি সংঘাত হলো অভ্যন্তরীণ। এ সংঘাত চলে সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে। প্রথম ধরনের সংঘাত সমাজে পরিবর্তনের অগ্রদূত। দ্বিতীয় ধরনের সংঘাত সিভিল সমাজকে অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় করে। যদি সিভিল সমাজের মধ্যে বড় ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সংঘাতের মাধ্যমে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

সিভিল সমাজ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলো পর্যালোচনা করলে মনে হয়, পৃথিবীর সব দেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা একই ধরনের ছিল না। সামাজিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ভেদে বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা ভিন্ন ছিল। কাজেই একটিমাত্র তত্ত্ব দিয়ে সব ধরনের সিভিল সমাজের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা নিয়ে সিভিল সমাজ তত্ত্বের মধ্যেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। তত্ত্ব অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো সিভিল সমাজের অংশ। পক্ষান্তরে সিভিল সমাজের অবস্থান রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে কি সিভিল সমাজের বাইরের না ভেতরের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে? এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, সরকারের বাইরে ক্ষমতাসীন দলের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে কি না। যেসব দেশে দলপ্রধান ও সরকারপ্রধান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, সেখানে দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে সরকারি দলও সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো কোনো কোনো দেশে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের মধ্যে

কোনো প্রভেদ থাকে না। এসব দেশে সরকারি দল সিভিল সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ ধরনের সরকার গোটা সিভিল সমাজকে বিরোধী দল বলে গণ্য করে ও সিভিল সমাজকে অনুগত গৃহপালিত সংগঠনে পরিণত করতে চায়। সিভিল সমাজ মাথা তুলতে চাইলে তাকে দমন করতে এরা নির্মমভাবে খড়্গহস্ত। ওপরের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সিভিল সমাজের ভূমিকা দেশভেদে ভিন্ন। কাজেই সিভিল সমাজের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দেশভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভূমিকার বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এই প্রবন্ধ তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সিভিল সমাজের সংজ্ঞা ও তত্ত্বসমূহকে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতা ও সম্ভাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশে সিভিল সমাজ

দক্ষিণ এশিয়াতে ব্রিটিশ শাসনামলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং দান-খয়রাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিভিল সমাজ সংগঠনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এদের বেশির ভাগই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সমর্থিত ছিল। সুতরাং পরোক্ষভাবে সিভিল সমাজ এবং রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল।[৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিভিল সমাজ সংগঠনের প্রসার ঘটে। বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর যোগাযোগ ছিল। তবু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা একই পেশাগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজ করত।

বাংলাদেশের জন্মের পর এখানে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমত, পেশাগত সংগঠনগুলোর মধ্যে দলভিত্তিক রাজনীতি শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান বিভক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনের সংখ্যা হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন। ফারহাত তাসনিম তাঁর অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংগঠনের সংখ্যা ২ লাখ ৫৯ হাজার ৭০০ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই তালিকায় ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৪৭টি সমবায় সমিতি অন্তর্ভুক্ত। সমবায় সমিতির বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয়। উপরন্তু বাংলাদেশে কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, সরকার কর্তৃক অর্থায়িত ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এরা কোনো অভিধাতেই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নয়। এদের সিভিল সমাজ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না। সমবায় সমিতিগুলো বাদ দিলে সিভিল সমাজ

সংগঠনগুলোর সংখ্যা হবে প্রায় ৭০ হাজার। এই হিসাবের মধ্যে ৪৫ হাজার ৫০৮টি সমাজকল্যাণ সংগঠন বা এনজিও রয়েছে। এই ৪৫ হাজার ৫০৮টি সংগঠনের মধ্যে বড়জোর হাজার বিশেক এনজিও সক্রিয়। এদের মধ্যে হাজার দুয়েক এনজিও বৈদেশিক সাহায্যের জন্য নিবন্ধিত। এই হিসাবে বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ হাজার সিভিল সমাজ সংগঠন আছে বলে হিসাব করা যেতে পারে। তবে শুধু এই সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনের বিস্তৃতি পরিমাপ করা যাবে না। এর মধ্যে অনেক এনজিও রয়েছে, যাদের শত শত শাখা রয়েছে। এনজিও-সংক্রান্ত একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে শতভাগ শহরে ও কমপক্ষে ৯০ শতাংশ গ্রামে ন্যূনতম একটি সিভিল সমাজ সংগঠন রয়েছে। সারণি-১-এ বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠার সময়ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

সারণি-১

বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনের সংখ্যা

সময়	মোট সিভিল সমাজ সংগঠনের সংখ্যা	১৯১০-২০০৬ সময়কালে প্রতিষ্ঠিত মোট সংগঠনের শতাংশ	ক্রমপুঞ্জীভূত শতাংশ
১৯১০-৩৪	০	০	০
১৯৩৫-৩৯	১	০.২	০.২
১৯৪০-৪৪	১	০.২	০.৪
১৯৪৫-৪৯	২	০.৪	০.৮
১৯৫০-৫৪	৫	১.০	১.৮
১৯৫৫-৫৯	০	০	১.৮
১৯৬০-৬৫	১৫	৩.০	৪.৮
১৯৬৫-৬৯	১০	২.০	৬.৮
১৯৭০-৭৫	৩৮	৭.৬	১৪.৪
১৯৭৫-৮০	৪০	৮.০	২২.৪
১৯৮০-৮৪	৭০	১৩.৮	৩৬.২
১৯৮৫-৮৯	৬৭	১৩.৩	৪৯.৫
১৯৯০-৯৫	৫০	৯.৯	৫৯.৪
১৯৯৫-৯৯	৯০	১৭.৮	৭৭.২
২০০০-২০০৬	১১৫	২২.৮	১০০

সূত্র : ফারহাত তাসনিম (২০০৭, ১০৪)

সারণি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশের বেশি সিভিল সমাজ সংগঠনের জন্ম হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০—এই দুই দশক সময়কালে ৪৩ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠন ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে সিভিল সমাজ সংগঠনের বিস্তৃতি একটি বড় কারণ হলো, ১৯৯০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর সিভিল সমাজের ধারণা দাতাদের আনুকূল্য লাভ করে। ১৯৯০-এর দশকের আগেই বাংলাদেশে বেসরকারি সংগঠনগুলোর প্রসার ঘটে।

তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে শুধু সিভিল সমাজেরই বিকাশ ঘটেনি, অসিভিল বা দুষ্ট সমাজও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অসিভিল সমাজেরও বিস্তৃতি ঘটছে। অসিভিল সমাজের একটি বড় উৎস হলো মাস্তান। মাস্তানেরা বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা করে, লোকজনের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং বেআইনি মুনাফা অর্জন করে। মাস্তানদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশে দুঃশাসনের মূলে রয়েছে মাস্তান, রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা। এই মাস্তানি কার্যকলাপ আস্তে আস্তে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিকে গ্রাস করেছে। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতাসংগ্রাম—সর্বত্র ছাত্ররাজনীতিবিদেরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাস্তানি করে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ খুলে যায়। এর ফলে ছাত্রনেতারা মাস্তানির দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাস্তানিতে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে রক্তাক্ত অভিযানের সূচনা হয়। তারা শুধু বিরোধী রাজনৈতিক ছাত্রনেতাদেরই আক্রমণ করে ক্ষান্ত থাকেনি, উপদলীয় কোন্দলের মধ্যেও সহিংসতা ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে মাস্তান এবং ছাত্রসংগঠনগুলোর সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই। তবে এ ধরনের সংগঠনগুলোর সদস্যসংখ্যা সিভিল সমাজের সংগঠনসমূহের সদস্যের সংখ্যা থেকে কম হবে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশে অসিভিল সমাজ শুধু মাস্তান ও ছাত্ররাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর মধ্যেও অসিভিল সমাজ ছড়িয়ে পড়েছে। সিভিল শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেরোলিন এম এলিয়ট যথার্থই লিখেছেন, 'Civility implies tolerance, the willingness of individuals to accept disparate political views and social attitudes.' বাংলাদেশে বেশির ভাগ ধর্মীয় সংগঠন ইসলামি মৌলবাদে অনুপ্রাণিত। এদের পরমতসহিষ্ণুতা নেই এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার কোনো ইচ্ছাও নেই। এ

ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সিভিল সমাজ সংগঠনের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান থাকা সত্ত্বেও এদের অসিভিল সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সারণি-২-এ বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দেখা যাবে।

সারণি-২
বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ

প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	মোট সদস্যসংখ্যা	শতকরা হার
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	২৩০৮৩৮	৮৮.১২
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান	১৬৫৮৬	৬.৩৩
বিনোদনমূলক ও ক্রীড়া ক্লাব	৫৭৮৪	২.২১
বেসরকারি সংগঠন	৩৪৩৩	১.৩১
ট্রেড ইউনিয়ন	২৬০৪	০.৯৯
পেশাগত প্রতিষ্ঠান	১৩০০	০.৫০
কর্মচারীদের সংগঠন	৭৫৫	০.২৯
সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অন্যান্য	৬৬২	০.২৫
	২৬১৯২৬	১০০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৭

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সমাজজীবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ এদের সিংহভাগেরই কোনো সিভিল চেতনা নেই। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠানে সিভিল চেতনা থাকার কথা, সেখানেও নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশের সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি বড় উৎস হলো সমবায় সমিতিসমূহ। অথচ বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, এগুলো সরকারি অর্থে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন। এদের সিভিল সমাজ সংগঠন না বলে সরকারি কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

বেসরকারি সংগঠনসমূহ (বা এনজিওগুলো) একই সঙ্গে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের একটি বড় সবলতা ও দুর্বলতা। তত্ত্ব অনুসারে বেসরকারি সংগঠনসমূহের সদস্যদের সিভিল সমাজের সদস্য গণ্য করা উচিত। দুই কোটির বেশি সদস্য সিভিল সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশে কতটি এনজিও রয়েছে, সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সংস্থা ডিফিডের হিসাব অনুসারে ২০০০ সালে বাংলাদেশে ২২ হাজার এনজিও কাজ করছিল। ২০০০ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতে ৫৪,৫৩৬টি এনজিও সক্রিয় ছিল।

২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে ২ লাখ ৬ হাজার লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় এই ধরনের সংগঠন বা নট ফর প্রফিট প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছিল। বাংলাদেশের স্থূল জাতীয় উৎপাদনের ৬ থেকে ৮ শতাংশ উদ্ভূত হয় এনজিও খাত থেকে। বাংলাদেশে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ ঋণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার জোগান দেয় এনজিও খাত। প্রশ্ন হলো, এনজিও খাতের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অংশ হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে কি না?

তাত্ত্বিক দিক থেকে এখানে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত, সিভিল সমাজের প্রধান দায়িত্ব হলো ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সিভিল সমাজ আপসহীন। কিন্তু বাংলাদেশের এনজিওগুলোর প্রধান কাজ হলো দাদনের ব্যবসা। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এনজিওগুলোর ৯২ শতাংশ শাখার মূল কার্যক্রম হচ্ছে ঋণ বিতরণ। এই দাদনের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। যদি সিভিল সমাজের অংশ হিসেবে আন্দোলন করলে ঋণের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় বেসরকারি সংগঠনগুলো এ ধরনের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য এনজিওগুলোর সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রয়োজন। তাই তাদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন করা সম্ভব নয়। কাজেই এনজিওগুলোর পক্ষে পুরোপুরিভাবে সিভিল সমাজের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এনজিওগুলো অর্থায়নের জন্য বিদেশি সাহায্য সংস্থা ও সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এনজিওগুলো দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক অনুদান পেয়েছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রায় ১৭ শতাংশ এনজিওগুলো পেয়েছে।[৫] বৈদেশিক সাহায্যের বাইরে বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নেও এনজিওগুলো চুক্তিভিত্তিক দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়া পল্লি কর্ম সাহায্য সংস্থা, এনজিও ফাউন্ডেশন, গৃহায়ণ তহবিল ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওগুলো সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায়। বিদেশি সাহায্য পাওয়ার জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে। তাই এনজিওগুলোর সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন করার ক্ষমতা সীমিত। বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত কর্মসূচিসমূহ অনেক সময় বিদেশি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। জেফ্রি উড এ ধরনের কর্মসূচিকে ফ্রেঞ্চাইজ (Franchise) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রেঞ্চাইজ ব্যবসা মূল কোম্পানির আদলে তাদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সিভিল সমাজের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না।[৬]

তৃতীয়ত, সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে অনেক সিভিল সমাজ সংগঠন দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে

পড়েছে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে সব এনজিওর একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল অ্যাডাব (ADAB)। এখন প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন অনেক এনজিও সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও যেসব এনজিও সরকারের নীতির বিরোধী বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের বিপক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রশিকার মতো বড় এনজিওগুলোও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সিভিল সমাজের ভূমিকা পালনের পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল।

বাংলাদেশের বর্তমান বৈরী পরিবেশে বেশির ভাগ এনজিও সচেতন ও অচেতনভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমর্থক না হয়ে স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনজিওগুলোর দাবিদাওয়া বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ৫০০টি সিভিল সমাজ সংগঠনের দাবিদাওয়া সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। এ দাবিদাওয়ার বিশ্লেষণ সারণি-৩-এ দেখা যাবে।

সারণি-৩

সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর দাবিদাওয়ার বিশ্লেষণ

কোন ধরনের সিভিল সমাজ সংগঠন কত শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী

দাবির বিষয়	অর্থনৈতিক	শিক্ষা ও সংস্কৃতি	দাবি আদায়ের জন্য সংগঠন	কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সংগঠন	মোট
পল্লি উন্নয়ন	২০.৭	৬.১	০	২৪.১	১৬
স্থানীয় ক্ষমতায়ন	২৫	১২.২	১২.৫	৫৪.৫	৩১
স্থানীয় দাবিদাওয়া	২০.৭	৬.১	২৫	২৭.২	১৮
শিক্ষা ও সাক্ষরতা	৩২.৮	৮১.৬	৫০	৬২.৫	৪৪
স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা	৪৬.৬	৫৭.১	৫০	৬৬.৫	৪৬
আইনি, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার	১২.১	২০.৪	২৫	২৮.৬	১৭
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	৬৫.৫	২৮.৬	৩৭.৫	৫৭.৬	৪৪
সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা	২৬.৭	৩৬.৭	৫০	৪২.৯	৩০

উৎস : ফারহাত তাসনিম (২০০৭, ১৫৬)

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৭ শতাংশ সংগঠন রাজনৈতিক ও মানবাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ৪৬ শতাংশ সংগঠন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবা প্রদান করে। ৪৪ শতাংশ সংগঠন সদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। সারণি-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সিভিল সমাজ সংগঠনের কাছে সদস্যদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার রক্ষা সবচেয়ে কম জনপ্রিয় কর্মকাণ্ড। এর একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি সংগঠন অতি সতর্কতার সঙ্গে বিতর্কিত রাজনৈতিক ভূমিকা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলাদেশে বেশির ভাগ বেসরকারি সংগঠনকে সিভিল সমাজ সংগঠন গণ্য করা ঠিক হবে না। যদি সমবায় সমিতি ও প্রধানত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনের পরিমাণ ও বিস্তার জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। ৫০০ সিভিল সমাজ সংগঠনের জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৮৬ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১২ হাজারের কম, ৬৫ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১০০-এর কম। যুক্তিসংগত কারণে এনজিওগুলোর বড় পরিবর্তনে আগ্রহ কম। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের পক্ষে বড় ধরনের পরিবর্তনে নেতৃত্ব প্রদান করার সম্ভাবনা কম।

৩. বাংলাদেশে সিভিল সমাজের অর্জন ও সম্ভাবনা

সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স[৭] বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনটি পায়ের ওপর দাঁড়ানো একটি টেবিলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর একটি পা হলো সরকার, দ্বিতীয় পা হলো অর্থনীতি এবং তৃতীয় পা হলো সিভিল সমাজ। এদের একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কোনো একটি উপাদান প্রাধান্য লাভ করলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংকট দেখা দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সিভিল সমাজ বিভিন্ন দেশে পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বের দুটি অঞ্চলে রাজনীতিতে সিভিল সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। একটি অঞ্চল হলো রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ। এখানে কমিউনিস্ট দল ছাড়া আর সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। এর ফলে এসব দেশে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল ছিল না। আশির দশকের শেষ দিকে যখন এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। তবে গির্জা ও ট্রেড ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সিভিল সংগঠন ছিল। এই সংগঠনগুলোই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করে। দ্বিতীয়ত, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতেও

সেনানায়কেরা বিরাজনীতিকরণ করে। এর ফলে বেশির ভাগ লাতিন আমেরিকান দেশেই কোনো বিরোধী দল ছিল না। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। তাই রাজনৈতিক সংগঠন না থাকলেও গির্জাকেন্দ্রিক সংগঠনগুলো সিভিল সমাজে অত্যন্ত সক্রিয়া ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যেসব দেশে বিরাজনীতিকরণের মাত্রা বেশি, সেসব দেশে রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা তত ব্যাপক।

পৃথিবীর অনেক দেশেই রাজনৈতিক সংকট রয়েছে। বেশির ভাগ দেশেই আশা করা হয়, রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করবেন রাজনীতিবিদেরাই। শুধু যেসব দেশে রাজনীতিবিদেরা নিজেরা সংকট সৃষ্টি করেন এবং সেই সংকট জিইয়ে রাখেন, সেসব দেশে রাজনীতিবিদেরা সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশা করা হয় না। বাংলাদেশে তিন দশক ধরে সংঘর্ষের রাজনীতি চলছে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। অনেকে আশা করেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে।

সিভিল সমাজ সম্পর্কে এ আশাবাদের কারণ চারটি। প্রথম কারণ হলো, বাংলাদেশের সিভিল সমাজের ইতিহাস। লাতিন আমেরিকার মতো পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সেনাশাসন বিরাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে সেনাশাসকদের আমলে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোই সম্মিলিতভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মানুষের অধিকার রক্ষায় এদের অবদান সিভিল সমাজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। তবে মনে রাখতে হবে, সিভিল সমাজ একা প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি; এদের পেছনে পরোক্ষ রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম মূলত আওয়ামী লীগ ও সেনাসমর্থনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো সামরিক শাসনের বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এরশাদ শাসনের অবসানে এরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলে। রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠাও করা হয়। ২০০৭-০৮ সালে দেশে যখন সেনাসমর্থিত সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন সিভিল সমাজ সরকারে অনেকটা গুরুত্ব লাভ করে। এর কারণ হলো, এই সরকারের কোনো জনসমর্থন ছিল না। এরা সিভিল সমাজকে ব্যবহার করে জনসমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, বাংলাদেশে সিভিল সমাজে অসাধারণ নেতৃত্ব রয়েছে। ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস, স্যার ফজলে হাসান আবেদের মতো অনেক সম্মোহনী

(charismatic) নেতা বাংলাদেশের সিভিল সমাজে রয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরাও স্বীকার করেন যে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য উপযুক্ত যথেষ্ট রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে নেই। তাই সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভার মোট সদস্যদের এক-দশমাংশ পর্যন্ত সদস্য অনির্বাচিত ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির বিধান করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হলো, সিভিল সমাজের কর্মসূচি। রাজনীতিবিদেরা যেসব সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সিভিল সমাজ সেসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। চতুর্থ কারণ হলো, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ টেলিভিশন দেখতে পারে। এর ফলে রাজনৈতিক কর্মীদের গুরুত্ব কমে গেছে। সিভিল সমাজের নেতারা টিভির মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন।

এসব যুক্তির সত্যতা রয়েছে; কিন্তু এসব যুক্তি বাংলাদেশে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে রাজনৈতিক পরিবর্তন অকল্পনীয় মনে হয়। এখানে সিভিল সমাজের একটি বড় অংশ রাজনীতিবিদদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। সিভিল সমাজ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে না, বিভিন্ন দল সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিবিদেরা দেশে কখনো সিভিল সমাজকে প্রাধান্য দেবেন না। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের বিকল্প হতে পারে সামরিক স্বৈরশাসন, সিভিল সমাজ নয়। যারা সিভিল সমাজের মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে সামরিক শাসনের সমর্থক হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে সিভিল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ২০০৬ সালের শেষ দিকে যখন বাংলাদেশে ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়, তখন সদ্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। আওয়ামী লীগের নেতারা পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাসে তাঁর অবদান নিয়ে কোনো তর্ক শুরু করেননি। সে মুহূর্তে ডক্টর ইউনূসকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ডক্টর ইউনূস সামরিক শাসনের খুঁটি হতে চাননি এবং তিনি বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। প্রথমে তাঁর দলে যোগদানের জন্য অনেকে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখান। কয়েক মাসের মধ্যেই ডক্টর ইউনূস বুঝতে পারেন যে সামরিক শক্তির দোসর হিসেবে কাজ না করলে তাঁর রাজনৈতিক দলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যাঁরা তাঁর দলে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই আদর্শবাদী ছিলেন না। বাইরের শক্তির সমর্থন, সিভিল সমাজের সমর্থন ও ডক্টর

ইউনূসের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। এত সুবিধা নিয়ে যেখানে ডক্টর ইউনূস ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে বিভক্ত সিভিল সমাজের বিতর্কিত নেতৃত্বের পক্ষে এ নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে কি না, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি নিষ্প্রভ ও অনেক ক্ষেত্রে কালিমালিপ্ত। কিন্তু সিভিল সমাজের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনব্যবস্থা ও অনুদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি সীমিত। তবু মাঝেমধ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সঠিক জনমত প্রতিফলিত হয়। পূর্ণাঙ্গ জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের মাঝেমধ্যে ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

বাংলাদেশে অনেক এনজিও রয়েছে, যেখানে কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। অনেক এনজিও রয়েছে, যা পারিবারিক ব্যবসায়ের মতো পরিচালিত হয়। সহজ বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির ফলে অনেক ভুয়া বেসরকারি সংগঠন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে এবং বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা মানসম্মত নয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানে অর্থের নয়ছয় হচ্ছে এবং এদের প্রশাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আরও অভিযোগ রয়েছে যে এসব প্রতিষ্ঠান অনেক সময় ব্যক্তি-স্বার্থে পরিচালিত হয়। ডেভিড লুইস এ প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন,

> 'A second type of criticism is that NGOs are self-serving and some NGOs had simply become money-making enterprises for their staff, many of whom enjoy a high standard of material life (such as the use of air-conditioned four-wheel drive vehicles) and a high status professional life. Those NGOs that have established business concerns have faced accusations of profiteering from personal gains from sections of the public, and allegations of unfair market competition from groups within the business community'[৮]. (১২৩)

এসব অভিযোগ সব এনজিওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে অনেক এনজিওতে কমবেশি অনিয়ম রয়েছে। কাজেই সিভিল সমাজ রাজনীতিবিদদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের, এ অনুমানের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

বাংলাদেশের সিভিল সমাজের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, এমন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে এ ধরনের ২ লাখ ৬ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৮৯ হাজার প্রতিষ্ঠান

ধর্মভিত্তিক। এসব ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো আদৌ সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। ইংরেজি সিভিলিটি, এর তাৎপর্য হলো সহিষ্ণু হতে হবে ও ভিন্ন ধরনের মতবাদের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা থাকতে হবে। এই সংজ্ঞা অনুসারে বেশির ভাগ ধর্মভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যারা আধুনিক অর্থে সিভিল সমাজ, তারা আধুনিক মূল্যবোধে ও বিশ্বায়নে বিশ্বাস করে। বেশির ভাগ ধর্মভিত্তিক সংগঠন এ ধরনের মূল্যবোধের বিরোধী। তাই বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়, বরং এদের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও বাংলাদেশে সিভিল সমাজের সংগঠনগুলো বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে স্টাইলস যথার্থই লিখছেন,

> 'The degree of penetration of Civil society by politicians is extreme… labor unions, professional associations, university groupings, chambers of commerce, and of course newspapers are identified primarily for their political affiliations… Advancement in most professions is based in large part upon signing oneself to the political leaning of one's superior or joining the relevant association or coalition. Even NGOs have been the target of partisan Co-optation.'[৯]

সিভিল সমাজের একটি বড় সমস্যা হলো, এদের দাবিদাওয়া দেশের বাস্তবতার আলোকে করা হয় না, করা হয় আন্তর্জাতিক রীতির আলোকে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের তিনটি প্রধান দাবি ছিল : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথক্করণ, মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন। বৈদেশিক দাতাদের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ দীর্ঘদিন ধরে এ তিনটি দাবি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো নির্বাচিত সরকারই সিভিল সমাজ ও দাতাদের প্রস্তাব গ্রহণে রাজি হয়নি। ২০০৭ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের সুস্পষ্ট কোনো জনসমর্থন ছিল না, এই সরকার মূলত দাতাদের ও সিভিল সমাজের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এই সরকার সিভিল সমাজের তিনটি প্রস্তাবই একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করে। আশা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশে মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। বাস্তবে দেখা গেল, মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা বহুলাংশে চালু করা হয়;

শুধু অধস্তন ফৌজদারি আদালতে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং সংবিধান এই বিচারব্যবস্থাকেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেয়। নির্বাহী বিভাগ প্রচলিত ব্যবস্থায় ফৌজদারি বিচারকে নির্বাহী বিভাগের স্বার্থে অপব্যবহার করে। তাই এ ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেসি ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও জড়িত ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থায় পুলিশের নিয়ন্ত্রণের ভার নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া হয়। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার ফলে পুলিশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। একটি এক স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রে বাইরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পুলিশ একটি অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সাধারণ মানুষের মানবাধিকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। শুধু স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ নয়, বিচারব্যবস্থায় আইনজ্ঞদের প্রাধান্যের ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিও সম্ভব নয়। প্রায় সাড়ে সাত শ বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার পর ও অধস্তন ফৌজদারি আদালতের ওপর নির্বাহী বিভাগের সব ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরও বিচারব্যবস্থাতে লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে মানবাধিকার সংস্থাসমূহ পুলিশি জুলুম বাড়ছে বলে অভিযোগ করছে।

২০০৭ সালে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৮ সালে এর কার্যকলাপ শুরু হয়। কিন্তু আট বছর ধরে কাজ করার পরও এ কমিশনের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার আট বছর পরও দেখা যাচ্ছে যে ১৩ বছর আগে হাইকোর্ট খালাস দেওয়ার পরও একজন অভিযুক্তকে ১৩ বছর ধরে জেলে আটক রাখা হয়েছে। অথচ জেলখানায় গত আট বছরে মানবাধিকার কমিশনের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ হলো, এ প্রতিষ্ঠান সরকারের সহযোগিতা পায়নি এবং কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কে সরকারের মধ্যে কোনো নবচেতনা সঞ্চারেও ব্যর্থ হয়েছে। যখন মানবাধিকার কমিশন স্থাপিত হয়নি, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পর বেআইনি কার্যকলাপ চালানো সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। আট বছরের ব্যর্থতার পর এ কমিশন সম্পর্কে এই ধরনের ভয় দূর হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে (যদি সম্ভব হয়) কমিশনের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আন্দোলন ভারতের রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। দিল্লিতে আম আদমি দলের নেতা

কেজরিওয়াল তথ্য অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। যেসব দেশে বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনব্যবস্থা কার্যকর, সেসব দেশেই তথ্য অধিকার আইন ভালোভাবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা দুর্বল এবং প্রশাসনব্যবস্থা অকার্যকর। তাই বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কোনো বড় ধরনের সুফল দিতে পারেনি।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শুধু পশ্চিমের উত্তম উদাহরণগুলোর অনুকরণ করলেই চলবে না, কর্মসূচিসমূহকে দেশের বাস্তবতার নিরিখে প্রণয়ন করতে হবে। একমাত্র এনজিওগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ছাড়া সিভিল সমাজের সংগঠনগুলো জনপ্রিয় কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আদৌ সিভিল সমাজের অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এ প্রসঙ্গে কারমেন মালেনা ও ভলকার্ট ফন হেনরিখের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁরা লিখেছেন,

> 'In every country there exists actors, organizations and activities that meet the defined criteria of civil society. In some cases, however, the concept of civil society had little resonance. Actors see themselves belonging to a particular organization, sector or movement, but have no sense of belonging to civil society per se'.[১০]

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের সংগঠনের মতো সংগঠন ঠিকই আছে, কিন্তু এ ধরনের সংগঠনের সিভিল সমাজ ধারণার প্রতি আনুগত্য নেই। এসব দেশে সিভিল সমাজ একটি ধারণা মাত্র; এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এসব দেশে সিভিল সমাজ হচ্ছে বাস্তবতার সন্ধানে একটি ধারণামাত্র (a concept in search of reality)।

অন্যদিকে কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ ধারণা আমদানি করেছেন পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকেরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে অগণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেদার অর্থ বিনিয়োগ করছে। দাতাদের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে হরেক রকম

সিভিল সমাজ সংগঠন গড়ে উঠছে। এসব সংগঠন দেশের মাটিতে গজায়নি; বাইরে থেকে এনে এদের উন্নয়নশীল দেশের মাটিতে পোঁতা হয়েছে। স্টাইলস এ ধরনের সিভিল সমাজকে 'ফরমায়েশি সিভিল সমাজ' বা 'civil society by design'[১১] হিসেবে অবহিত করেছেন। এ ধরনের সিভিল সমাজের কার্যক্রম তৃণমূলের মানুষেরা নিয়ন্ত্রণ করে না। এদের কর্মসূচি প্রণয়ন করে দাতারা, এসব কর্মসূচি প্রণয়নের অর্থও দেয় দাতারা। শেকড়বিহীন এসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের উজ্জীবনে কোনো লক্ষণীয় ভূমিকা রাখতে পারে না।

সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো শুধু শেকড়বিহীনই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান সুশীল নয়, দুঃশীল (uncivil/bad)। সাইমন চেম্বার ও জেফরি কপস্টেইন যথার্থই দাবি করছেন যে দুঃশীল বা দুষ্ট সিভিল সমাজ সংগঠন শুধু উন্নয়নশীল দেশেই নয়, এ সমস্যা উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহেও বিরাজ করছে।[১২] এটি একটি বাস্তব সমস্যা। সিভিল সমাজ সংগঠন শুধু সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে না। এদের সমাজকে পেছনের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। তাই দুষ্ট সিভিল সমাজ সংগঠন সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশে সিভিল সমাজের পক্ষে একা সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়। এরা রাজনৈতিক আন্দোলনে সহযোদ্ধা হতে পারে। এরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। কিন্তু একা সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর পক্ষে সমাজের রূপান্তর সম্ভব নয়। তবু সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাও সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর বড় একটি দায়িত্ব। সব স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবু যত দিন রাষ্ট্রের চাপে সাধারণ মানুষের অধিকার ও সৃজনশীলতা হুমকির সম্মুখীন হবে, তত দিন সিভিল সমাজের ধারণা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বারবার আকৃষ্ট করবে। মাইকেল এডওয়ার্ডস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'It remains compelling because it speaks to the best in us - the collective, creative and values-driven core of the active citizen - calling on the best in us to respond in kind to create societies that are just, true and free'।[১৩] লাভ-লোকসানের মোহে নয়, অন্তরের টানে মানুষ সিভিল সমাজ সংগঠন গড়ে তুলবে। এ ধরনের মানুষের কথা স্মরণ করে কবিগুরু লিখেছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/ তবে একলা চলো রে॥' তবে সাফল্য আসবে তখনই, যখন সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো একত্রে কাজ করবে। অন্যথায় সিভিল সমাজ সুশীল নয়, দুঃশীল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

পাদটীকা

১. Edwards, M. 2005. 'Civil society', the encyclopedia of informal education, www.infed.org/association/civil_society.htm.

২. Neera Chandoke 2007. 'Civil Society' *Development in Practice* Vol. 17, No 4-5, 607-6

৩. Bent Flyvbjerg. 1998. 'Havermas and Foucault: Thinkes for Civil Society,' *The British Journal of Sociology*. Vol 45. No 2, 210-233

৪. David Lewis, 2012. *Bangladesh Politics, Economy and Civil Society*. New Delhi: Cambridge University Press, 125-126.

৫. David Lewis. 2012, প্রাগুক্ত

৬. Geoffrey D. Wood. 1997. 'State Without Citizens: The Problem of the Franchise State,' in *Too Close for comfort, NGOs, States and Donors*, ed. D. Hulme and M. Edwards. London: Macmillan, 79-92.

৭. Anthony Giddens. 1999. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our World.* London: Profile Books, 77.

৮. David Lewis. 2012, প্রাগুক্ত

৯. Kendall W. Stiles. 2002. *Civil Society by Design*. Westport, et. Praeger, 110.

১০. Malena Carmen and Valkart Finn Heineich. 2007. 'Civil Society a proposed Methodology for International Cooperative Research'. *Development in Perspective* Vol. 17. No. 3, 338-352

১১. Kendall W. Stiles. 2002. *Civil Society by Design*. Westport, et. Praeger.

১২. Sivnome Chambers and Geffrey Kopscin 'Bad Civil Society' *Political Theory*. Vol. 28. No 6, 817-8

১৩. Edwards M. 2005. প্রাগুক্ত

খাতি চিন্তা
অর্থনীতি

আমার অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠা*

নুরুল ইসলাম

ভূমিকা

আমার পেশাগত জীবন ছিল অন্য অর্থনীতিবিদদের চেয়ে আলাদা। ছয় দশকে আমি অনেক ধরনের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছি। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ পেশাগত জীবনে দুটি বা তিনটি কাজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা ছিল অনেকগুলো পেশাগত কাজের যৌথ সমন্বয়। পেশাগত জীবনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পড়িয়েছি এবং গবেষণা করেছি। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে শুধু গবেষণায় ব্রত রয়েছি। সর্বোচ্চ জাতীয় নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছি। জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট হয়েছি এবং শেষে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

আমার পেশাগত জীবনের বিভিন্ন পর্যায় যথাক্রমে: অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক (রিডার) এবং তারপর অধ্যাপক (১৯৫৫-১৯৬৪); পাকিস্তান উন্নয়ন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠান (পিআইডিই), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) পরিচালক (১৯৬৪-১৯৭১-৭২); বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান (১৯৭২-৭৫); ইতালির রোম শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অর্থনীতি ও সামাজিক নীতি বিভাগের সহকারী মহাপরিচালক (১৯৭৭-৮৭) এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (ইফপ্রি) গবেষণা উপদেষ্টা/ইমেরিটাস ফেলো (১৯৮৭-বর্তমান)।

---

* অনুবাদ: **খলিলউল্লাহ্**

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : শিক্ষকতা, গবেষণা, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি, পাকিস্তান আমলে বৈষম্য, স্বাধীনতা-উত্তর নীতি প্রণয়ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হার্ভার্ড থেকে অর্থনীতির ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন শেষে ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। অর্থনীতি বিভাগকে তখন দুটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমত, যোগ্য শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব। কারণ বেশির ভাগ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, যাঁরা হিন্দু ছিলেন, তাঁরা ১৯৪৭ সাল এবং তার পরপরেই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, পুরোনো পাঠ্যসূচি যেখানে অর্থনীতিবিষয়ক সাম্প্রতিক জ্ঞানের শাখাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

আমার প্রথম কাজ ছিল পাঠ্যসূচিকে আধুনিকায়ন করা। আমি সেটা ব্যাপক আকারেই করেছিলাম, বিশেষ করে অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে (ব্যষ্টিক, সামষ্টিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)। জ্যেষ্ঠ শিক্ষক না থাকায় বিএ সম্মান ও এমএ স্নাতকোত্তর উভয় শ্রেণিতেই প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা একটানা পড়াতে হতো। এর মধ্যেই আমাকে পাঠ্যসূচি আধুনিকায়নের কাজ করতে হয়েছিল। সে সময়ে পড়ানোর দায়িত্ব খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হতো এবং শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার পাশাপাশি ছোট ছোট দলে ছাত্রছাত্রীদের টিউটরিয়াল ক্লাসও নিতে হতো। ছাত্রছাত্রীদের কাছে একজন শিক্ষকের বিধিসম্মত নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে এই কাজকে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু আমরা যেটুকু জানি যে বর্তমান পরিস্থিতি তখনকার তুলনায় সুদূরপরাহত।

একইভাবে, গবেষণায় যুক্ত হওয়াটা তখনকার দিনে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হতো। বেশির ভাগ শিক্ষকই, বিশেষ করে তরুণ ও উচ্চ প্রশিক্ষিতরা, অল্পবিস্তর গবেষণাকে তাঁদের বাধ্যবাধকতা বলেই মনে করতেন। শিক্ষকদের এসব গবেষণা প্রকাশের একটা জায়গা ছিল পাকিস্তান অর্থনৈতিক জার্নাল (*পাকিস্তান ইকোনমিক জার্নাল*)। পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতি এটা প্রকাশ করত। এর সম্পাদকীয় কার্যালয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্যেষ্ঠ ও সুপরিচিত শিক্ষকেরা এর সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

যদিও আমাদের বিভাগে বিদ্যমান বিদ্যায়তনিক পরিবেশে আমার আগ্রহ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর, কিন্তু গবেষণার ধারণা ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা বা আন্তযোগাযোগ করার মতো সমমনা গ্রুপ না থাকায় আমি ভাবলাম জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কাজ করব, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে। আমার কিছু সহকর্মী ছিলেন, যাঁরা গ্রামীণ

অর্থনৈতিক জরিপ পরিচালনা করেছিলেন। সেসব জরিপে সংগৃহীত উপাত্ত নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করার এবং পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতি-সম্পর্কিত নির্দিষ্ট অনুমানগুলোকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আসলে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ চাচ্ছিলাম। যথারীতি আমি জরিপে অংশ নিলাম এবং এটা করতে গিয়ে গ্রামের কৃষক-ব্যবসায়ী ইত্যাদির সাক্ষাৎকার নিলাম। এর ফলে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি ও জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল পাটের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ থেকে শুরু করে গ্রামীণ ঋণ ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান। যেসব প্রশ্ন গবেষণা করে দেখা হয়েছে, তার মধ্যে সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতা বা অন্যথা যা হতে পারে, তার মাত্রাসহ কাঁচা পাটের বাজারজাতকরণ চেইনের কাঠামো; ছদ্ম গ্রামীণ বেকারত্ব বা অনুন্নয়নের ধারণা বিশ্লেষণ; গ্রামীণ পরিবারগুলোর ঋণের উৎস এবং তার ব্যবহার। আমি জেনেছিলাম যে সাধারণভাবে যাদের উৎস মনে করা হয় সেই গ্রামীণ মহাজনেরা ঋণের প্রধান উৎস নয়, বরং বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং নিজের সঞ্চয় ছিল প্রধান উৎস। আবার আমাকে বলা হয়েছিল, যখন ধান উৎপাদন বেশি লাভজনক ছিল, তখনো কৃষকেরা পাট উৎপাদন করছিলেন। কারণ পাটের বাজারমূল্যের ব্যাপক ওঠানামার ফলে একটি পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ চাল দরকার ছিল, তা পাট বিক্রি করে চাল কেনার মাধ্যমে নিশ্চিত হতো না। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণের মাধ্যমে এ ধরনের ধাঁধা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

আমাদের গবেষণায় অর্থায়ন করার জন্য এখনকার মতো সে সময়ে কোনো বিদেশি দাতা যেমন বিদেশি ফাউন্ডেশন বা আন্তর্জাতিক সিভিল সমাজ বা থিংক ট্যাংক ছিল না। গবেষণার প্রকৃত ব্যয় যেমন জরিপের ব্যয় (গবেষণা সহায়তাকারী ও প্রকাশনা ইত্যাদি) অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই মেটাতে হতো। ঋণ ও গ্রামীণ বেকারত্ব বিষয়ে গবেষণায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থায়ন করত, যেমন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং পাট গবেষণার ক্ষেত্রে পাট মন্ত্রণালয়। এসব গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোগ আমরাই নিয়েছিলাম, অর্থায়নকারীরা নয়। তারা আমাদের চিন্তাগুলো পছন্দ করেছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গবেষণা খরচে অর্থায়ন করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামষ্টিক অর্থনৈতিক দিক নিয়ে করা আমার প্রথম গবেষণা পূর্ব পাকিস্তান অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সম্ভাবনা ও সম্পদ প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করে এই গবেষণা অতিরিক্ত প্রধান সচিবের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল। এটা পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ বরাদ্দ করা নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকার অনেকবার ব্যবহার করেছিল।

১৯৫০-এর দশকের শেষ ভাগে এবং ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকে পাকিস্তান সরকার আমাকে পূর্ব-পশ্চিম অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে বেশ কিছু কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়। আন্ত-অঞ্চল সম্পদ বরাদ্দের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে একজন একাডেমিকের জন্য এটা বেশ চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কর ও কর-বহির্ভূত সম্পদ এবং বিদেশি সাহায্য থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্জিত আয় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে আয়বৈষম্য কমানোর উদ্দেশ্যে দুই অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন করা। কমিশনে এই বিষয়ে বিস্তর বিতর্ক ছিল। প্রথমত, আয়বৈষম্য কীভাবে পরিমাপ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত, আয়বৈষম্যের ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের প্রভাব কীভাবে পরিমাপ করা হবে। প্রথম বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আলোচনা হয় এবং বলা হয় বৈষম্যের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য কোন অঞ্চলের আয়কে ভিত্তি ধরা হবে? পূর্বের না পশ্চিমের? স্পষ্টতই, যেহেতু পশ্চিমের আয় বেশি ছিল তাই এটাকে ভিত্তি ধরলে পশ্চিমের তুলনায় পূর্বের আয়ের যে ঘাটতি তার শতাংশ কম আসবে। কিন্তু যদি পূর্বের আয়কে ভিত্তি ধরা হয় তাহলে পূর্বের চেয়ে পশ্চিমের আয় উদ্বৃত্ত বেশি আসবে। কমিশনে পশ্চিমের সদস্যরা প্রথম পদ্ধতিকে নিতে চাচ্ছিল, কারণ এতে করে জনগণের কাছে বৈষম্য কম বলে প্রমাণ করা যাবে। বিকল্প হিসেবে তারা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে সমগ্র পাকিস্তানের আয়ের গড় উদ্বৃত্ত পরিমাণ দিয়ে বৈষম্য পরিমাপ করতে। এতে করে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের উদ্বৃত্ত শতাংশ স্বাভাবিকের চেয়ে কম মনে হবে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে তিন ধরনের পদ্ধতিই কমিশনের প্রতিবেদনে দেওয়া হবে। বর্তমান সময়ে এই বিতর্ক অর্থনৈতিক যুক্তির বিচারে হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু এখানে রাজনীতিটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ পশ্চিমের সদস্যরা জনগণের কাছে বৈষম্যের পরিমাণ যতটুকু সম্ভব কম দেখাতে চাচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক ছিল। বিদেশি সাহায্য কাজে লাগানো বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা নিয়ে এই বিতর্ক এখনো রয়ে গেছে। তখন সিদ্ধান্ত হলো যে সম্পদ কাজে লাগানোর সক্ষমতা তার ব্যবহার থেকে আলাদা নয়। যদি সক্ষমতা কম থেকেও থাকে, তাহলে সেটা অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে বাড়ানো যাবে।

রাজনৈতিক অর্থনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তর মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। করারোপণের প্রভাব ও ব্যাপ্তির প্রাক্কলনসহ করব্যবস্থার প্রশাসনিক সমস্যাগুলো নির্দেশের শর্তাদির (টিওআর) মধ্যেই ছিল। আবার, মূলধন ব্যয় ও বর্তমান ব্যয়ের সঙ্গে উন্নয়ন ব্যয় ও উন্নয়নবহির্ভূত ব্যয়ের বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। অভিন্ন সংজ্ঞার ব্যাপারে মতৈক্যে

পৌঁছাতে হতো যেন সেগুলো অভ্যন্তরীণ বাজেট ও বিদেশি সাহায্য বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর পরিকল্পনা কমিশনে যখন আমি আর্থিক ব্যবস্থা ও বাজেট-প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন এই অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লেগেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের এই সময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানের নির্ধারিত কিছু বৃহদাকার শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ায় যুক্ত ছিলাম। এ জন্য আমাকে সর্বনিম্ন মজুরির অর্থনীতির ওপর পড়াশোনা করতে হয়েছিল এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিতে হয়েছিল।

একই সময়ে খাদ্যশস্য ও এর বাইরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যদ্রব্যসহ অনেক রকমের ভোগ্যপণ্যের জন্য ভোক্তা চাহিদা ক্রিয়ার বেশ কিছু হিসাব এবং বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা প্রক্ষেপণের জন্য সবচেয়ে সঠিক গুণাঙ্ক বাছাইয়ের মাপকাঠির ওপর আমার একটা গবেষণা ছিল। পূর্ব পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরোর বেশ কয়েক বছর ধরে করা খানা আয়-ব্যয় জরিপের খুবই প্রগাঢ় বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এটা করা হয়েছিল।

যেহেতু অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে বিভিন্ন গবেষণা করা হচ্ছিল, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করলাম। খুবই সীমিত আকারে স্থান ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাসহ ওভারহেড সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে রাজি করানো গিয়েছিল। অধ্যাপক আতাউর রহমান ছিলেন বাণিজ্য বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান এবং আমি ছিলাম দ্বিতীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বা তিন বছর পড়ানোর পর অর্থনীতিবিষয়ক সাম্প্রতিক জ্ঞানের শাখাগুলোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল, ঢাকায় থাকার কারণে আমি উন্নত দেশগুলোয় পড়ানো ও গবেষণার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে আছি, তাই সেকেলে হয়ে পড়ছিলাম।

সে সময়ে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অর্থনীতিতে রৈখিক প্রোগ্রামিং তখন ছিল সময়ের উন্মাদনা। ম্যাট্রিকস বীজগণিতের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না। পরিসংখ্যান বিভাগের আমার এক সহকর্মীকে অনুরোধ করেছিলাম, সে যেন আমাকে ম্যাট্রিকস বীজগণিত শেখায়। সাম্প্রতিক সংযোজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার আগ্রহের কারণে আমি নুফিল্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ (Nuffield Foundation Fellowship) পেয়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমাই। প্রথমে যাই লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে। সেখানে ম্যাট্রিকস বীজগণিতের ওপর দখল নেওয়া এবং অর্থনীতিতে রৈখিক প্রোগ্রামিংয়ের ওপর প্রথম শ্রেণির রচয়িতা স্যামুয়েলসন, সলো

ও ডর্ফম্যানের লেখা পড়ার চেষ্টা করি। তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়োগিক অর্থনীতি বিভাগের দিকে এগোই এবং অধ্যাপক রিচার্ড স্টোনের সংস্পর্শে এসে জাতীয় আয় হিসাবরক্ষণ বিষয়ে সাম্প্রতিক সংযোজন ও পরিশোধনের সঙ্গে নিজের পরিচিতি ঘটাই। রিচার্ড স্টোন ছিলেন তখনকার সময়ে জাতীয় আয় হিসাবরক্ষণ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত। লন্ডনে আমি শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত লিওনেল রবিনসের উচ্চতর সেমিনারে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাই। এটা অর্থনীতির শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করা হতো। লিওনেল রবিনস ছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের দীর্ঘদিনের পরিচালক। অর্থনীতির প্রকৃতি ও তাৎপর্যের ওপর সুবিখ্যাত গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। প্রতি দুই সপ্তাহে একজন শিক্ষককে অর্থনীতির সাম্প্রতিক সুপরিচিত অবদান নিয়ে একটা বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে হতো এবং তার ফলাফল সেমিনারে উপস্থাপন করতে হতো। একই সময়ে অন্য দুজন শিক্ষককে সেই পর্যালোচনার মন্তব্যসহ প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো এবং একই বিষয়ে অন্যান্য গবেষণা বা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের ওপর সম্পাদিত গবেষণার প্রেক্ষাপটে এই পর্যালোচনার ফলাফলকে মিলিয়ে দেখতে হতো। সেমিনারের অন্য সদস্যদের অবাধ আলোচনার মাধ্যমে এটা করা হতো। আমার মনে হয় অর্থনীতিবিষয়ক সাম্প্রতিক জ্ঞানের শাখাগুলোর সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয় ঘটানোর জন্য এটা খুবই ব্যাপক ও কার্যকর পন্থা ছিল।

যুক্তরাজ্যে থাকার পর আমি নেদারল্যান্ডস ইকোনমিক ইনস্টিটিউটে (এনইআই) কয়েক মাস কাটাতে চলে যাই। জ্যান টিনবারজেনের গবেষণা সেমিনারে অর্থনৈতিক নীতিতত্ত্ব বিষয়ে সে সময়ে ব্যাপক আলোচনা হতো, যে বিষয়ে টিনবারজেন নেতৃস্থানীয় অবদান রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তিনি পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন পন্থার মধ্যে সম্পর্কের সবগুলো দিক নিয়ে যে কয়জন অনাবাসিক ফেলো বাগ্‌বিতণ্ডা করেছিলেন, আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন। নীতিনির্ধারণে যতগুলো লক্ষ্য থাকবে, ঠিক ততগুলোই বাস্তবায়ন পন্থা থাকতে হবে—এই তত্ত্ব তখন তুঙ্গে ছিল। দুটি লক্ষ্য অর্জন করতে একটি বাস্তবায়ন পন্থা ব্যবহার করাটা ছিল অদক্ষ এবং লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ পদ্ধতি। জ্যান টিনবারজেন এটা গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেমন সমীকরণের কোনো ব্যবস্থার সমাধানের জন্য যতগুলো স্বাধীন চলক থাকবে, ততগুলোই সমীকরণ থাকতে হবে। যদি সমীকরণের চেয়ে চলক বেশি থাকে, তাহলে কিছু চলক পুনরাবৃত্তিমূলক হবে। আবার যদি চলকের চেয়ে সমীকরণ বেশি হয়, তাহলে কোনো সমাধানই আসবে না। এই ইনস্টিটিউটে থাকাকালেই আমি

পাকিস্তান অর্থনীতির জন্য স্বল্পমেয়াদি ইকোনমেট্রিকের ওপর বই লেখা সম্পন্ন করি।

পাকিস্তান উন্নয়ন অর্থনীতি ইনস্টিটিউট (পিআইডিই)

দশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পর ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে করাচিতে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে (পিআইডিই) যোগ দিই। তখন পর্যন্ত এর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের হাতে। তাঁরা প্রধানত পাকিস্তান সরকারকে দেওয়া ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ছিলেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানের শর্ত ছিল ইনস্টিটিউটের নেতৃত্ব কোনো পাকিস্তানিকে গ্রহণ করতে হবে। এই ইনস্টিটিউটের নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক এমন কোনো উচ্চ প্রশিক্ষিত পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। কারণ এটা ছিল একটা আধা সরকারি ছোট গবেষণা ইনস্টিটিউট, যার প্রশাসন বা নীতিনির্ধারণে কোনো দৃশ্যমানতা ছিল না। যে কারণে একজন পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদকে বাছাই করা হলো, যিনি স্বনামধন্য মার্কিন অর্থনীতিবিদদের কাছেও সুপরিচিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে পিআইডিই আলাদা ছিল, কারণ এখানে কোনো পড়ানোর কাজ ছিল না, শুধুই গবেষণা। বাণিজ্য, বিদেশি বিনিয়োগ, সাহায্য ইত্যাদির মতো আমার আগ্রহের বিষয়ে গবেষণা করার জন্য পর্যাপ্ত রসদ আমার আওতাধীন ছিল। আমার আগের বিদ্যায়তনিক পরিবেশের তুলনায় এখানকার পরিবেশ অনেক ভালো ছিল। এখানে নামীদামি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই-তিন বছরের জন্য আবাসিক অর্থনীতিবিদেরা থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার ফলে এবং আমাদের পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়ে দৈনন্দিন আলোচনা ও বিতর্ক থেকে আমি লাভবান হতে পারতাম। এ ছাড়া সেখানে স্বল্পমেয়াদি অনাবাসিক পণ্ডিতেরা আসতেন। তার বাইরে, কিছু স্বনামধন্য বিদেশি অর্থনীতিবিদ যেমন জ্যান টিনবারজেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্টিন রবিনসন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের লয়েড রেইনল্ডস এবং অন্যদের সমন্বয়ে একটি বিদেশি উপদেষ্টা দল ছিল, যারা একটানা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এসে থাকত এবং আমাদের গবেষণা কর্মসূচি ও প্রকাশনার ওপর পর্যালোচনা, মন্তব্য ও পরামর্শ দিত।

একই সময়ে করাচিতে নীতিনির্ধারণ-বিষয়ক একটি অতিরিক্ত বিদেশি গবেষক দল ছিল, যার মধ্যে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনে সংযুক্ত হার্ভার্ড উপদেষ্টা দল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাহায্য মিশনের বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ ছিলেন। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ননীতিতে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

আমার নতুন পেশাগত পরিবেশের এসব বৈশিষ্ট্যের ফলে আমি দেশের

বাইরের উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে অর্থনৈতিক পেশায় নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছিলাম। সরকারের দেওয়া সম্পদ ছিল অবাধ এবং বিশেষত্ব ও পাকিস্তানের নীতিবিষয়ক অগ্রাধিকার অনুযায়ী গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতেন গবেষকেরাই; যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা প্রয়োজন ছিল। ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে বিদেশি উপদেষ্টা, লাইব্রেরি ও সরঞ্জামাদির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অনুদান দিয়েছিল। এ ছাড়া অনেক বৃত্তি দিয়েছিল, যার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ও দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদদের প্রশিক্ষিত করার জন্য দেশের বাইরে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের বন্দোবস্ত করা যেত।

এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ছিল পরিচালক ও তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মীদের হাতে। বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তাও সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল, যদিও পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রধানেরাই পরিচালনা পর্ষদের প্রধান ছিলেন, যেখানে অর্থসচিবদের মতো পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক মহারথীরা থাকতেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সরকারের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরিচালকের পেশাগত সিদ্ধান্তে বোর্ডের হস্তক্ষেপ না করার নীতি আংশিক কার্যকর ছিল। এখনকার প্রেক্ষাপটে অবাস্তব মনে হলেও সাহায্যের শর্তের মাধ্যমে এমন অতুলনীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত হওয়ায় সে সময়ের কিছু বিতর্কিত নীতি বিষয়েও আমরা গবেষণা করতে পেরেছিলাম, যা পাকিস্তানের নীতিনির্ধারকদের ব্যাপারে সমালোচনামূলক ছিল। বাণিজ্য, সাহায্য, ও বিনিয়োগের মতো আগ্রহের প্রাথমিক বিষয়ে আমি গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি দেশে-বিদেশে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। এসব নিবন্ধের বিষয় ছিল কারখানাজাত শিল্পের তুলনামূলক ব্যয় এবং তাদের প্রতিযোগিতা, রপ্তানি প্রণোদনার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা এবং রপ্তানি সক্ষমতা, বিভিন্ন রপ্তানির প্রতিযোগিতামূলক অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যয় ইত্যাদি। পাকিস্তানের উন্নয়নে বিদেশি সাহায্যের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাবের বিশ্লেষণসহ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার ওপর সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার মূল্যায়ন নিয়েও সে সময় আমি লিখেছি। সেই সময় লুইজের শ্রমের অসীম জোগান-তত্ত্ব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর শ্রমবাজারে মজুরির সন্ধিক্ষণ ইত্যাদি বেশ আলোচিত হচ্ছিল। আমি এর সীমাবদ্ধতা ও নীতি-সংশ্লিষ্টতাসহ পুরো গবেষণাক্ষেত্রটির মূল্যায়ন করেছিলাম। আমার গবেষণার গুণগত মান এবং পরিমাণের দিক থেকে ইনস্টিটিউটের সময়কাল ছিল আমার পেশাগত জীবনের সবচেয়ে উৎপাদনশীল সময়।

একই সময়ে পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর করা ইনস্টিটিউটের কিছু গবেষণার ফলাফল ছিল খুবই বিতর্কিত। প্রথমবারের মতো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের হিসাব আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। এর আগে পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্তানের আয়ের সঠিক হিসাব সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে আয়বৈষম্য রাজনৈতিকভাবে খুবই উত্তপ্ত বিষয় ছিল। কারণ পূর্ব পাকিস্তান সে সময় পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি বন্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ ও নীতি প্রণোদনার উল্লেখযোগ্য পুনর্বণ্টনের দাবি জানাচ্ছিল। একই সময়ে, কৃষি ও শিল্পের তুলনামূলক কর্মক্ষমতা বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য নিয়ে ইনস্টিটিউট থেকে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরণমূলক বিষয়ে গবেষণা স্বাভাবিকভাবেই তারা ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু নামীদামি বিদেশি বিদ্যায়তনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভালো সংযোগ থাকায় ইনস্টিটিউট সুরক্ষিত ছিল, যার ফলে আমাদের উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণা নিশ্চিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব এসব নিবন্ধ দ্বারা মোটেও ভীত ছিল না, কেননা এগুলো ছাপা হতো ইনস্টিটিউটের জার্নালের মতো বিদ্যায়তনিক জার্নালে, যা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাত না। জনসাধারণ বা রাজনীতিবিদেরা এ ধরনের গবেষণা সম্পর্কে জানতেন না অথবা জানলেও তাঁরা সেগুলো পড়েননি। অধিকন্তু, এসব নিবন্ধ যদি কোনো কারণে রাজনৈতিক আলোচনায় জায়গা নেওয়ার মতো বিপর্যয়পূর্ণ অবস্থায় চলে যেত, তাহলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা সামরিক-বেসামরিক নেতৃত্বের ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সময়ের আবর্তে এসব গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন সভায় আলোচনা হতো, যা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করার ফলে পাকিস্তানের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে পরিচিতি পেয়েছিল। আমাদের জীবনে এর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈরী প্রভাব পড়েনি। আমার মনে হয়, ক্ষমতাসীন এলিটদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং নিরাপত্তাহীনতা ছিল না, যার ফলে তারা আমাদের মতো একাডেমিকদের দমন করতে চায়নি—অন্তত যত দিন পর্যন্ত না আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গতিবেগ আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছি।

প্রথম বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

১৯৭০ সালের শেষের দিকে পিআইডিইর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। আমি ১৯৬৯ সালের মার্চের পর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম, এমনকি যখন আমি পিআইডিইর পরিচালক ছিলাম, তখনো। তত দিনে বিদ্যায়তনিক নিরপেক্ষতার রেখা অতিক্রম করে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা শুরু হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বরে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত

নির্বাসনে ছিলাম। ১৯৭২ সালের শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হই। গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিকল্পনা কমিশনে নিযুক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, যেখানে আমার কাজ ছিল নীতিনির্ধারণ এবং রাজনীতিবিদদের পরামর্শ দেওয়া। এই কাজ দ্বিগুণ কঠিন ছিল, যেহেতু আমি একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরিতে যুক্ত ছিলাম, যেমন পরিকল্পনা কমিশনকে সরকারের অংশ করা। আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম এবং ইনপুট-আউটপুট কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক নমুনা নির্মাণ করেছিলাম। সহকারী চেয়ারম্যান হিসেবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট প্রক্ষেপণ ও নীতি সুপারিশ বিষয়ে আমার তদারকির দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তার অনুসরণ ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি পরামর্শ-প্রক্রিয়া। এই পরামর্শ-প্রক্রিয়া শুধু অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে করলেই হতো না, বরং খাতভিত্তিক কর্মসূচি ও নীতি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও করতে হতো। নির্দিষ্ট কর্মসূচি ও নীতি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে বিস্তর দর-কষাকষি ও আলোচনার ভার ছিল কমিশনের সদস্যদের ওপর।

পরবর্তী কাজে আমাকে প্রথমে যে শিক্ষাটা নিতে হয়েছে তা হলো, রাজনীতিবিদদের উপযোগী ভাষায় অর্থনৈতিক ও নীতি-সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা ও আলোচনা করার কৌশল রপ্ত করা। এটা খুব কঠিন কাজ হলেও আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় নির্দিষ্ট নীতিনির্ধারণী বিষয়ে আলোচনা করার কাজে আমি ধীরে ধীরে উন্নতি করেছি। সব সময় প্রত্যেক মন্ত্রণালয় তাদের উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আরও বেশি সম্পদ দাবি করত। তবে সব মন্ত্রণালয়ের সম্পদের দাবি একত্র করলে আয়ত্তগত সামষ্টিক সম্পদের যোগফলকে অতিক্রম করে যেত। কিন্তু তারা কর রাজস্ব বাড়াতে আগ্রহী ছিল না। মন্ত্রিপরিষদে দর-কষাকষির প্রক্রিয়া সব সময় সুখকর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, আলোচনা ও দর-কষাকষি সাপেক্ষে সম্পদের বরাদ্দ বিষয়ে একমত হওয়ার পরিবর্তে বেশির ভাগ সময়ে মন্ত্রীরা তাঁদের দ্বান্দ্বিক দাবির ভিত্তিতে সম্পদ পুনর্বরাদ্দের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর চাপিয়ে দিতেন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য এটা সহজ রাস্তা ছিল, কারণ এর ফলে তাঁরা সহজেই তাঁদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর অপূর্ণ দাবিদাওয়া মোকাবিলায় বলির পাঁঠা খুঁজে বের করতে পারতেন।

আমার জন্য দ্বিতীয় শিক্ষা ছিল এটা বোঝা যে নীতিনির্ধারণীতে যেটা একজন

অর্থনীতিবিদের জন্য যৌক্তিক ও অকপট পছন্দ বলে মনে হতো সেটা রাজনীতিবিদদের জন্য ততটা অকপট ছিল না। একজন অর্থনীতিবিদ যখন কোনো সমস্যার সমাধান দেন বা নীতি সুপারিশ করেন, তখন তিনি তাঁর নীতিবিধানের রাজনৈতিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেন না। যাহোক, রাজনৈতিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা না করে কোনো অর্থনীতিবিদ পরামর্শ দিলে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সম্ভবত গ্রহণ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ সারে ভর্তুকির কথা বলা যায়। কৃষকদের মধ্যে এই পদক্ষেপ খুবই জনপ্রিয় ছিল। ক্ষমতাসীন দল মধ্যস্বত্বভোগী কৃষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যারা দীর্ঘ সময় ধরে সারে ভর্তুকি পেয়ে আসছিল। সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিতরণব্যবস্থার বাইরে বিক্রির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সার বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং ভর্তুকি বেশির ভাগ সময়েই ক্ষুদ্র কৃষকের পরিবর্তে বড় কৃষকদের কাছে যেত। এটা প্রমাণিত হওয়ার পরও রাজনীতিবিদেরা এই নীতি চলমান রেখেছিলেন। অধিকন্তু, সার ভর্তুকির মতো স্বল্পব্যয়ের ইনপুট নীতির অনুপস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদন লাভজনক রাখতে ভর্তুকি যখন চালু করা হয়, সে সময়ের চেয়ে খাদ্যমূল্য বেশি ছিল। একই সঙ্গে, সাপ্লাই চেইনের বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই সরকারের মূল সমর্থক ছিলেন। ভর্তুকিতে এত বেশি বিনিয়োগ করার ফলে কৃষির অন্যান্য খাত যেমন সেচ বা সম্প্রসারণসেবায় বিনিয়োগ কমে গেছে, এ যুক্তি দেওয়ার পরও সরকার তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়েনি। তারা ভীত ছিল এই ভেবে যে ভর্তুকি বন্ধ করে দিলে খাদ্যের জোগানে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ ধরনের ঝুঁকি নিতে তারা আগ্রহী ছিল না। তারা ধীরে ধীরে ভর্তুকি কমিয়ে আনতে চাচ্ছিল। যেমন ভর্তুকি এমন সময় কমানো, যখন অন্যান্য আধুনিক কৃষি উপাদান যেমন উচ্চফলনশীল বীজ, ক্ষুদ্র কৃষকসহ সব কৃষকের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থাসহ সারের জোগান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন খাদ্যে ভর্তুকি। এই ভর্তুকি সরকারি বিতরণব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের চারটি বড় শহরের কেন্দ্রে সবাইকে দেওয়া হতো, যেখানে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সব কর্মী, নিম্ন আয়ের সরকারি কর্মচারী এবং দেশের সব শিল্পশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভর্তুকির সবচেয়ে বড় বোঝাটা ছিল শেষোক্ত দুই শ্রেণির জন্য, বিশেষ করে শিল্পশ্রমিকদের জন্য। তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভর্তুকি কমানোর কোনো উদ্যোগ নিলে ট্রেড ইউনিয়নগুলো যদি তা মেনে না নিত এবং সামষ্টিক ব্যবস্থা গ্রহণ করত, তাহলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারত। ভর্তুকি-ব্যবস্থায় গলদ ছিল, কারণ ভর্তুকির খাদ্য অন্যদের কাছে বিক্রি করা হতো এবং সরকারি বিতরণব্যবস্থার খরচও বেশি ছিল। সুতরাং ভর্তুকির পরিবর্তে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বাড়ালে কার্যকারিতা বাড়ত। এর ফলে বিনা

বাধায় শ্রমিকেরা তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারতেন। এতে খাদ্য বিতরণের খরচ এড়িয়ে সরকারের সম্পদ রক্ষা পেত এবং ভর্তুকির জন্য যারা যোগ্য নয়, তাদের কাছে খাদ্য বিক্রি বন্ধ হতো।

শিল্পশ্রমিকেরা কয়েকটি যুক্তিতে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। প্রথমত, খাদ্যে ভর্তুকি বন্ধের বিপরীতে প্রকৃত মজুরি বাড়িয়ে সামঞ্জস্যতা আনার ক্ষতিপূরক পদ্ধতিটি তারা বুঝতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, সব শিল্প-মালিক যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন, সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না এবং এতে মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করতে হতো। যদি অবাধ্য মালিকেরা তা বাস্তবায়ন না করেন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বেধে যেতে পারত। তৃতীয়ত, তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না যে ভবিষ্যতে অন্য কোনো সরকার ক্ষমতায় এলে এই ক্ষতিপূরকপদ্ধতি অনুসরণ করবে কি না এবং যদি করেও তাহলে সেটা প্রয়োজনীয় মাত্রায় করবে কি না। বেশ কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট পরিমাণের রেশন খাদ্যব্যবস্থা চলে আসায় সংশ্লিষ্ট সবাই এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। যেহেতু এই প্রস্তাব শিল্পশ্রমিকেরা বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না, তাই নিম্ন আয়ের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও তা আর প্রযোজ্য ছিল না। উপরিউক্ত দুটি উদাহরণে দেখা যায়, কীভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতি বিবেচনা বা রাজনৈতিক বাস্তবায়নযোগ্যতার অভাবে পেশাগতভাবে সঠিক অর্থনৈতিক নীতি প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

সামষ্টিক অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-তত্ত্ব ও নীতিতে বিশেষায়িত অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি ইনপুট-আউটপুট বিশ্লেষণনির্ভর সামষ্টিক অর্থনীতি মডেলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম, যা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আমি অর্থনৈতিক নীতিপত্র প্রণয়ন করার ব্যাপারে সুপরিচিত ছিলাম। যা হোক, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে মন্ত্রিপরিষদ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি, অর্থনৈতিক নীতি অথবা সম্পদ বরাদ্দ বিষয়ে প্রভাব রয়েছে, এমন বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যার ফলে আমাকে মন্ত্রিপরিষদের আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হতো, যেখানে বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিষয়ে আলোচনা হতো। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল কৃষি খাতে স্বল্প উত্তোলন সেচ, গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপের মধ্যে বাছাইকরণ অথবা সার এবং সেচ প্রকল্পে বিনিয়োগের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা, অথবা গ্রামীণ ঋণ এবং ইনপুটের জোগানের মধ্যে সম্পদের বরাদ্দ প্রদান। বিভিন্ন ধরনের মাটির পরিপোষক ও রাসায়নিক অথবা কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে আমাকে পরিচিত হতে হয়েছিল। প্রথমবারের মতো আমাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা স্তরের মধ্যে আন্তসম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছিল, যেখানে এক

স্তরের আউটপুট অন্য স্তরের ইনপুট। যেমন প্রত্যেক নিম্নস্তরের আউটপুট তার ওপরের স্তরের জন্য ইনপুট। বিভিন্ন স্তরের ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের জন্য সঠিক অনুপাতের ভারসাম্য নির্ণয় করা আমার শিক্ষার অংশ ছিল। পরিবার পরিকল্পনা খাত ছিল আরেকটি উদাহরণ। পরিবারের নারী সদস্যদের কাজের চাপ বিষয়ে এবং নারীদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফলাফল বের করে আনার আলোচনার কথা আমার মনে পড়ে। আমার এখনো সেই নীতির কথা মনে আছে যে কোনো সন্তানের জন্মের ঠিক আগে, জন্মের সময়ে বা জন্মের ঠিক পরে নারীরা পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক বার্তা গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বেশি গ্রহণক্ষম থাকে। প্রথমবারের মতো আমি বুঝেছিলাম পুষ্টি একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যেখানে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবই আছে। পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি সমন্বয় ও একীভূত করার পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ছিল আমার জন্য চ্যালেঞ্জ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরামর্শে আমরা বলেছিলাম যে পরিকল্পনা কমিশনে পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন খাতের সমন্বয়ের জন্য একটি আলাদা ইউনিট থাকা প্রয়োজন।

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে দেখা যায়, পরিকল্পনা কমিশনে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের নীতি সমন্বয়কারী হিসেবে এবং মন্ত্রিপরিষদ ও বিভিন্ন কমিটির (সরাসরি পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন না হলেও যেগুলোতে একজন অর্থনীতিবিদের ইনপুট প্রয়োজন ছিল) আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমাকে অর্থনীতির গণ্ডির অনেক বাইরের অন্যান্য বিষয়েও বিচরণ করতে হতো। বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্পজ্ঞান বা পরিচিতির মাধ্যমে আমি সব কাজের কাজিতে পরিণত হয়েছিলাম।

বিদেশি সাহায্য বিষয়ে দর-কষাকষি করা ছিল পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব। সাহায্যের পরিমাণ ও ধরন নিয়ে দর-কষাকষি করতে হতো। এটা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন ছিল। বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর বিস্তারিত বিষয়ে কমিশনের সদস্যদের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক খাতের মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব ছিল। আমি সহযোগী নীতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে যুক্ত ছিলাম। এটা ছিল বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কার্যক্ষেত্র। প্রকল্প সাহায্য ছাড়া অন্যান্য সাহায্য যেমন পণ্য সাহায্য এবং অন্যান্য কাঠামোগত সমন্বয়সাধন বা ব্যালান্স অব প্যামেন্ট ঋণে অনেক বেশি নীতি উপাদান ছিল। বিনিময় হারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দর-কষাকষির কথা আমার মনে পড়ে। বাহ্যিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা মেটানোর পদ্ধতি হিসেবে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ বা বাণিজ্য ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে দাতারা সব সময়ই নারাজ ছিল। স্বাধীনতার এক বছর পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে দর-কষাকষি

চলছিল, যা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ওপর বিশ্বব্যাংকের করা প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। আমরা বিনিময় হার সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সাধারণত একমত ছিলাম, কিন্তু মুদ্রা অবমূল্যায়নের মাত্রা ও এর সময় এবং ব্যালান্স অব প্যামেন্ট সাহায্যের নিশ্চয়তা ও এই সাহায্যের পরিমাণ বিষয়ে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দেয়। খুবই শক্ত এই দর-কষাকষিতে আমরা ঐকান্তিকভাবে প্রস্তুতিপর্বের কাজ করেছিলাম এবং এই কাজে আমরা অবশ্যই ভালো পেশাদারত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে আমরা বিনিময় হার সমন্বয়ের পরিপূরক হিসেবে আর্থিক ও রাজস্ব নীতির ভূমিকা তুলে ধরেছিলাম। বস্তুত আমরা রাজস্ব ও আর্থিক খাতে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। যেমন দেশের ভেতরে মাত্রাধিক চাহিদা ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমিয়ে ব্যালান্স অব প্যামেন্টের ওপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে কর বাড়ানো এবং সরকারি ব্যয় কমিয়ে এনেছিলাম। মুদ্রা অবমূল্যায়নের প্রাক্কালে এ বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ কিছু সম্পদপ্রবাহ বা আর্থিক সহায়তা দিতে আমরা দাতাদের অনুরোধ করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, যেহেতু মুদ্রা অবমূল্যায়নের আশু প্রভাব হবে আমদানিমূল্যের বৃদ্ধি, তাই কিছু সাহায্যের প্রবাহ থাকলে আমরা আমদানি বৃদ্ধি করে এ ধরনের প্রভাব ঠেকাতে পারব। অধিকন্তু, খাদ্য আমদানিমূল্য বৃদ্ধি এবং তার ফলে অভ্যন্তরীণ আমদানিমূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমরা অবমূল্যায়ন করার আগে পরবর্তী ফসল উৎপাদন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কারণ প্রত্যাশিত ভালো ফসল উৎপাদিত হলে মুদ্রা অবমূল্যায়নের কারণে আমদানিমূল্য উচ্চহারে বৃদ্ধি পেলেও তার প্রভাব ঠেকানো যাবে। ইতিমধ্যেই খাদ্য আমদানিমূল্য বাড়তে শুরু করেছিল এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যে উর্ধ্বগামী চাপ ফেলছিল। এই পর্যায়ে অবমূল্যায়ন মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করত। যেকোনো ধরনের সাহায্যের জন্য দাতারা অবমূল্যায়নকে পূর্বশর্ত বলে পীড়াপীড়ি করছিল এবং কোনো সাহায্যের প্রবাহ শুরু করার ক্ষেত্রে রাজস্ব ও আর্থিক পদক্ষেপকে তারা ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছিল না। পরবর্তী ফসল উৎপাদন পর্যন্ত অবমূল্যায়ন না করার ব্যাপারটি আইএমএফ মেনে নিয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে, আইএমএফের বিনিময় বিধিনিষেধ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, যিনি বিনিময় হার সমন্বয় আলোচনার প্রধান এবং এশিয়া বিভাগের পরিচালক হার্ভার্ডে থাকাবস্থা থেকেই আমার পরিচিত ছিলেন। হার্ভার্ডে তাঁরা আমার সিনিয়র ছিলেন। আলোচনার জন্য উপপরিচালক ঢাকায় এসেছিলেন এবং বিশ্বব্যাংকও তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তবে আইএমএফের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। মুদ্রা অবমূল্যায়ন করার সময়ের ব্যাপারটি মেনে নিলেও, অন্য দুটি বিষয়ে তারা অনড় ছিল। অবশ্য অবমূল্যায়নের মাত্রার ব্যাপারে অনড় থাকার তেমন

একটা সুযোগ তাদের ছিল না।

আইএমএফের কর্মকর্তারা একমত হয়েছিলেন যে অবমূল্যায়নের মাত্রার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট গাণিতিক নমুনা ছিল না। বিনিময় হার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির চাহিদা-জোগান প্রতিক্রিয়ার আনুমানিক হিসাব এবং সহায়ক পদক্ষেপগুলোর সম্মিলিত চাহিদার প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে এর মাত্রা নির্ধারণ করা হতো। তিনি আমাদের প্রায়োগিক যুক্তি মেনে নিয়ে বললেন যে নির্দিষ্ট অবমূল্যায়নের মাত্রা প্রসঙ্গে চুক্তির বিষয়টি তাদের 'বিবেচনা' এবং আমদানি-রপ্তানি খাতের সাধারণ বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। শক্তিশালী দাতা ও দরিদ্র গ্রহীতার মধ্যে অসম সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে দাতার এই বিবেচনার ওজন অনেক।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাকে বললেন যে হয়তো হার্ভার্ডের সেমিনারে তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতেন, কিন্তু ঠিক সেটাই তিনি আইএমএফের কর্মকর্তা হিসেবে করতে পারতেন না। তিনি একজন ভারতীয় হলেও আদি বসতি ছিল বাংলাদেশে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সেটা বিনিময় হার বিষয়ে কোনো আলোচনা করার জন্য নয়। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলেন, যিনি দুরূহ প্রতিকূলতা পেরিয়ে একটি স্বাধীন জাতির নির্মাতা হয়েছিলেন। আমি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাই। প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে যথারীতি মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন। তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন যে এই মিটিংয়ের প্রতিবেদন যখন তিনি তাঁর ওয়াশিংটন কার্যালয়ে পাঠান, উর্ধ্বতনদের চোখে আইএমএফের কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর যোগ্যতা কয়েক ধাপ বেড়ে যায়।

যখন ১৯৭৪ সালের শেষে খাদ্য সাহায্যের প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৫ সালের শুরুতে ফসল উৎপাদন ভালো হয়, তখন বাংলাদেশ মুদ্রা অবমূল্যায়ন ঘটায়, যাতে অবমূল্যায়ন-পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় থাকে। তবে অবমূল্যায়নের বাইরেও আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমদানি কর ও রপ্তানি প্রণোদনা চালু করতে হয়েছিল।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)

পরিকল্পনা কমিশনে থাকাকালীন আমি একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছি এবং সামাজিক ও অর্থনীতির বাইরেও অন্যান্য বিষয়ে ভাসা-ভাসা জ্ঞান লাভ করেছিলাম। এফএওর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগের সহকারী মহাপরিচালক হিসেবে আমাকে শুধু একটি খাত নিয়েই কাজ করতে হয়েছিল যেমন খাদ্য ও কৃষি খাত, তবে এর বিভিন্ন উপখাতের ওপর বিস্তর

কাজ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল খাদ্য ও কৃষি খাতের আন্তর্জাতিক দিক এবং জাতীয় খাদ্য ও কৃষিনীতির আন্তর্দেশীয় তুলনা। এ ছাড়া আমাকে আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সঙ্গে বিস্তর যৌথ আলোচনা ও সহযোগিতামূলক প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করতে হতো। অধিকন্তু, আমাকে রোম শহরে এফএওর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কাজ করতে হতো।

১৯৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কৃষির আন্তর্জাতিক দিক বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক ও ধারণাগত যে বিষয়টির মুখোমুখি হতে হয়েছে তা হলো বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তা। আমি বৈশ্বিক খাদ্য ও কৃষিনীতি-বিষয়ক বিশ্লেষণে এবং কৃষিনীতি বিষয়ে আন্তর্দেশীয় তুলনায় যুক্ত ছিলাম, যেমন আউটপুট ও ইনপুটের জন্য বাজারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। এ ছাড়া আমি ও আমার সহকর্মীরা বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তার ধারণা তৈরি করি, যেখানে খাদ্যনিরাপত্তার সব গুরুত্বপূর্ণ দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। এগুলো ছিল ক. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা; খ. খাদ্য জোগানের ক্ষেত্রে একটি বছরে সব মৌসুমে এবং আন্তমৌসুম ও আন্তবর্ষীয় আবহাওয়াকেন্দ্রিক বা নীতিকেন্দ্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বছরজুড়ে জোগানের স্থিতিশীলতা; এবং গ. স্বাস্থ্য ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় মৌলিক খাদ্যে সব মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। খাদ্যনিরাপত্তার ওপরের সবগুলো দিকেরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক ছিল।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার নীতি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথমত ছিল কৃষিতে পর্যাপ্ত বাহ্যিক সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করা, যেমন উন্নয়ন সহায়তা ও বেসরকারি পুঁজি। দ্বিতীয়ত ছিল খাদ্য সাহায্য দেওয়া। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যনীতি বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যে ঘাটতি আছে এমন দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিশ্ববাজারে খাদ্যের বাইরেও অন্যান্য রপ্তানির অভিগমন ও খাদ্যের নিশ্চিত সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এর সব বিষয়েই আমি ও আমার সহকর্মীরা উত্তর-দক্ষিণ বলয়ের দেশগুলোর ভেদাভেদের সম্মুখীন হয়েছিলাম, যেহেতু এই দুই গোত্রভুক্ত দেশগুলোর স্বার্থ এক ছিল না। এখানে বলা ভালো যে এফএওর জন্মলগ্ন থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে নিয়োগ পাওয়া আমিই একমাত্র অর্থনীতিবিদ। আমার ঠিক আগেরজন নিউজিল্যান্ডের ছিলেন। কিন্তু মহাপরিচালকের পদে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশ থেকেই বছরের পর বছর নিয়োগ পেয়ে আসছিল। আমার সময়ে মহাপরিচালক ছিলেন উন্নয়নশীল দেশ লেবাননের। অন্যান্য কলাকৌশল বিভাগ যেমন কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির প্রধানের পদটিও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে হাতবদল হতো। যেহেতু এফএওতে অর্থনৈতিক নীতির বিষয়টি এই বিভাগের

দায়িত্ব ছিল, তাই পুরো সংস্থার এক-তৃতীয়াংশ বাজেট এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হতো। এই পরিবেশে, আমার আচরণ ও পারফরম্যান্স নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হতো, বিশেষ করে উন্নত সদস্যদেশগুলো সেটা করত। সৌভাগ্যক্রমে যেহেতু আমার উচ্চতর শিক্ষা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই আমার গবেষণার অভিজ্ঞতা ছিল, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের দুর্গ হিসেবে পরিচিত যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে, তাই এই দুই দেশ আমাকে সন্দেহাবসর (বেনিফিট অব ডাউট) দিত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কৃষি খাতে, বিদেশি সাহায্য দেখভাল করা। ১৯৭৩-৭৪ সালের বিশ্ব খাদ্যসংকটের পরপর এটা বোঝা যাচ্ছিল যে উন্নত দেশগুলো কৃষি খাতে সাহায্যের প্রবাহ বৃদ্ধি করবে। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি সাহায্যের প্রবাহ বৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনীয় সম্পদপ্রবাহের মোটামুটি একটা গাইড হিসেবে সার্বিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ৫ শতাংশ বা তার বেশি হারে কৃষি আউটপুট বাড়াতে কী পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, এফএওতে আমাদের তা পরিমাপ করতে হয়েছিল। এটা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশলের আওতায় বিবেচিত হয়েছিল, যেখানে সামষ্টিক বিদেশি সাহায্য হিসেবে উন্নত দেশগুলোকে তাদের জিডিপির শূন্য দশমিক শতাংশ দেওয়ার কথা বলা ছিল। এই লক্ষ্য এবং কৃষিতে বিদেশি সাহায্যের পরিমাপকৃত বাধ্যবাধকতা সহায়তার প্রকৃত বিধান বাস্তবায়িত হয়নি বললেই চলে। আমাদের সাময়িক প্রকাশনাগুলোয় তাদের প্রত্যাশিত পারফরম্যান্সের ঘাটতি তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উন্নত দেশগুলোর বদান্যতা যে প্রত্যাশা পূরণ করেনি, সেটা তারা শুনতে পছন্দ করছিল না। একদিকে আমাদের প্রাক্কলন আর অন্যদিকে গ্রহীতাদের বাড়তি সম্পদ কাজে লাগানোর সক্ষমতা বিষয়ে বিতর্ক চলমান ছিল।

অন্যদিকে, খাদ্যসহায়তা একধরনের ভিন্নধর্মী সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। দাতা ও গ্রহীতা দেশগুলোর সমন্বয়ে খাদ্যসাহায্য ও নীতি বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ১. বিশ্ব খাদ্যসাহায্য কর্মসূচির মাধ্যমে বহুপক্ষীয় সাহায্য আনা এবং ২. দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের প্রবাহ পরিদর্শন করা। এই জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং এ সম্পর্কিত দালিলীকরণ ছিল আমাদের বিভাগের দায়িত্ব। অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের প্রণোদনার ওপর খাদ্যসাহায্যের নেতিবাচক প্রভাবের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অভ্যন্তরীণ খাদ্যমূল্য কমিয়ে দেওয়া। একটা চ্যালেঞ্জ ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা যেন খাদ্যসাহায্যের মাধ্যমে অর্থায়ন হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলো (যেমন মূলত গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পগুলো) এমনভাবে খাদ্যচাহিদা বৃদ্ধি করতে পারে, যেন তা

খাদ্যসাহায্যের মাধ্যমে আসা জোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অন্য কথায়, উন্নয়ন প্রকল্প ও এর ফলে খাদ্যচাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে যে আয় বৃদ্ধি পাবে তা খাদ্য জোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যা হোক, যুদ্ধ বা আবহাওয়াঘটিত কারণে শস্য বিপর্যয়ের ফলে খাদ্যঘাটতির মতো জরুরি অবস্থায় খাদ্যমূল্য বেড়ে গিয়ে ক্ষতিসাধন করেছিল। এ রকম অবস্থায় খাদ্য উৎপাদনে প্রণোদনা না দেওয়া কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় হওয়ার কথা নয়। এ ধরনের বিতর্কিত বিষয় সমাধান করার উদ্দেশ্যেই আমাদের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা ও গবেষণালব্ধ কেস স্টাডিগুলো প্রণয়ন করতে হতো এবং তা সম্পাদন করতে হতো। খাদ্য উদ্বৃত্ত আছে এমন উন্নত দেশগুলো খাদ্যঘাটতি আছে এমন দরিদ্র দেশগুলোতে খাদ্য ডাম্পিংয়ের জন্য অভিযুক্ত হওয়ার শঙ্কায় ছিল এবং সে কারণে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত হচ্ছিল।

জরুরি অবস্থা ও উন্নয়ন খাদ্যসাহায্য বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফএ) প্রধানের সঙ্গে আমার নিবিড়ভাবে কাজ করতে হতো। ডব্লিউএফএর প্রধান নিশ্চিতভাবেই খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকা উন্নত দেশের নাগরিক ছিলেন। সাহায্যের নির্দেশের প্রসঙ্গে বলা যায়, দাতা দেশগুলোর প্রদত্ত খাদ্যসাহায্যের বরাদ্দের ব্যাপারে দরিদ্র খাদ্যঘাটতিসম্পন্ন দেশগুলোর অগ্রাধিকার ছিল না। মোট কথা, এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে সাহায্যের প্রবাহ দাতা দেশগুলোর কৌশলগত ও রাজনৈতিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সাহায্যপ্রবাহ প্রধানত খুব নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ হতো না। বিষয়টি ইঙ্গিত করায় দাতা দেশগুলোর কাছে আমি এবং আমার সহকর্মীরা খুব একটা জনপ্রিয় ছিলাম না। বাণিজ্য বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণ বলয়ের দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন আরও বেশি মারাত্মক ও বিতর্কিত ছিল, কারণ বিশ্ব খাদ্যরপ্তানি বাণিজ্যের অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন দেশগুলো ছিল উত্তর বলয়ের উন্নত দেশগুলো। যেমন উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ছিল রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারক ছিল প্রধানত দরিদ্র দেশগুলো। অধিকন্তু, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর মূল্য সহায়তানীতি বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপণ্যের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ইইউ মূল্যসহায়তা ও খাদ্য মজুতনীতি অনুসরণ করছিল, যার ফলে পর্যাপ্ত ও স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ জোগান নিশ্চিত হয়েছিল বিশ্ববাজারের চেয়ে বেশি দামে। এ ছাড়া, কৃষি রপ্তানিতে রপ্তানি ভর্তুকিনীতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি নিরুৎসাহিত করছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র তুলার মতো কৃষিপণ্যে এমন নীতি বাস্তবায়ন করেছিল। এফএও এসব নীতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর এগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করেছিল।

বিশ্ববাজারে খাদ্য জোগান ও মূল্যের অস্থিতিশীলতা ছিল। ফলে কিছুদিন

পরপর বিশ্ববাজারে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব উন্নয়নশীল দেশেগুলোর দরিদ্র ও বিপন্ন জনগণের ওপর পড়েছিল। এফএওর ফোরামে আন্তর্জাতিক আলোচনায় দরিদ্র দেশগুলোকে স্থিতিশীল খাদ্য সরবরাহ দেওয়া ছিল অগ্রাধিকার বিষয়। বিশ্ব খাদ্য সরবরাহে ওঠানামার প্রভাবকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে আমি আন্তর্জাতিক মজুতের জন্য প্রস্তাব প্রণয়নে যুক্ত ছিলাম। দুটি বিকল্প প্রস্তাব আলোচিত হয়েছিল; হয় আন্তর্জাতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক মজুতের মালিক হবে এবং ব্যবস্থাপনা করবে অথবা আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বয় করা হবে কিন্তু মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা হবে জাতীয়। আবারও উত্তর-দক্ষিণ বা ধনী রপ্তানিকারক ও দরিদ্র আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যেহেতু ধনী রপ্তানিকারক দেশগুলোই বেশির ভাগ মজুতের দায়িত্বে থাকবে, তাই শেষ পর্যন্ত এসব কোনো প্রস্তাবই গৃহীত হয়নি। একই রকম প্রস্তাব ২০০৭-০৮ সালের খাদ্যসংকটের সময়েও আলোচিত হয়েছিল এবং যথারীতি বাতিল হয়ে গেছে।

জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থার মতোই এফএওর শাসনপদ্ধতি ছিল এমন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, যেমন বাজেট ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সব দেশের সমান ভোট থাকবে। এর মানে ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো কিন্তু বাজেটের অর্থায়ন করা হতো সদস্যদেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়নকৃত অবদানের ওপর ভিত্তি করে। অন্য কথায়, বাজেটের বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রকে বহন করতে হলেও পাপুয়া নিউগিনির ভোট যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্র বা ইইউ এটাকে অযৌক্তিক দাবি করে মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হলো। অতএব তারা বাজেট যতটুকু সম্ভব কম রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখল। প্রতিবছর দুই ধরনের দেশগুলোর মতভেদের কারণে বাজেট অধিবেশন ছিল উত্তেজনাপূর্ণ ও বাজে অভিজ্ঞতাময়। এসব বিতর্কের মুখে আমরা যারা সচিবালয়ে ছিলাম, তাদের বেশ সূক্ষ্ম পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। এফএওর অর্থায়নে বিভিন্ন দেশে টেনিক্যাল সহায়তা প্রকল্পগুলোর বাজেট যত সম্ভব কম রাখার ব্যাপারে ধনী দেশগুলো প্রচুর চাপ দিত। তারা এসব সহায়তা দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে দেওয়ার পক্ষে ছিল, যাতে গ্রহীতা ও কলাকৌশল সহায়তার ধরন বাছাই করার স্বাধীনতা তারা পায়। অধিকন্তু, দ্বিপক্ষীয় কলাকৌশল সহায়তার ফলে এফএওর নিয়োগপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে এসব দেশ কলাকৌশল সহায়তা প্রকল্পে তাদের নিজেদের নাগরিকদের চাকরির বন্দোবস্ত করেছিল।

খাদ্য ও কৃষি হালচাল নামে এফএওর বার্ষিক প্রধান প্রকাশনার দায়িত্ব ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি বিভাগের, যা অনেক দেশ, অঞ্চল ও সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর খাদ্য জোগান ও চাহিদার অবস্থা পর্যালোচনা করত। খাদ্যের

জোগান ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই সঙ্গে, নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলে আবর্তিত খাদ্যাবস্থা ও আসন্ন ঘাটতির হিসাব বিষয়ে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন করতে হতো। এফএও খাদ্য তথ্য ও পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এসব প্রতিবেদন প্রকাশ করত, যার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যঘাটতির উদ্ভব হলে দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেন তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো ১০ বছরব্যাপী বিশ্ব খাদ্য ও কৃষির ওপর আমরা একটি প্রেক্ষিত গবেষণা হাতে নিই। সামষ্টিক অর্থনীতিবিদ, ইকোনমেট্রিশিয়ান এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে খুবই উচ্চমানের দক্ষ একটি দল আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা করেছিল। এ দলের সঙ্গে যোগাযোগ ও সরাসরি তত্ত্বাবধান করা ছিল আমার জন্য খুবই সন্তুষ্টিজনক বুদ্ধিবৃত্তিক একটি কাজ। এই প্রক্রিয়ায় আমি প্রক্ষেপণ কৌশল বিষয়েও অনেক কিছু শিখেছিলাম।

এফএওতে আমাকে যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হতো তার মধ্যে ছিল কৃষির কলাকৌশল-সংক্রান্ত বিষয়। এর মধ্যে ছিল সেচ অর্থনীতি এবং বিভিন্ন ধরনের সার ও কীটনাশকের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য, গোত্রভিত্তিক ভূমি অধিকার এবং সমবায় কৃষিসহ বিকল্প মধ্যস্বত্বব্যবস্থার মতো প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি, কৃষক সংগঠন এবং কৃষি শিক্ষা ও সম্প্রসারণব্যবস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়া অপুষ্টি ও তা প্রতিরোধের নীতি বিষয়ে জটিল চ্যালেঞ্জ নিয়েও আমাকে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য জরিপ নামে একটা সাময়িকী প্রকাশনার দায়িত্ব ছিল আমাদের বিভাগের। এই প্রকাশনায় আলাদা আলাদা দেশের, অঞ্চলের এবং সারা বিশ্বের অপুষ্টির মাত্রা হিসাব করা হতো। এর জন্য টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হতো, যারা একদিকে ব্যক্তির পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে পুষ্টির জোগানের পরিমাপ করত। এ রকম কাজের ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি ও তার জোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করা হতো। আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও জাতিসংঘ শিশু অধিদপ্তরের (ইউনিসেফ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতাম। সে সময়ে ক্যালরি ও প্রোটিনের ওপর জোর দেওয়া হতো। মাইক্রোনিউট্রেন্টের ধারণা ও পরিমাপের বিষয়গুলো তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় আমি কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশনের প্রধান হয়েছিলাম। এই কমিশন খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করত এবং জাতীয় সরকারগুলো কর্তৃক গৃহীত এবং খাদ্যবাণিজ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা মান প্রস্তুত করেছিল। এগুলো বিভিন্ন দেশের কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজে লেগেছিল।

পরিকল্পনা কমিশনে থাকাকালীন আমি সব বিষয়েই ভাসা-ভাসা জ্ঞান অর্জন

করেছিলাম, যেখানে অর্থনীতির বাইরে অন্যান্য বিষয়েও প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। এফএওতে এসে অর্থনীতির বাইরের বিষয় এবং কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল বিষয়ে আমার সম্পৃক্ততা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে এফএওর কর্মসূচিগুলো সমন্বয়ের কাজটা আমাকে করতে হতো। এসব সমন্বয়ের মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সঙ্গে গ্রামীণ শ্রমবাজার ও গ্রামীণ অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বিষয়ে; জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের (ইউনেসকো) সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষা বিষয়ে এবং জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সঙ্গে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য বিষয়ে। যেসব কাজে একাধিক বিষয় ছিল সেখানে বিরোধ ও প্রতিযোগিতাও ছিল। প্রত্যেক সংস্থাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য ও উর্ধ্বতনতা জাহির করতে চাইত।

আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি)

রোম শহরে এফএওতে ১০ বছর কাজ করার পর আমি ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ইফপ্রি) যোগ দিই। এফএওর চাকরি থেকে এখানে যোগ দেওয়া একটা তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ছিল। এফএওর রোমে অবস্থিত কার্যালয়ে পাঁচটি বিভাগে ১৫০ বা তার কাছাকাছি সংখ্যক কর্মকর্তা এবং টেকনিক্যাল সহায়তা বিশেষজ্ঞ হিসেবে অন্যান্য দেশে আরও ১০০ বা তার কাছাকাছি কর্মকর্তা কাজ করতেন। এই সংস্থার একটি একক বৃহৎ বিভাগে প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল আমাকে। উপরোল্লিখিত বহুলসংখ্যক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন কমিটির মিটিংয়ে অনেক সময় ব্যয় করতে হতো।

ইফপ্রিতে আমার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল না। পুরোটা সময়ই গবেষণা ও পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল। গবেষকদের আগ্রহের বিষয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য ও কৃষিনীতির বিশ্লেষক এবং নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের অগ্রাধিকার বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৮০ দশকের শেষ দিকে ইনস্টিটিউটের যথেষ্ট সম্পদ ছিল। এমন একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার মৌলিক নির্দেশ ছিল আন্তর্জাতিক নীতি বিষয়ে গবেষণা করা। এ ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় নির্ধারণে রাজনৈতিক বিবেচনা এবং ফলাফল বা উপসংহার কী হবে তা ধতর্ব্য বিষয় ছিল না। এ ছাড়া একটি নির্দিষ্ট দেশের কেস স্টাডি বা নির্দিষ্ট নীতি বিষয়ে কয়েকটি বাছাইকৃত দেশের তুলনামূলক গবেষণা করাও প্রত্যাশিত ছিল। এসব কেস স্টাডি থেকে শিক্ষা নিয়ে তা অন্যান্য দেশের খাদ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে

লাগানোর জন্য সহজলভ্য করতে হতো। যে কারণে ইনস্টিটিউটের স্বাধীনতা ছিল। শুরুর দিকে এর বেশির ভাগ অর্থায়ন করত বেসরকারি ফাউন্ডেশনগুলো। এমনকি দাতা দেশগুলোর অনুদানও বহুলাংশে নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য প্রদান করা হতো।

এফএওতে থাকাকালীন যেসব গবেষণার ব্যাপারে চিন্তা করেছিলাম কিন্তু অনেক বেশি দায়িত্ব থাকার ফলে করতে পারিনি, সেগুলো ইফপ্রিতে এসে আমি প্রকাশ করি। উল্লেখযোগ্য গবেষণার মধ্যে একটা গবেষণা ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর অকৃষি রপ্তানি নিয়ে। এই বিষয়টি তখন পর্যন্ত তেমন মনোযোগ পায়নি বা গবেষণা করা হয়নি, কারণ খাদ্যশস্য এবং বড় বড় কৃষির কাঁচামালই ছিল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। এটা একটা বিস্তৃত গবেষণা ছিল, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোয় উদ্যানপালনসংক্রান্ত রপ্তানির নমুনা, গঠন ও পরিচালন এবং তাদের নির্ধারকগুলোয় আলোকপাত করে করা হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল গ্রামীণ অকৃষি খাত এবং অকৃষি খাতে ভবিষ্যৎ কেস স্টাডির জন্য একটি কাঠামো তৈরিসহ এ খাতের বিদ্যমান গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফাঁকফোকরগুলোর বিশ্লেষণ; বেশ কিছু দেশে খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনতে উদ্দেশ্য, নীতি ও তাদের প্রভাবের মূল্যায়ন। এ ছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও আয় প্রবৃদ্ধির আলোকে খাদ্যের চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য বিষয়ে একটি সম্ভাব্য গবেষণা তত্ত্বাবধান করেছিলাম। বছরের পর বছর ধরে কৃষির উপখাতগুলোর গঠনের বিবর্তনসহ কৃষিতে বিদেশি সাহায্য নিয়েও আমি কাজ করেছিলাম। দাতারা যেভাবে সময়ে সময়ে সাহায্যের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে তা কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দাতা দেশগুলোর প্রশাসনিক বাজেটসহ যেসব আন্তর্জাতিক এনজিও উন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্নত দেশে উন্নয়নশীল দেশের শরণার্থী বা অভিবাসীদের বন্দোবস্তে সহায়তা ও খাদ্যসহায়তা বিষয়ে কাজ করছিল তার সবই কৃষি খাতে সাহায্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে সব সাহায্যই উন্নয়নশীল দেশে সম্পদপ্রবাহ ঘটায়নি। সময়ের পরিক্রমায় এসব এবং দাতা দেশগুলোর অন্যান্য ব্যয় সাহায্যপ্রবাহের উপাদান হিসেবে বাড়ছিল।

সাম্প্রতিক কালে, গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ক্রমেই দাতাদের অগ্রাধিকার ও নীতিচাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, যা বিশেষভাবে বলতে গেলে নির্দিষ্ট দেশগুলোয় দাতা সহায়তার প্রকল্প ও কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটা শুধু গবেষণা প্রকল্প বাছাই করার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের স্বাধীনতাই সীমিত করছে না, বরং যেসব দেশের ওপর গবেষণা করা হবে তাদের স্বাধীনতাও সীমিত হচ্ছে।

আমি ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি গবেষণা উপদেষ্টা ফেলো হিসেবে অবসর নিই এবং ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে কাজ করা শুরু করি। এ সময়ে আমি উন্নয়নশীল দেশে শাসনপদ্ধতির সমস্যা এবং নীতিনির্ধারণের রাজনৈতিক

অর্থনীতি নিয়ে বাড়তি নজর দিয়েছি। এর মধ্যে ছিল বাংলাদেশে শাসনপদ্ধতি ও উন্নয়ন ছাড়াও দুর্নীতির বিষয়ে একটা গবেষণা। শাসনপদ্ধতি ও উন্নয়নের মধ্যে আন্তসম্পর্কটি পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। অন্যভাবে বললে ভালো শাসনপদ্ধতি উন্নয়নে সহায়তা করে। আবার বর্ধিত প্রবৃদ্ধি ভালো শাসনপদ্ধতির দিকে ধাবিত করে।

উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু খাত আছে, যেগুলো দুর্বল শাসনপদ্ধতির কারণে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন সামাজিক মূলধন ও আস্থার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া অনানুষ্ঠানিক চুক্তি কার্যকর করার পদ্ধতি বেশ ভালোই কাজ করে। যখনই অর্থনৈতিক লেনদেন ও জোগান ধারা জটিল হতে থাকে, তখনই আনুষ্ঠানিক চুক্তি বলবৎকরণপদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার, দুর্নীতির ফলে সরকারি অর্থ বেসরকারি হাতে চলে যাওয়ার ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়। তবে কিছু শর্ত পূরণ করা গেলে সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। এটা ঘটে যদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব কঠোরভাবে উন্নয়নমুখী হন এবং দক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ় থাকেন এবং যদি এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে কাকে ঘুষ দিতে হবে, কত ঘুষ দিতে হবে এবং ঘুষগ্রহীতা তার প্রতিশ্রুত কাজ সম্পাদন করে দেবে। এ ছাড়া এটাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে দুর্নীতির ফলে প্রকল্প বাছাই যেন আক্রান্ত না হয় এবং এখান থেকে সম্পদ বাজেভাবে বরাদ্দ না হয় বা প্রকল্প বা পারফরম্যান্সের মান নেতিবাচকভাবে আক্রান্ত না হয়। যা হোক, এগুলো খুবই কঠোর শর্ত এবং কদাচিৎ তা পূরণ হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যদিও-বা এই সবগুলো শর্ত পূরণও হয়, তবু আয় বণ্টনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়।

যখন আমি আমার দীর্ঘ পেশাগত জীবনের দিকে তাকাই কিছু এলোমেলো শিক্ষা আমার মনে আসে, যা এখন বলব। বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা একটি সন্তুষ্টিজনক পেশাগত জীবনের ভিত্তি এবং গবেষণাকে উদ্দীপিত করে। একজন দক্ষ ও সফল শিক্ষককে তাঁর বিশেষায়িত বিষয়ে সাম্প্রতিক সংযোজন সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তথ্য ও জ্ঞানের বিশ্বায়নের যুগে যদি কোনো শিক্ষক সেকেলে হয়ে পড়ে তাহলে খুব দ্রুতই তা ধরা পড়ে যায় এবং সেই শিক্ষক তাঁর সম্মান হারায়।

যেহেতু প্রতিনিয়ত নতুন কৌশল ও ধারণা তৈরি হয়, তাই পেশাগত জীবনে শিক্ষা গ্রহণ থেমে থাকে না।

যেখানে সমগোত্রীয় গোষ্ঠী থাকে যাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া, বিতর্ক ও আলোচনা করা যায়, সে ধরনের পরিবেশেই সবচেয়ে ভালো গবেষণা করা যায়। গণিত বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য।

অনেক সময় কম শিক্ষিত মনে হয় এমন ব্যক্তির নির্বোধ বা খুব ভালোভাবে অবগত নয় বা স্পষ্ট নয়, এমন প্রশ্ন থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। তাই সেটাকে কখনোই খাটো করে দেখা ঠিক না। তবে এ জন্য নম্রতা প্রয়োজন এবং জ্ঞানীকে ভাবতে হয় এই প্রশ্নের পেছনে কী আছে।

অর্থনীতিতে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর নেই বা কোনো সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান নেই। উন্নয়ন অর্থনীতিতে আমরা কখনোই পুরোপুরি জানি না কোন উপাদানগুলো প্রবৃদ্ধি বাড়ায় এবং ধরে রাখে। আমরা বিশদ আকারে জানতে পারি কোন বিষয়গুলো প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। রবার্ট সলো বলেছিলেন, কোন উপাদানগুলো প্রবৃদ্ধি বাড়ায়, সেগুলোর বেশির ভাগ আমরা সম্ভবত জানি কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে প্রণালিটা জানি না।

পরিমাণাত্মক (কোয়ানটিট্যাটিভ) অর্থনীতিতে একটি প্রশ্নের উত্তর অথবা কোনো অনুমানের সমর্থন নির্ভর করে কোন ধরনের উপাত্ত এবং কোন ধরনের বিশ্লেষণপদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর। এটা এখন স্বীকৃত যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপাত্তের মান ও পরিমাণ তাদের অর্থনীতির সন্তোষজনক বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট নয় অথবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রশ্নের উত্তর দিতে যথেষ্ট নয়। সদ্য সমাপ্ত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্মেলনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিমাণাত্মক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নীতি নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। টাইম সিরিজ ও ক্রস সেকশনের বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত ব্যবহার এবং পরিমাপক কৌশল ব্যবহার করে বহুমাত্রিক পরিমাণাত্মক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি অনুমানকে যাচাই করা প্রয়োজন। যদি সব ফলাফলই (বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের) একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তাহলে নীতি সিদ্ধান্তে পৌঁছার একটি প্রাথমিক জায়গা তৈরি হবে। তবে তখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে হবে সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে।

খাতি
সমাজ
চিন্তা

বাংলাদেশে জ্ঞান উৎপাদন : সিভিল সমাজের কতিপয় সমস্যা*

ম্যাথিল্ড ম্যাইটরট

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে নীতি প্রণয়নের জন্য জ্ঞান উৎপাদন এবং বিতরণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করা হবে। বাংলাদেশে জ্ঞান তৈরিতে অংশগ্রহণ করে এমন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান নিয়েই কোনো গবেষণা হয়নি। ফলে এই প্রবন্ধে জ্ঞান তৈরির মাধ্যম এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং একই সঙ্গে থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজেদের এবং পরস্পরের মধ্যে জটিল কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদের ঘাটতি এবং থিংক ট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রাজনৈতিক সহযোজনের (cooption) ফলে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা দুর্বল হয়ে পড়ছে, জ্ঞান তৈরির প্রক্রিয়া খণ্ডায়িত হচ্ছে এবং তা গবেষণাকে রাজনীতিবিমুখ রাখছে। কিছু কৌশলী লোকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে গবেষণার সঙ্গে নীতিমালার সম্পর্কসমূহ রূপলাভ করছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

সহায়তা-সামর্থ্য উন্নয়ন, সহায়তা কার্যকারিতা, সিভিল সমাজ, শাসনপ্রক্রিয়া এবং পাবলিক পলিসি, দক্ষিণ এশিয়া।

ভূমিকা

কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক সিভিল সমাজের ভূমিকা সংকোচন একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৩ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুই দলের সহিংসতার পর একাধিক সংবাদপত্র, এনজিও, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম এবং অ্যাক্টিভিস্টদের ওপর

* অনুবাদ : **গোলাম মুস্তাফা**

রাজনৈতিক চাপের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (*গার্ডিয়ান*, ২০১৫)। প্রতিবেদনগুলো এই বিষয়গুলোকে সিভিল সমাজের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছে (*ডেইলি স্টার*, ২০১৫)। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি *ডেইলি স্টার*-এ প্রকাশিত 'সিভিল সোসাইটি স্ট্যান্স কামস আন্ডার ফায়ার' শিরোনামের প্রবন্ধে তথ্য কমিশনার সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোকে উন্নয়ন-সহযোগীদের অর্থে পরিচালিত হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, তারা কোন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে? এবং কাদের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরছে? সিভিল সমাজের কর্মকদের (actor) জন্য কাজের ক্ষেত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি সরকারের ব্যর্থতা বা অনিচ্ছা, জনগণের স্বাধীনতাকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে এবং একটি জায়মান (nascent) কর্তৃত্ববাদী সরকারব্যবস্থার লক্ষণ হিসেবে দেখা যেতে পারে (ভ্যান ডর ভর্গ এবং টরিন্ডথ, ২০১২)। হাবারমাসের (১৯৯৬, ৩৬৭) মতে, সিভিল সমাজের কর্মকেরা সামাজিক সমস্যাসমূহ জনপরিমণ্ডলে কীভাবে অনুরণিত হয় তার খোঁজখবর রাখেন এবং এ ধরনের প্রতিক্রিয়াগুলোকে শোধিত করে জনপরিসরে বর্ধিত আকারে প্রচার করেন। তবে রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই সিভিল সমাজকে তাদের কর্তৃত্বের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করা বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে দেখে। একটি সমাজের অরাষ্ট্রিক (non-state) প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিহিত সামাজিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য সিভিল সমাজে সক্রিয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যাচাই করে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন থাইল্যান্ড ও চিলিতে রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সিভিল সমাজের কর্মকেরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ২০১৬ সালের প্রথম দিকে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা একটি বিষয় প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক মতবিনিময় এবং প্রতিযোগিতার জন্য এখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সিভিল সমাজ নিয়ে যে গবেষণাগুলো হয়েছে, সেগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল ১৯৭১ সাল থেকে দরিদ্রদের সরাসরি সম্পদ এবং সেবা প্রদানে এনজিওগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়াকে এনজিওগুলো সহায়তা না ব্যাহত করেছে, সেই বিশ্লেষণ (ব্লেয়ার ২০০১)। যদিও ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে উন্নয়ন জ্ঞানভাষ্যে (discourse) এনজিওগুলোর উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে আমার মতে, এগুলোকে বৃহৎ রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যে অন্তর্বর্তী সাংগঠনিক ক্ষেত্র (হোয়াইট ১৯৯৪, ৩৭৯) অর্থাৎ নাগরিক সমাজের সমতুল্য ভাবা যায় না। বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামে এবং ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে

মূল ভূমিকা পালন করেছিল (মনিরুজ্জামান ১৯৯২)। থিংক ট্যাংকগুলোর সাম্প্রতিক বিস্তার এবং সিভিল সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য উপভাগ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও, এই সম্পর্কিত রচনাবলিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবেই উপেক্ষা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তার ক্ষমতা চর্চা করে। সরকারের সম্প্রচার নীতিমালা এবং সম্পাদকীয় নির্দেশনায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রবণতা আছে। একই সঙ্গে নীতিমালাকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য সিভিল সমাজের আছে কি না, তাও প্রশ্নের সম্মুখীন (*ডেইলি স্টার* ২০১৪)। জ্ঞান উৎপাদন এবং বিতরণ একটি উচ্চমাত্রার রাজনৈতিক উদ্যোগ, যার সঙ্গে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদার যুক্ত এবং এই বিষয়টিই একটি স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে। এই প্রবন্ধে আমি অ্যাকফের দেওয়া 'জ্ঞান'-এর সংজ্ঞা ব্যবহার করব। অ্যাকফের (১৯৮৯) মতে জ্ঞান হচ্ছে ব্যবহারিক দক্ষতা, যা তথ্যকে নির্দেশনায় রূপান্তরিত হতে সম্ভবপর করে। আমি জ্ঞানকে তথ্য ও উপাত্ত থেকে ভিন্ন কিছু মনে করি। কারণ ঘটনা এবং সেগুলোর পরিবেশ পর্যবেক্ষণের ফলে যা উৎপন্ন হয়, তাই উপাত্ত এবং একটি ব্যবহারযোগ্য বা প্রাসঙ্গিক রূপ ধারণ করা ছাড়া এগুলো ব্যবহারযোগ্য নয় (রওলি ২০০৭)। অন্যদিকে একই ধরনের বর্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্য থাকলেও, তথ্য কার্যকরভাবে উপাত্তের চেয়ে ভিন্ন। তথ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপাত্তকে ব্যবহার করে।

এই প্রবন্ধে ওই সব স্বল্পচর্চিত প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক অর্থনীতি আলোচনার প্রমিত চেষ্টা করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা সিভিল সমাজ গঠিত হয় এবং যেগুলো জ্ঞান উৎপাদনে একধরনের ভূমিকা পালন করে। এখানে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞান উৎপাদনের সামর্থ্য কীভাবে এগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় তাও এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ২০১৩ সালে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত, শাসনের ক্ষেত্রে সিভিল সমাজের তাত্ত্বিক ভূমিকা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও কাঠামোবিষয়ক পরোক্ষ (সেকেন্ডারি) রচনাবলির একটি পর্যালোচনার মাধ্যমে এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি, রাজনৈতিক শক্তি এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কগুলোর ওপর খুব বেশি নির্ভরশীলতার কারণে থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা এবং দক্ষতা ধরে রাখতে একটি সত্যিকার দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রবন্ধটিতে প্রথমেই ব্যবহৃত গবেষণাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর পশ্চিমা উন্নয়ন-সম্পর্কিত জ্ঞানভাষ্যে থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুশাসনবিষয়ক কার্যাবলির তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশে পৃষ্ঠপোষকতাচর্চার বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। এই দুটি বিষয়কে একসঙ্গে করে এবং প্রাথমিক উপাত্তের ভিত্তিতে আমি দেখিয়েছি যে জ্ঞান উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা দুর্বল এবং জ্ঞানের শূন্যতা পূরণে থিংক ট্যাংকগুলোর সামর্থ্যও প্রশ্নসাপেক্ষ। বাহ্যিক তহবিলের ওপর নির্ভরশীলতা কীভাবে থিংক ট্যাংকগুলোর স্বায়ত্তশাসনকে প্রভাবিত করছে এবং গবেষণা প্রক্রিয়াকে অসম্পূর্ণ রাখছে তা আমি আলোচনা করেছি। এই প্রভাবশালী শক্তিগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র ঠিক করে দিচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো নীতিমালা তৈরির পরিবর্তে সেগুলো অনুসারে কাজ করছে। সবশেষ অংশে জ্ঞান, নীতি-প্রক্রিয়া (পলিসি প্রসেস) এবং শাসন-প্রক্রিয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা এবং ব্যক্তিগত সুযোগগুলোর প্রভাবকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয় : সমালোচনামূলক এবং সহায়ক

সুশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাত্ত্বিকভাবে কী ধরনের সমালোচনামূলক এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, তা এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

শাসনপদ্ধতির একটি উপকরণ হিসেবে সিভিল সমাজ

১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে পূর্ববর্তী বাজারভিত্তিক উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি উপায় হিসেবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো সুশাসনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করে। উন্নয়ন জ্ঞানভাষ্যে দাতা সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন-সহযোগীদের মধ্যে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা এটা মেনে নেয় যে উন্নয়নকাজ এবং নীতি আরও অধিক টেকসই এবং কার্যকর হওয়ার জন্য জাতীয় সরকারগুলোর সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা, মানবাধিকার বাস্তবায়ন এবং সরকারি খাতের সংস্কারের মতো সুনির্দিষ্ট শাসন-প্রক্রিয়াসংক্রান্ত শর্তে দাতারা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করা শুরু করে।

একদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র (পিআরএসপি) ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং অন্যদিকে সিভিল সমাজগুলোর জন্য বাহ্যিক সহায়তার মাধ্যমে মূলধারায় রূপান্তরিত হওয়া এসব উন্নয়ন জ্ঞানভাষ্য নীতি ও

চর্চায় পরিণত হয়। পিআরএসপি এবং এসডিজি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে মাল্টিসেক্টরাল ডাউনস্ট্রিম অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে সহায়তার যে বহুধাবিভক্তি (fragment) এবং অদক্ষতা ঘটে, তা রোধের চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রে সামষ্টিক নীতি পর্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ঘটে, ফলে উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ঐকতান তৈরি হয় এবং সেগুলো শক্তিশালী হয় (পারনিনি ২০০৯)। উন্নয়ন-সহযোগীরা দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় এবং লক্ষ্যগুলোর ওপর জোরারোপ করছে। এর দ্বারা এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে তারা সরকারগুলোকে দায়িত্বশীল এবং লক্ষ্য অর্জনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে সচেতন করতে সচেষ্ট। অধিকন্তু, সিভিল সমাজগুলোকে সহায়তা করার মাধ্যমে তা অদক্ষতা প্রতিরোধে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তৈরি ও বজায় রাখতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে গবেষণা সংস্থার (এনজিওর গবেষণা শাখা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো) সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এটা যুক্তি দেখানো হয়েছে যে জনসাধারণের কাছে সরকার এবং জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এসব প্রতিষ্ঠানের আছে।

সিভিল সমাজকে সহায়তা করার পশ্চিমা প্রচেষ্টাগুলোর ভিত্তি হচ্ছে সিভিল সমাজ সম্পর্কে তাদের একধরনের যান্ত্রিক ধারণায়ন (ইন্সট্রুমেন্টাল কনসেপচুয়ালাইজেশন)। এই ধারণা অনুসারে সিভিল সমাজ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং সেগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়মাত্মক (নরম্যাটিভ) এবং সদর্থক বিষয়কে সমর্থন করে (ব্লেয়ার ১৯৯৮)। ফলে যে জায়গাগুলোতে এটা দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানে এটাকে শক্তিশালী করতে প্রচেষ্টা নেওয়া হয় (লুইস ২০০৪)। তবে এখানে দেখানো হয়েছে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সিভিল সমাজ গঠনকারী এবং প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকদের (অ্যাক্টর) জটিল এবং বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে (ডিভাইন ২০০৩)। একই সঙ্গে, ঐতিহাসিক পরিবার, আত্মীয়তা এবং বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সিভিল সমাজ রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা ব্যক্তিগত এবং তৃতীয় সেক্টরসহ সিভিল সমাজ, রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যকার সীমানাকে অস্পষ্ট করতে পারে (ক্যালডর ২০০৩)।

থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিরপেক্ষতা

উত্তর আমেরিকায় ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগে থিংক ট্যাংকের উদ্ভব হয়। সেখানে তখন থিংক ট্যাংক বলতে বোঝাত বেসরকারি, অলাভজনক গবেষণা সংস্থা; এই সংস্থাগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকার এবং সামাজিক স্বার্থ যেমন : ফার্ম, ইন্টারেস্ট গ্রুপ এবং রাজনৈতিক দলগুলো থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বাধীনতা

ভোগ করে (ম্যাকগ্যান এবং ওয়েভার ২০১১ : ৪)। এই সংজ্ঞা সাধারণ অর্থে সিভিল সমাজ ধারণাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদিও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা থিংক ট্যাংকগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য; তবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি উৎস থেকে তহবিল গ্রহণ করে, সেগুলোকে থিংক ট্যাংক হিসেবে গণ্য না করার কোনো কারণ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারি কাঠামো থেকে সেগুলোর স্বাধীনতার মাত্রা বিবেচনায় নেওয়া যায়।

থিংক ট্যাংকগুলোর কাজকে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উভয় ধরনের কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ তারা লোকনীতির গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা নীতিগত বিতর্কগুলোতে আলোচনার বিষয় ও ধারণাগুলো সংগঠিত এবং রূপান্তরিত করে (অ্যাবেলসন ২০০৯ :৪)। নীতি প্রণয়নে একটি সমালোচনাত্মক কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার কারণে থিংক ট্যাংকগুলো সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে নীতি প্রণয়নে থিংক ট্যাংক এবং বিশিষ্ট এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার ফলে সরকারের প্রমাণভিত্তিক নীতি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের পদ্ধতিই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পূর্বে প্রধান রাজনৈতিক কর্মকেরা থিংক ট্যাংক এবং এনজিওগুলোকে এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হতে দিত না (হার্স, মাসিয়া এবং শ্রুম ২০১০)। কয়েকজন লেখকের মতে, এ ধরনের মিথস্ক্রিয়া এবং সম্পৃক্ততার কারণে শাসনপদ্ধতি আরও অধিক জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক হয়েছে। এই ক্ষেত্রে থিংক ট্যাংকগুলোকে নাগরিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এবং স্বচ্ছতা প্রচলনকারী হিসেবে দেখা হয় (পজ ২০১১)। সিভিল সমাজের লক্ষ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ২০০০-এর দশকের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো (বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং জাতিসংঘ) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে থিংক ট্যাংকগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করা শুরু করে। যথাযথ নিরপেক্ষ কাজ সম্পাদনের সামর্থ্যের ওপর থিংক ট্যাংকগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে, এটা ব্যতিরেকে জনবিতর্ক (পাবলিক ডিবেট) এবং অধিপরামর্শের (অ্যাডভোকেসি) সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা খাটো করে দেখা যেতে পারে।

গবেষণার সঙ্গে নীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা নিয়ে খুব একটা বেশি গবেষণা হয়নি। এর একটি কারণ এটি হতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রায়ই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সিভিল সমাজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে অবস্থিত নিরপেক্ষ কর্মক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রচনাবলি এবং সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান প্রস্তুতকারক এবং রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লক্ষ্য ধরে নেওয়া হয় দক্ষতা, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞান, সমালোচনাত্মক অনুসন্ধানের জন্য

প্রয়োজনীয় নমনীয়তা ও সামর্থ্য এবং সমাজে নিজেদের অবদান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক প্রজ্ঞাসহ নতুন প্রজন্ম তৈরি করা (বির্গেনিউ ২০০৫ : ১০)। বার্তুসি, বোর্গেস-হারেরো এবং ফুয়েন্তেস-জুলিওর (২০১৪) মতে, কার্যকর মিথস্ক্রিয়া এবং জ্ঞানগর্ভ কাজের মাধ্যমে লাতিন আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকায় আন্ত-আমেরিকান নীতিপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০-এর দশকে দাতারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা করা শুরু করে। মান নিয়ন্ত্রণ এবং স্বায়ত্তশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবদান রাখে বলে দাতাদের ধারণা ছিল (পিটারস ২০০৩), যা একটি দেশে জ্ঞান উৎপাদনকে শক্তিশালী করতে পারে এবং যা ব্যতিরেকে প্রমাণনির্ভর নীতিসমূহ কার্যকর হতে পারে না।

পৃষ্ঠপোষকতা : অনুপ্রবেশপ্রবণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক সামাজিক কাঠামো

জ্ঞান কীভাবে তৈরি হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো কী ধরনের ভূমিকা পালন করছে তা অনুধাবন করতে হলে দেশের রাজনৈতিক কাঠামো এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানাশোনা থাকা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধকতাগুলো কীভাবে মোকাবিলা করে এবং সুযোগগুলো কাজে লাগায় তাও অনুধাবন করা জরুরি। এই অংশে বাংলাদেশে রাষ্ট্র এবং সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ হাজির করা হয়েছে।

রাজনৈতিকায়িত (পলিটিসাইজড) জনপ্রশাসন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। একের পর এক অভ্যুত্থান, সহিংস রাজনৈতিক পরিবর্তন ও দ্বন্দ্ব এবং সামরিক হস্তক্ষেপ সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া এবং বৈধতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে (হক ২০১১ : ৬৩)। ব্রিটিশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান আমল থেকেই জনপ্রশাসন এবং আমলাতন্ত্র উচ্চমাত্রার রাজনৈতিকায়নের শিকার হয়েছে। এর ফলে জনপ্রশাসনব্যবস্থার স্বচ্ছতা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে (হক এবং রহমান ২০০৩)।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সময় দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব, অভিজাততন্ত্র, রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি, দলবাজি, পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল সম্পর্কের ফলে একটি অকার্যকর আমলাতন্ত্র তৈরি হয়েছে। ফলে যুদ্ধের পর ঘুরে দাঁড়ানোর গতি শ্লথ হয়ে পড়ে (শ্রীবাস্তব ২০১১)। অনেক বছর ধরে প্রভাবশালী

ক্ষেত্রগুলোতে নিয়োগ পাওয়া সরকারি কর্মকর্তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য। ফলে দ্রুত পদোন্নতি এবং অন্য আমলাদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা বা মেধার চেয়ে আনুগত্যকেই বড় করে দেখা হয় (জাফরুল্লাহ এবং রহমান ২০০৮)। এর ফলে অধিকাংশ জনপ্রশাসন এবং মন্ত্রিসভায় এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচারালয়সহ রাষ্ট্রকাঠামো...শাসক দলের রাজনৈতিকায়িত উপকরণে রূপান্তরিত হয়েছে (সরকার ২০০৮, ১৪২)। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত স্বার্থপর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখনো অস্বচ্ছ জনপ্রশাসনকে প্রভাবিত করছে (হক এবং রহমান ২০০৩)।

পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতির ফলে জনপ্রশাসনে অভিজাততন্ত্র দৃঢ়মূল হচ্ছে। সরকারি চাকরিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠী রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফায়দা লুটছে। অভিজাত সদস্যরা এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবিধাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ফলে তারা এই গোষ্ঠীর ক্ষমতা এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার মনোভাব পোষণ করেন। জাফরুল্লাহর মতে, বাংলাদেশে এই কাজ হয় ক্ষমতার অপব্যবহার, পরশ্রীকাতরতা, ঘুষ প্রদান এবং অবৈধ কাজের মাধ্যমে (২০০৭, ১৬৯) এবং এর ফলে অনানুষ্ঠানিক এবং মক্কেলধর্মী (ক্লায়েন্টেলিস্টিক) শাসনপদ্ধতির সুযোগ তৈরি হয়। এই অবস্থায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্মকেরা সমাজের কিছু ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা প্রদান করেন, যার ফলে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ (প্রায়ই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক) উদ্ধার করতে পারে। এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সরকারি দপ্তরের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার অর্থাৎ দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করতে পারে (হক ২০১১ : ৫১-৫৪)। এতে করে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা, শাসনকাঠামোর স্বচ্ছতা এবং জনসম্পদ (পাবলিক রিসোর্স) বণ্টন বাধাগ্রস্ত হয়।

পৃষ্ঠপোষকতা এবং সিভিল সমাজ

রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজ কর্মকদের মধ্যে ব্যাপক মাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যমান। কয়েকজন লেখকের মতে, এটি নীতি তৈরির প্রক্রিয়ার ভিত্তিমূল (পারনিনি ২০০৬ : ১৯০-১৯১)। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামো অনেক দিন ধরে তৈরি হওয়া পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল সম্পর্কের জটিলভাবে বিস্তৃত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরেও বিস্তৃত (কোচানেক ২০০০ : ৫৪৯)। কয়েকটি গবেষণা অনুসারে সরকারি আমলাতন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, একগুঁয়েমি ও

রাজনৈতিকায়ন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রবহির্ভূত কর্মকদের মধ্যে একটি অধিকতর ভালো মিথস্ক্রিয়া তৈরির পথে অন্যতম প্রধান বাধা। একই সঙ্গে এগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকে ভিন্নপথে পরিচালনা করার দায়েও দায়ী (জাফরুল্লাহ এবং রহমান ২০০৮)।

বাংলাদেশের সক্রিয় সিভিল সমাজগুলোর মধ্যে রয়েছে এনজিও, স্থানীয় গোষ্ঠী, সমবায় সমিতি, পেশাজীবী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, থিংক ট্যাংক এবং গণমাধ্যম। ১৯৭১ সালের পর এনজিওগুলো পুনর্বাসনকাজে ব্যাপক মাত্রায় সম্পৃক্ত হয় এবং এই ধারা ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে চলতে থাকে। ১৯৯০-এর দশক থেকে দারিদ্র্য হ্রাস এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগগুলোতে এনজিওগুলো কেন্দ্রীয় চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। যেসব সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠান সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে মূল ভূমিকায় ছিল, সেগুলো এখন প্রায়ই প্রভাবশালী রাজনৈতিকায়ন এবং পৃষ্ঠপোষণ সংস্কৃতি থেকে নিজেদের মুক্ত বলে দাবি করতে পারে না (ব্লেয়ার ২০০১ : ১৮৫; ডিভাইন ২০০৬)। সরকারি প্রশাসনের উপেক্ষা এবং নিজেদের স্বার্থ ও মূল্যবোধ রক্ষার প্রণোদনার পাল্লায় পড়ে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন থাকার প্রচেষ্টা হিসেবে বছরের পর বছর ধরে দাতাদের দিকে (এবং দাতারা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে) ঝুঁকে পড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক এবং পৃষ্ঠপোষকতার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং থিংক ট্যাংকগুলোর স্থান কোথায়?

জ্ঞান সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো : নিষ্ক্রিয় দশা

অধিকাংশ উত্তরদাতাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তবে তাদের মতে জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিষ্ক্রিয়। এই অবস্থার কারণ কী, তা এই অংশে আলোচনা করা হবে। কাঠামো এবং প্রণোদনা কীভাবে জ্ঞান সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পৃক্ততাকে বাধাগ্রস্ত করে, সেই সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য এখানে তুলে ধরা হবে। জ্ঞান সমাজ বলতে এমন একটি পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়, যেখানে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে এবং নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক স্বার্থের ভিত্তিতে তাদের নিজেদের জন্য গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী গবেষণা করে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অত্যধিক মাত্রায় রাজনৈতিকায়নের শিকার হওয়ায় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্যিক চাপ থাকায়, জ্ঞান উৎপাদনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান বেশ দুর্বল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক আনুগত্য এবং শত্রুতা

১৯২১ সালে দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দেশে ছয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।[১] ১৯৯২ সালে পাস হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন। বর্তমানে দেশে ৩৪টি সরকারি এবং ৭৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে (ইউজিসি ২০১৩)। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষার চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বহুসংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে জ্ঞান উৎপাদনের চাপ এবং চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করলে দেখা যাবে, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের মধ্যে খুব দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে এই সম্পর্ক জ্ঞান তৈরি বা সরকারি নীতিনির্ধারণে দিকনির্দেশক ধরনের নয়, বরং তা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত। বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকরভাবে রাজনৈতিকায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবেও খ্যাত। অল্প কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত; এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (একসময় যা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত ছিল)। রাজনৈতিকায়নের মাত্রা এতটাই জটিল যে তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতাকে অতীব মাত্রায় প্রভাবিত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে দলীয় রাজনীতির প্রভাব একেক ক্যাম্পাসে একেক ধরনের। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। সাধারণত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে (এবং প্রায়ই ওই রাজনৈতিক দলের একটি নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে) সম্পৃক্ত থাকেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনগুলোর সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। শিক্ষকেরা নির্দিষ্ট রঙের প্যানেলের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, যা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার প্রতীক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নীল, সাদা এবং গোলাপি প্যানেল যথাক্রমে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে)। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত থাকলে শিক্ষার্থীরা সুযোগসুবিধা পায়। সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগের যুব এবং ছাত্রলীগ, বিএনপির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। রাজনৈতিক দলগুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলো ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা, যেখানে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করে এবং এদের অনেকেই তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে। আমাদের উত্তরদাতাদের মতে, ছাত্রসংগঠনগুলো কর্মী সংগ্রহের সংঘাতময় পন্থা এবং সহিংসতার জন্য কুখ্যাত। উত্তরদাতাদের মতে, রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যায়তনিক গবেষণা বা শিক্ষার্থীদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতি খুব অল্প আগ্রহই আছে। সংগঠনগুলো নেহাত জাতীয় সংঘাতময় রাজনীতির বর্ধিতাংশ হিসেবে কাজ করে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশ দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তবে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক আনুগত্য এমন একটা প্রণোদনাকাঠামো তৈরি করেছে, যা তাদের মৌলিক গবেষণার প্রতি মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করে না। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ফলে ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্যান্য দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এতে করে রাজনৈতিক আনুগত্যের একটি আধিপত্যবাদী এবং অনুপ্রবেশপ্রবণ সংস্কৃতি বলবৎ হয়, যা বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। একজন উত্তরদাতার মতে, এই রাজনৈতিক আনুগত্য এবং শত্রুতার সংস্কৃতির ফলে পক্ষপাতমূলক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যায়তনিক মধ্যমানতা (mediocrity), ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে অবাধে পদোন্নতি এবং পদায়নের চর্চা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে মেধা ও বিদ্যায়তনিক ফলাফল বিবেচিত হয় না। অন্যদের মতে, রাজনৈতিক আনুগত্যের এই বদ্ধ গণ্ডির বাইরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অতিরিক্ত শিক্ষাসম্পর্কিত এবং প্রশাসনিক কাজের চাপ, সহকর্মীদের কাছ থেকে অসহযোগিতা এবং তাদের ওপর বিশ্বাসের অভাবের শিকার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ছোট অফিস, অল্প শিক্ষা উপকরণ এবং এমনকি অল্প স্টেশনারি দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের অনধিকারচর্চার ফলে একদিকে গবেষণা এবং মৌলিক লেখা প্রকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উৎসাহিত হচ্ছে না; অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের কাজের অবমূল্যায়নও হচ্ছে। ফলে জ্ঞান তৈরি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মুরগি আগে, না ডিম আগে

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন এবং গবেষণা দক্ষতার স্বল্পতাকে (যদিও এর উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয়ও আছে) রাজনৈতিকায়নের কারণ বা ফলাফল

হিসেবে দেখা যেতে পারে। গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত আর্থিক সম্পদের স্বল্পতার কারণে জ্ঞানের মান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। একজন উত্তরদাতা এই পরিস্থিতিকে 'মুরগি আগে, না ডিম আগে' পরিস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ গবেষণাকাজে যথাযথভাবে অর্থায়ন করার মতো তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নেই। অন্যদিকে, গবেষকেরা গবেষণা তহবিল পান না, কারণ ভালো মানের গবেষণা প্রস্তাব তৈরি এবং গবেষণা অনুদান পাওয়ার জন্য যে দক্ষতাগুলো প্রয়োজন, তারা সেই দক্ষতাগুলোতে দুর্বল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন তুলনামূলকভাবে কম (যদিও অভিজ্ঞতা এবং মর্যাদার ভিত্তিতে বেতনের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়) এবং শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়া গবেষণার জন্য তারা খুব অল্প সময়ই পান। ফলে যাদের জ্ঞান উৎপাদনের দিকে ঝোঁক থাকে তারা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেন, কারণ সেখানে তারা পদোন্নতি বা বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনার কোনো আশা দেখেন না। এর পরিবর্তে তারা বেসরকারি খাত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা উন্নয়ন খাতে যোগদান করেন, যেখানকার কাঠামো তুলনামূলকভাবে অধিক মেধাভিত্তিক।

অধিকাংশ উত্তরদাতার মতে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলকভাবে কম উপস্থিত, কারণ শিক্ষকদের তুলনামূলকভাবে বেশি বেতন দেওয়া হয় (অংশত উচ্চ টিউশন ফির কারণে)। একই সঙ্গে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নজরদারি ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কঠোর, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিষয়গুলোর ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। উত্তরদাতাদের মতে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যিক নীতিগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করে এবং তারা প্রাইভেট করপোরেশনগুলোর মতো বাজারভিত্তিক সম্প্রসারণ কৌশল অনুসরণ করে। উত্তরদাতাদের মতে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে।

এমনটা নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো জ্ঞানই উৎপাদন করে না। ওপরের বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দৃশ্যমান গবেষণার পরিমাণ কেন কম, তা তুলে ধরছে। বিশ্বব্যাপী জ্ঞান সমাজে আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে প্রকাশিত বিদ্যায়তনিক প্রকাশনাগুলোর মাধ্যমে গবেষণা ফলাফলের মান প্রতিফলিত হয়। অধিকাংশ শিক্ষকই বাংলাদেশি জাতীয় বিদ্যায়তনিক জার্নালগুলোতে নিজেদের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অধিকাংশ শিক্ষকই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ জার্নালে নিজেদের

কাজ প্রকাশ করতে চান। আন্তর্জাতিক প্রি-রিভিউড জার্নালগুলোর তুলনায় এই জাতীয় জার্নালগুলোর মান বেশ খারাপ এবং এগুলোতে পর্যালোচনার ব্যবস্থাও বেশ দ্রুত। অনেক উত্তরদাতার মতে, জ্ঞান উৎপাদনের মান এবং এই প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন তা হয় অনুপস্থিত বা অপর্যাপ্ত (যদিও হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে)।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, যা প্রাইভেট চুক্তি এবং পরামর্শক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে তারা পুষিয়ে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক অনেক উত্তরদাতা সতর্ক করে বলেছেন যে প্রাইভেট কর্মকদের দেওয়া নিয়মিত পরামর্শ চুক্তির কারণে জ্ঞান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার দশা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাইভেট কর্মকদের নানা ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে, যেমন ব্যাংকগুলোকে তারা নিয়োগ-প্রক্রিয়া, পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করে। দাতা সংস্থাগুলো পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি গবেষণাকাজের জন্য অল্প কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগের সঙ্গে চুক্তিও করে। উত্তরদাতারা ব্যবহারিক বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার গুরুত্বের বিষয়টি স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শক হিসেবে কাজ করার বিপদসমূহও তুলে ধরেছেন। একজন উত্তরদাতার মতে, এর মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ আহরণ করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অগ্রাধিকারে পরিণত হচ্ছে, যা বিপজ্জনক হতে পারে। এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি না দিলে বা এগুলোকে যথাযথ নিয়মাবলির মধ্যে না নিয়ে এলে, তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষকদের বিপদের সম্মুখীন করতে পারে।

থিংক ট্যাংক, আসলেই কী?

এই অংশে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে অল্প কয়েকটি থিংক ট্যাংকই সক্রিয়ভাবে এবং স্বাধীনভাবে জ্ঞান সমাজে অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা যদি স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে চায়, তবে হয় তাদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তথ্যবাণিজ্য বাজারে পরামর্শক ধরনের সত্তায় পরিণত হতে হবে (এতে করে তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা হুমকির সম্মুখীন হবে), রাষ্ট্রীয় কর্মকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করতে হবে (এতে করে নিজেরাই রাজনীতির উপকরণে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়) বা দাতাদের তহবিলের ওপর নির্ভর করতে হবে (এতে তাদের স্বায়ত্তশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে)।

থিংক ট্যাংকগুলো কি চিন্তা করে?

অনেক উত্তরদাতা থিংক ট্যাংকগুলোর আলোচ্যসূচি এবং গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ

সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে বাহ্যিক তহবিলের ওপর নির্ভরশীলতা, যা তাদের সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা ও জ্ঞান উৎপাদনের সামর্থ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

প্রথমত, একটি থিংক ট্যাংক কী বা কী ধরনের হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা বাংলাদেশে কঠিন। অনেক উত্তরদাতার কাছেই তা বেশ জটিল একটি বিষয়। প্রতিষ্ঠাতার ওপর ভিত্তি করে থিংক ট্যাংকগুলোর উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন। প্রায়ই তাদের ভূমিকা বহুমুখী এবং খাতভেদে তাদের কাজের মানও পরিবর্তিত হয়। ব্যবহারিক অর্থে থিংক ট্যাংক শব্দবন্ধ দ্বারা নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। কিছু কিছু থিংক ট্যাংক অধিপরামর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, তারা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান এমন একটি বিষয়কে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করে। অন্য কিছু প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহ এবং এর ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পরবর্তী অংশে থিংক ট্যাংকগুলো সাধারণত যে ধরনের কাজ করে, সেগুলোর ভিত্তিতে আলোচনা করা হলো।

সাধারণত থিংক ট্যাংকগুলো আর্থিক বিষয় নিয়ে বড় ধরনের দোদুল্যমানতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে তাদের নিজেদের গবেষণার বিষয় এবং সামর্থ্যের মধ্যে আপস করতে হয়। সিভিল সমাজে সক্রিয় এনজিওগুলোর মতোই থিংক ট্যাংকগুলো সাধারণত বিদেশী তহবিলের ওপর নির্ভরশীল এবং এর ফলে তারাও 'টাকার জন্য মূল্য' (value for money) বাধ্যবাধকতার শিকার। এশিয়াতে থিংক ট্যাংকের জন্ম তুলনামূলকভাবে একটি সাম্প্রতিক ঘটনা হলেও, শুধু পাঁচটি দেশেই বাংলাদেশের চেয়ে বেশি সংখ্যক থিংক ট্যাংক আছে (রশিদ ২০১৩)।[২] তবে এটা বলা যায় যে এনজিওগুলোর মতো থিংক ট্যাংকগুলোও নিজেদের আর্থিক টেকসই অবস্থা এবং নিজেদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে একটি বিরোধাভাসের মুখোমুখি হয় (ডিভাইন ২০০৩)। এখানে উল্লেখ্য, তহবিলের প্রাপ্যতা সব সময় বড় বাধা না, মূল বিবেচনার বিষয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনের ওপর তহবিলের অভিগমনের (access) প্রভাব। অধিকাংশ বেসরকারি স্বাধীন থিংক ট্যাংকগুলো অনুমোদিত গবেষণাকাজের মাধ্যমে (বাংলাদেশ সরকার, বিদেশী দাতা, দ্বিপক্ষীয় সংস্থা বা বৃহৎ এনজিওগুলোর জন্য) নিজেদের তহবিল সংস্থান করে। ফলে তাদের বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের গবেষণা প্রাধান্য মেনে চলতে হয় এবং এর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণও সীমিত। টিকে থাকার জন্য দাতাদের দেওয়া তহবিলে স্বল্পমেয়াদি সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা ফলাফলের বাস্তবায়ন ও বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য হ্রাস পায়।

উন্নয়ন-সহযোগীরা কেন থিংক ট্যাংকগুলোর সঙ্গে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে চুক্তি করে, তার তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, থিংক ট্যাংকগুলো অনুদান ও চুক্তির জন্য প্রস্তাব পেশ করার সামর্থ্য অর্জন করেছে। একই সঙ্গে গবেষক এবং প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞদের তারা একত্র করতে পারে। দ্বিতীয়ত, থিংক ট্যাংক এবং দাতা সংস্থাগুলোর সম্পর্ক দৃঢ় এবং প্রায়ই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যা করতে পারেনি। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়ে থাকতে পারে। উত্তরদাতারা স্বীকার করেছেন যে এর ফলে থিংক ট্যাংকগুলো প্রকল্পপ্রাপ্তি এবং গবেষণা করা নিশ্চিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় নির্ধারণে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে না পারলে, তারা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মতো কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই এক গবেষণা প্রকল্প থেকে অন্য গবেষণা প্রকল্পে কাজ করা শুরু করার ঝুঁকি নেয়। লাতিন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাহিদাভিত্তিক গবেষণা তহবিলের প্রভাব বিশ্লেষণ করে অ্যারোসিনা এবং সুটজ (২০০১) এই পরিস্থিতিকে প্রকল্প উন্মুখতা (call for projects) হিসেবে নামকরণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাবনা আহ্বান, গবেষণা অনুদানের আবেদন তৈরি, উপস্থাপন এবং ফলাফল সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেয়।

প্রায়ই অংশগ্রহণমূলক দাবি করা হলেও, যেসব জ্ঞান উৎপাদন এবং গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিষয়সূচি (জলবায়ু পরিবর্তন, নারী অধিকার, ক্ষুদ্রঋণ, দারিদ্র্য ইত্যাদি প্রাথমিক উদাহরণ) দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রভাবিত। এই প্রক্রিয়ায় থিংক ট্যাংকগুলো যে ফলাফল উৎপাদন করে সে ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তথ্যের গৌণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, ফলে প্রস্তাবনামূলক জ্ঞান তৈরি হয় (আন্তর্জাতিক দাতা, উন্নয়ন সংস্থা বা সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন, নীতির প্রভাব নিরীক্ষা এবং কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট গবেষণা)। উপাত্ত, তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা জরুরি, কারণ জ্ঞান উৎপাদন একটি সৃজনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক, দীর্ঘমেয়াদি শ্রমনির্ভর প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে বহুমাত্রিক বিষয় সংশ্লিষ্ট।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ ধরনের কাজ মূলত উপকরণমূলক। সাক্ষাৎকার দেওয়া একজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদের মতে, ১৯৬০-এর দশক থেকেই তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ঘাটতি ছিল। এই সময় থেকেই জ্ঞান উৎপাদন একদিকে আন্তর্জাতিক দাতাদের প্রয়োজন মেটানো এবং অন্যদিকে আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন থেকেই জ্ঞান উৎপাদন পিছিয়ে পড়ছে বলে তাঁর ধারণা। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্য হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দারিদ্র্যের

প্রভাব যাচাই করা, কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে গবেষণা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। এখানে দাতাদের স্বার্থই অধিক প্রাধান্য পায় এবং এর জন্যই থিংক ট্যাংকগুলোর সঙ্গে চুক্তি করা হয়। আন্তর্জাতিক দাতারা কঠোর সময়কাঠামো এবং অর্থ বরাদ্দ নিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা করে, যার ফলে থিংক ট্যাংকগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে পারে না। থিংক ট্যাংকগুলো খণ্ডকালীন বা অনিয়মিত গবেষকদের নিয়ে কাজ করে এবং এদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়। যারা উপাত্ত সংগ্রহ এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গবেষণা ফলাফল তৈরি করে। সম্পদের এই পরিব্যাপ্ত অবস্থার কারণে অনেক থিংক ট্যাংকের পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে অধিকাংশ থিংক ট্যাংকের প্রকাশনার মান খুব খারাপ বা নিম্নমানের। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পদোন্নতির জন্য বিদ্যায়তনিক প্রকাশনার সংখ্যা ও মানের কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার কারণে কর্মীরা মৌলিক গবেষণা করতে এবং উৎকৃষ্ট মানের গবেষণা ফলাফল তৈরিতে উৎসাহিত হয়।

থিংক ট্যাংকগুলো কি ট্যাংক (গোষ্ঠী)?

পূর্ববর্তী অংশে আমি থিংক ট্যাংকগুলোর চিন্তা করার সামর্থ্য আলোচনা করেছি। এই অংশে আমি দেখাব যে থিংক ট্যাংকগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান নয়, অর্থাৎ তারা ট্যাংকস (গোষ্ঠী) নয়। এর কারণ দুটি। প্রথম কারণটি তাদের ব্যাপ্তিযোগ্যতা (permeability) এবং দ্বিতীয় কারণটি তাদের ব্যক্তিত্বারোপের (personification) সঙ্গে সম্পর্কিত।

লাতিন আমেরিকায় অ্যারোসিনা এবং সুটজের গবেষণা অনুসরণ করে বলা যায়, থিংক ট্যাংকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কাজ করার ইচ্ছা থেকে লাভবান হয়। এই শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা কাঠামোকে দুটি কারণে পাশ কাটাতে চান। এদের কেউ কেউ তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং অন্যরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একাধিক চুক্তি করতে এবং বিভিন্ন পদে কাজ করতে চান। যে থিংক ট্যাংকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত এবং যাদের স্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য তহবিলের নিশ্চয়তা নেই, তারা আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসনের ঝুঁকিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে তারা বিদেশী সহযোগীদের ওপর নির্ভর করেন, ফলে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার দ্বার সব সময় উন্মুক্ত থাকে। পরামর্শ প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো তারা নিজেদের দাতা এবং সরকারের স্বার্থের মক্কেল হিসেবে উপস্থাপন করে। সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠান, যেমন এনজিওর মতো থিংক ট্যাংকগুলো দাতাদের তহবিল থেকে দীর্ঘদিন ধরে

লাভবান হয়ে আসছে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এর ফলে থিংক ট্যাংকগুলোও আকর্ষণীয় সুযোগে পরিণত হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া, কোর্স পড়ানো, অতিথি বক্তব্য বা থিংক ট্যাংকের জন্য পরামর্শক হিসেবে কাজ করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হন এবং এর ফলে একই সঙ্গে তাদের উপার্জন এবং সহযোগিতামূলক গবেষণার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। অনেকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থায়ী সম্পৃক্ততা স্থাপন করেন। উচ্চমানের অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তা থাকায় থিংক ট্যাংকগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হন। একই ব্যক্তি বিভিন্ন খাতে কাজ করেন। ফলে একই ব্যক্তি জ্ঞান সমাজ এবং সিভিল সমাজে কাজ করায়, এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যকার প্রাচীর ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নমনীয় চুক্তি-ব্যবস্থার ফলে থিংক ট্যাংকগুলোর গবেষণাকাজ এবং এর ফলাফলের মান বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান সমাজে বিদ্যমান ফাঁকফোকরগুলোর জন্য থিংক ট্যাংকগুলোর কিছুটা হলেও স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে। থিংক ট্যাংকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সেবা গ্রহণ করার মাধ্যমে দাতা, নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে।

অধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে শাসন-প্রক্রিয়ায় একধরনের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, এর ফলে সুশাসনের কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে থিংক ট্যাংকগুলো কাজ করে, সেই পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে গিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে শীর্ষ পদগুলো দেওয়া হয়, যা থিংক ট্যাংকগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। নীতিনির্ধারক এবং বৃহত্তর সমাজে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য থিংক ট্যাংকগুলোকে জনপরিমণ্ডলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে হয়। ফলে তাদের এমন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, যারা তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবহার করে থিংক ট্যাংকগুলোর বার্তা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পৌঁছে দিতে পারেন। ফলে দাতাদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক ও নীতিনির্ধারকদের কাছে একটি নির্দিষ্ট বিষয় অধিগম্য করতে এই প্রচারণা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছানোর জন্য ভিন্ন ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এই কাজটি করতে থিংক ট্যাংক বা গণমাধ্যমে তাদের প্রধান মুখপাত্রদের এসব আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় এবং একই সঙ্গে নিরপেক্ষ ও যথাযথ গবেষণা চালিয়ে যেতে হয়। কয়েকজন

উত্তরদাতা থিংক ট্যাংকগুলোর অধিপরামর্শমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার ঝুঁকির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন: গবেষণা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার পরিবর্তে আত্মপ্রচারকে (self-promotion) তারা অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে শুধু প্রধান ব্যক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু থিংক ট্যাংকগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে কোনো অবদান রাখে না।

নীতিনির্ধারণ এবং দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতাধর্মী আন্তযোগাযোগ

সিভিল সমাজের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয় ও থিংক ট্যাংকের মতো সিভিল সমাজের কর্মকদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতিকে এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শিক্ষক বা গবেষকদের জন্য খুব অল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, তাই তারা থিংক ট্যাংকগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। অন্যদিকে, থিংক ট্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থাও স্থিতিশীল নয়। এর ফলে স্বল্পমেয়াদি, ফলাফলধর্মী চুক্তিগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা তাদের দাতাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধ রাখে এবং আরোহী গবেষণাপদ্ধতির পরিবর্তে অবরোহী ব্যবহার করে। এতে করে আধিপত্যশীল জ্ঞানভাষ্যকে সমালোচনা এবং মোকাবিলা করার সৃজনশীলতা ও সামর্থ্য হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতি একই সঙ্গে গবেষণা প্রক্রিয়াকে দ্বিধাবিভক্ত করে এবং থিংক ট্যাংকগুলোকে অরাজনৈতিক, অতত্ত্বীয় উপাত্ত সংগ্রহমূলক কাজে সীমাবদ্ধ রাখে। থিংক ট্যাংকগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং থিংক ট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে খুব কম ক্ষেত্রেই নীতি-সংলাপ এবং তদবির (lobbying) কার্যক্রম ভূমিকা পালন করে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সতর্কভাবেই তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানে অটুট থাকেন। এটা বলা যায় যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ় অঙ্গীকারের অভাব থাকায় থিংক ট্যাংকগুলো নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রভাবিত করার সামর্থ্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারছে না।

নীতিনির্ধারণে থিংক ট্যাংকগুলোর অবদান রাখার সামর্থ্য শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে না। গবেষণানির্ভর অধিপরামর্শ গ্রহণ করতে সরকার কতটুকু প্রস্তুত, সেটাও বিবেচনার বিষয়। অধিকন্তু, সরকার থিংক ট্যাংকগুলোর সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক উপায় উন্মুক্ত করতে উৎসাহিত না হওয়ায়, থিংক ট্যাংকগুলোও রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয়গুলো এড়িয়ে চলার মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে। এতে করে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে, থিংক ট্যাংকগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ থিংক ট্যাংক নীতিনির্ধারকদের শুধু নীতিমালার প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে এবং অন্য বিষয়গুলো নিয়ে স্বল্পমাত্রার গবেষণা এবং অধিপরামর্শমূলক কাজ করে। কয়েকজন উত্তরদাতার মতে প্রতিবেদন, নীতি-মন্তব্য এবং পরিচয়ধর্মী প্রকাশনা প্রকাশ করা হয় এবং এগুলোর কিছু কিছু কেউ কখনো পড়েও দেখে না। সরকারের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে থিংক ট্যাংকগুলো নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার পরিবর্তে চিড় ধরা, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং প্রায়ই পৃষ্ঠপোষণধর্মী নীতি-প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মক্কেলে পরিণত হয়। তবে গন্তব্য (end) যাত্রাপথ (means) নির্ধারণে একক বিবেচ্য বিষয় হতে পারে কি না, তা এই প্রবন্ধের আলোচ্যসূচির বাইরে।

উপসংহার

একটি সক্রিয় সিভিল সমাজের উপস্থিতি আধুনিকতার একটি সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। জায়মান (nascent) এবং ভঙ্গুর গণতন্ত্রগুলোর জন্য এই সূচকটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুখ্যাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাথমিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ আর্থিক বাধা বা সর্বব্যাপী রাজনৈতিক আনুগত্যের সংস্কৃতির কারণে জ্ঞান উৎপাদনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্ভাবনাময় অবদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গবেষণা ফলাফলের মৌলিকত্ব এবং মানের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

জ্ঞান উৎপাদনকে বাণিজ্যিকীকরণের ফলে থিংক ট্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাভবান হয়, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। থিংক ট্যাংকগুলোর দেওয়া স্বল্পমেয়াদি গবেষণাকাজের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বাড়তি আয়, কাজের অভিজ্ঞতা এবং দাতা সংস্থাগুলোর কাছে পরিচিতি লাভ করেন। ফলে নীতি-সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে নীতি তৈরির কাঁচামাল তৈরি হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিক গবেষণা, আলোচ্য বিষয় এবং পূর্বানুমিত ও নির্ভরশীল অর্থসংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকায় থিংক ট্যাংকগুলোর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পন্থায় নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য হ্রাস পাচ্ছে।

নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করতে হলে থিংক ট্যাংকগুলোকে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখার মধ্যে একটি ভারসাম্য রাখতে হবে। উচ্চমানের গবেষণার জন্য বিদ্যায়তনিক কঠোরতা এবং স্বাধীনতা প্রয়োজন। অন্যদিকে, নীতি-প্রণয়নকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কও জরুরি। কিন্তু এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই মূল মুনশিয়ানার কাজ। ফলে থিংক

ট্যাংকগুলোর উচিত হবে নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক এবং নিয়মাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা এবং উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের মত হচ্ছে, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এবং দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে থিংক ট্যাংকগুলোর চিন্তা করা এবং নীতি-প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তৈরি করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যাবে। ফলে ব্রাউন এবং গ্যাভেনটারের (২০০৮) সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে হয়। তাদের মতে, একাধিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তদেশীয় গবেষণা নেটওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং থিংক ট্যাংকগুলোর জন্য দলীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের গুরুত্ব স্বীকার করলে, বাংলাদেশে এসব সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠান কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের বোধ আরও সুস্পষ্ট হবে। যদিও তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন থাকা এবং একটি সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করার সামর্থ্য অমীমাংসিত থেকেই যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং দুটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।

২. চীন, ভারত, জাপান, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পর।

গ্রন্থপঞ্জি

Abelson, D. E., ed. 2009. *Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes*. Montreal : Queen's University Press.

Ackoff, R. L. 1989. 'From Data to Wisdom'. *Journal of Applied Systems Analysis* 16 : 3-9.

'Adding value to politics: Reflection on Bangladesh's democratic governance.' 2015. *The Daily Star*, July 30.

www.thedailystar.net/op-ed/politics/reflection-bangladesh-democratic-governance-118564.

Arocena, R., and J. Sutz. 2001. 'Changing Knowledge Production and Latin American Universities.' *Research Policy* 30 (8) : 1221-1234. doi : 10.1016/S0048-7333(00)00143-8.

"Bangladesh's PM rejects claims of repression : 'I do politics for the people'." 2015. *The Guardian*, September 21.

www.theguardian.com/world/2015/sep/21/bangladesh-prime-minister-rejects-accusations-of-authoritarian-rule?CMP=share_btn_fb.

Bertucci, E. M., F. Borges-Herrero, and C. Fuentes-Julio. 2014. "Toward 'Best Practices' in Scholar–Practitioner Relations : Insights from the Field of Inter-American Affairs." *International Studies Perspectives* 15 (1): 54–72. doi:10.1111/j.1528-3585.2012.00511.x.

Birgeneau, R. J. 2005. 'The Role of the University and Basic Research in the New Economy.' In *Creating Knowledge, Strengthening Nations : The Changing Role of Higher Education,* edited by G. A. Jones, P. L. McCarney, and M. L. Skolnik, ix-xv. Toronto : University of Toronto Press.

Blair, H. 1998. 'Civil Society and Building Democracy : Lessons from International Donor Experience.' In *Civil Society and International Development*, edited by A. Bernard, H. Helmich, and P. B. Lehning, 65-80. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Blair, H. W. 2001. 'Civil Society, Democratic Development and International Donors.' In *Bangladesh : Promise and Performance*, edited by R. Jahan, 181-218. London : Zed Books.

Brown, D. L., and J. Gaventa. 2008. *Constructing Transnational Action Research Networks : Observations and Reflections from the Case of the Citizenship DRC.* Institute of Development Studies Working Paper 302. Brighton : IDS.

Devine, J. 2003. 'The Paradox of Sustainability : Reflections on NGOs in Bangladesh.' *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 590 (1): 227-242. doi :10.1177/0002716203257067.

Devine, J. 2006. 'NGOs, Politics and Grassroots Mobilisation : Evidence from Bangladesh.' *Journal of South Asian Development* 1 (1) : 77–99.

Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms : Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge : Polity Press.

Harsh, M., P. Mbatia, and W. Shrum. 2010. 'Accountability and Inaction : NGOs and Resource Lodging in Development.' *Development and Change* 41 (2) : 253–278.

Huque, A. S. 2011. 'Accountability and Governance : Strengthening Extra-bureaucratic Mechanisms in Bangladesh.' *International Journal of Productivity and Performance Management* 60 (1) : 59–74.

Huque, A. S., and M. T. Rahman. 2003. 'From Domination to Alliance : Shifting Strategies and Accumulation of Power by the Bureaucracy in Bangladesh.' *Public Organization Review* 3 (4) : 403-418.

Kaldor, M. 2003. 'Civil Society and Accountability.' *Journal of Human Development* 4 (1) : 5-27.

Kochanek, S. A. 2000. 'Governance, Patronage Politics and Democratic Transition in Bangladesh.' *Asian Survey* 40 (3) : 530–550. doi : 10.2307/3021160.

Lewis, D. 2004. 'On the Difficulty of Studying Civil Society : Reflections on NGOs, State and Democracy in Bangladesh.' *Contributions to Indian Sociology* 38 (3) : 299–322.

Maniruzzaman, T. 1992. 'The Fall of the Military Dictator : 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh.' *Pacific Affairs* 65(2) : 203-224. doi : 10.2307/2760169.

McGann, R., and K. Weaver, eds. 2011. *Think Tanks and Civil Societies : Catalysts for Ideas and Action.* New Brunswick : Transaction Publishers.

Parnini, S. N. 2006. 'Civil Society and Good Governance in Bangladesh.' *Asian Journal of Political Science* 14 (2) : 189–211. doi : 10.1080/02185370601063191.

Parnini, S. N. 2009. 'Public Sector Reform and Good Governance: The Impact of Foreign Aid on Bangladesh.' *Journal of Asian and African Studies* 44 (5) : 553–575.

Pautz, H. 2011. 'Revisiting the Think-tank Phenomenon.' *Public Policy and Administration* 26(4): 419-435. doi: 10.1177/0952076710378328.

Peters, M. A. 2003. 'Classical Political Economy and the Role of Universities in the New Knowledge Economy.' *Globalisation, Societies and Education* 1(2): 153-168. doi : 10.1080/1476772032000105483.

Rashid, A. K. 2013. 'Efficacy of Think Tanks in Influencing Public Policies : The Case of Bangladesh.' *Asian Journal of Political Science* 21 (1) : 62–79. doi:10.1080/02185377.2013.793561.

Rowley, J. 2007. 'The Wisdom Hierarchy : Representations of the DIKW Hierarchy.' *Journal of Information Science* 33 (2) : 163–180. doi : 10.1177/0165551506070706.

Sarker, A. E. 2008. 'Patron-Client Politics and Its Implications for Good Governance in Bangladesh.' *International Journal of Public Administration* 31(12): 1416–1440. doi:10.1080/01900690802194966.

Srivastava, J. 2011. *Think Tanks in South Asia : Analysing the Knowledge-Power Interface.* London : Overseas Development Institute.

UCG. 2013. 'List of Private and Public Universities.' University Grants Commission of Bangladesh. Accessed November 18, 2015. www.ugc.gov.bd/university/?action=private.

'UK notes concern over civil society, press freedom.' 2014. *The Daily Star,* October 17. www.thedailystar.net/uk-notesconcern-over-civil-society-press-freedom-46130.

Van der Borgh, C., and C. Terwindt. 2012. 'Shrinking Operational Space of NGOs–a Framework of Analysis.' *Development in Practice* 22 (8) : 1065–1081.

White, G. 1994. 'Civil Society, Democratization, and Development (I): Clearing the Analytical Ground.' *Democratization* 1(3) : 375–390.

Zafarullah, H. 2007. 'Bureaucratic Elitism in Bangladesh : The Predominance of Generalist Administrators.' *Asian Journal of Political Science* 15 (2): 161-173. doi : 10.1080/02185370701511339.

Zafarullah, H., and R. Rahman. 2008. 'The Impaired State : Assessing State Capacity and Governance in Bangladesh.' *International Journal of Public Sector Management* 21(7) : 739-752.

পরিশিষ্ট-১

সাক্ষাৎকারদাতাদের তালিকা :

প্রতিষ্ঠান	অংশগ্রহণকারীদের নাম	বর্তমান পদ
ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স স্টাডিজ	মনজুর হাসান, ওবিই	ইনস্টিটিউশনাল অ্যাডভাইজর, আইজিএস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
	ড. সুলতান হাফিজ রহমান	ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি
	ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	ডিস্টিংগুইশ ফেলো
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	ড. বিনায়ক সেন	গবেষণা পরিচালক
	ড. এস এম জুলফিকার আলী	গবেষণা এবং যোগাযোগ পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ	মুন্সি ফায়েজ আহমদ	চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্ন্যান্স
	ড. শাহীন আফরোজ	গবেষণা পরিচালক
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ	ড. আহসান এইচ মনসুর	নির্বাহী পরিচালক
	অধ্যাপক বজলুল খন্দকার	সিনিয়র ফেলো
পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার	ড. হোসেন জিল্লুর রহমান	নির্বাহী চেয়ারম্যান
	খন্দকার সাখাওয়াত আলী	রিসার্চ ফেলো (বর্তমানে ফেলো : অনুবাদক)
উন্নয়ন অন্বেষা	রাশেদ তিতুমীর	চেয়ারম্যান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক মাহবুবুল মোকাদ্দেম আকাশ	অর্থনীতির অধ্যাপক
	ড. মাহবুবা নাসরিন	ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	ড. মানস কুমার চৌধুরী	নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	ড. শামসুল হক	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইসিসিসিএডি) পরিচালক
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	ড. এম ইমদাদুল হক	চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব জেনারেল অ্যান্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন
	অধ্যাপক এটিএম নুরুল আমিন	অধ্যাপক এবং ডিন
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	জামিলুর রেজা চৌধুরী	উপাচার্য

পর্যালোচনা নিবন্ধ

ইতিহাসের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাশেদ রাহম

প্রাক্-কথন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ বছর পূর্তি হতে আর মাত্র চার বছর বাকি। একটি জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পালাবদলের প্রধানতম কেন্দ্র হিসেবে গত ছিয়ানব্বই বছরে তার অর্জন ও বিসর্জনের তালিকা অনেক দীর্ঘ। কিন্তু তার অতীতের বিপুলতর সাফল্য এবং বর্তমানের পাহাড়ভারী জরাগ্রস্ততার উৎস ও কারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ও গবেষণামূলক আলোচনার পরিমাণ লজ্জাজনকভাবে কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যা বড়জোর এক কুড়ি। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষাপরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত করে কয়েকটি বই লেখা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস ছিল ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ড. এম এ রহিমের *The History of The University of Dacca* (১৯৮১) বইটি[১]। এই বইতে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ষাট বছরের একাডেমিক ও অবকাঠামোগত বিকাশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বিশ্লেষণ ছিল সামান্য, তথ্যগত অনেক দুর্বলতাও আছে। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ পর্যন্ত প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতার সংকলন[২]। এই সংকলন অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। তবে এই বইয়ের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো, এটি আমাদের উচ্চশিক্ষাদর্শনের ব্লুপ্রিন্ট, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগত পরিবর্তন বোঝার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ব্যক্তি উদ্যোগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড়

ভলিউমে কাজ করেছেন রতন লাল চক্রবর্ত্তী। প্রাথমিক উৎস ও দুষ্প্রাপ্য দলিলাদি ব্যবহার করে তিনি রচনা করেছেন ৪৪৭ পৃষ্ঠায় *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রন্থিত ইতিহাস*[৩], ১১৮৮ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)*[৪], ৩৭৬ পৃষ্ঠায় *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ (১৯২১-২০০০)*[৫] ও *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ১৯২১-১৯৫২*[৬]। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে আকর-উৎসের যে স্বর্ণখনি অযত্নে-অবহেলায় পোকার খাবার হচ্ছে, তার সদ্ব্যবহার রতন লাল চক্রবর্ত্তীর মতো আর কোনো গবেষক করতে পারেননি। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান দুই কান্ডারি নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী[৭] লেখার কৃতিত্ব তাঁর। এসব জীবনীতে পুরোনো পত্রিকা ও দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শনের বর্ণনা ও ছবি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন আয়শা বেগম[৮]। রঙ্গলাল সেন ও রফিকুল ইসলাম লিখিত বই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন কিন্তু পুরোপুরি গবেষণানির্ভর নয়[৯]। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের ইতিহাস রচনার প্রয়াসও লক্ষ করা গেছে।[১০] এর বাইরে প্রকাশিত হয়েছে কালপঞ্জি ধরনের কয়েকটি বই।[১১] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জীবনী, আত্মজীবনী ও সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণামূলক রচনা, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ স্মারকগ্রন্থ—এসবের পরিমাণ বিশাল। তবে এসব তো ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদান মাত্র। উচ্চশিক্ষা-সম্পর্কিত কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে[১২], যেগুলোতে আবশ্যিকভাবে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। কিন্তু জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান; রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ষণক্ষেত্র এই প্রতিষ্ঠানের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে সামগ্রিক কোনো গবেষণা হয়নি। ২০১৬ সালে এসে এই খরা কিছুটা হলেও কেটেছে। পতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমা প্রকাশনের কল্যাণে এক বছরেই আমরা পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনটি গবেষণাগ্রন্থ। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে বেরিয়েছে ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইফতেখার ইকবাল সম্পাদিত *University of Dhaka : Making Unmaking Remaking* শীর্ষক ইংরেজি সংকলনগ্রন্থ, ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছে সৈয়দ আবুল মকসুদের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা* নামের বই। বছর শেষে বেরিয়েছে একই লেখক লিখিত এই বইয়ের সম্পূরক *স্যার ফিলিপ হার্টগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য* শীর্ষক বই। প্রথম বইটির শিরোনামই বেশ ইঙ্গিতবহ। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনবদ্য ইতিহাস, এর পতিত হওয়ার দুঃখজনক কারণ ও পুনরুজ্জীবনের রূপরেখা আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বিতীয় বইটি প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের প্রথম দুই দশকের 'অনুসন্ধানমূলক' আলোচনার প্রয়াস। এই বইয়ের জন্য কৃত গবেষণার একটি বর্ধিত ফলাফল হলো তৃতীয় বইটি। এই তিনটি বই একসঙ্গে পাঠ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক শ বছরের বিবর্তনের একটা স্বচ্ছ রেখা ফুটে ওঠে। বইগুলোতে আলোচিত বিষয়বস্তু বিবেচনা করে আমরা প্রথমে বাংলা বই দুটি এবং তারপর ইংরেজি সংকলনগ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা

সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রথমা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

১.

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি সর্বপ্রথম তোলেন 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর অনারারি জয়েন্ট সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সাহেবজাদা আফতাব আহমেদ খাঁ। ১৯০৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের বিশতম অধিবেশনে তিনি এই দাবি করেন। চার বছর পর ১৯১০ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে পরিষদ সদস্য বাবু অনঙ্গ মোহন সাহা ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি হাইকোর্ট স্থাপনের দাবি তোলেন। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট 'পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি' ও 'প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ারকে বিদায় ও নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সি বেইলিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানায়। একই বছর ৮ অক্টোবর বেইলি লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিলেও বঙ্গভঙ্গ রদ-পরবর্তী আহত মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি নিজেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। ২ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক সরকারি ঘোষণা আসে। ২৭ মে রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।[১৩]

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণাটি কার মস্তিষ্কপ্রসূত, কার দাবি সরকারকে বেশি প্রভাবিত করেছিল, এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ভিন্নমত আছে। অনেক গবেষকই তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই মুসলিম নেতাদের এই কৃতিত্ব দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। ড. সুফিয়া আহমেদ দাবি করেছেন, নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সাল থেকেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছিলেন।[১৪] ড. আবদুর রহিম বলেছেন, মুসলিম প্রতিনিধিদল হার্ডিঞ্জের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানিয়েছিলেন।[১৫] বর্তমান গ্রন্থের লেখকও একই মত পোষণ করেছেন। তথ্যসূত্রের উল্লেখ ছাড়াই তিনি বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান নেতারা 'আঘাত পান ও হতাশ হন। তাঁরা তখন দাবি জানান ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। মুসলমান নেতাদেরও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ সরকার নীতিগতভাবে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে।' (পৃ. ২৯)

কিন্তু ইতিহাসের ভিন্ন এক বয়ানও আমাদের সামনে হাজির করেছেন গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। তথ্যপ্রমাণসহ তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, ১৯১২ সালে হার্ডিঞ্জের ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ ঢাকার মুসলমান নেতা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করছিলেন। পূর্বোল্লিখিত আফতাব আহমেদ ও অনঙ্গ মোহনের দাবির পক্ষে তাঁরা কোনো বক্তৃতা-বিবৃতিও দেননি। বরং, ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ যে সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। এমনকি ১৯১১ সালেও (১৫ ও ১৭ মার্চ) তিনি তাঁর বাসভবনে সভা করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং অন্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এই সভাতেই সলিমুল্লাহকে সভাপতি করে গঠিত হয় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক চাঁদা কমিটি'। তাঁর প্রধান রাজনৈতিক সহযোগী নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৮ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সভায় প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম ভারতের একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, পূর্ববঙ্গ এখনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত নয়। চাঁদা তোলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রধান কর্মযোগী। ১৯১১ সালের মার্চের পরে তিনি মাওলানা শওকত আলিসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার চাঁদা (নগদ আদায় ও প্রতিশ্রুত) সংগ্রহ করেন। মুসলমান নেতারা যে আলীগড়-চিন্তায় অভিভূত ছিলেন তার প্রমাণ হলো, ১৯১২ সালের ২০ ডিসেম্বর আটটি দাবি-সংবলিত মুসলিম নেতাদের যে পত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পাঠানো হয় তাতে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা উন্নতিসংক্রান্ত কয়েকটি দাবি থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উল্লেখ ছিল না। ফলে, মুসলিম নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মত গবেষণাসিদ্ধ নয়।[১৬]

২.

১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি ঘোষণা আসার পর প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও উকিল শ্রেণি এর বিরোধিতা শুরু করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে এই উদ্যোগকে 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গ-বিভাগ' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করেন। বিরোধিতাকারী অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি, ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, পেয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা চরণ মজুমদার। ঢাকার হিন্দু নেতাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী আইনজীবী ও সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু প্রমুখ। বিরোধিতাকারী কংগ্রেসপন্থী মুসলমান নেতাদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, মাওলানা আকরম খাঁ, মৌলবি আবুল কাসেম, বিহারের মৌলবি লিয়াকত হোসেন।[১৭]

কোনো তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখানো ছাড়াই বর্তমান গ্রন্থের লেখক বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম হলো ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতাকারীদের কেউ কেউ নিজেদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও বোলপুরে একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জাল বুনছেন'। পূর্ববঙ্গ তাঁর আয়ের উৎস হলেও পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁর কোনো দরদ ছিল না। এসেছেন মাত্র দুবার, ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট নিতেও আসেননি। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট নিজে গিয়ে গ্রহণ করেছেন। এ রকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপনের পর লেখক তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 'ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার কারণ সহজেই বোঝা যায়।' (পৃ. ৫৮) এসব মন্তব্যের পক্ষে লেখক কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ১৯০৭-০৮ সাল নাগাদ তিনি 'আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে' উঠতে পেরেছেন বলে মনে করা হয়।[১৮] তাঁর সেই সময়ের বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখিতেও সেই ছাপ পাওয়া যায়। যেমন ১৯০৮ সালে কংগ্রেসের পাবনা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন,

> মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে

> সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি।[১৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার এক বছর আগে লিখিত 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> ...যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়।...হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।[২০]

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন, এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়নি। ১৯১২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে কলকাতা, ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত কমপক্ষে ১১টি সভার কথা উল্লেখ করেছেন ড. আবদুল্লাহ।[২১] এসব সভার কোনোটিতে রবীন্দ্রনাথ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতি পাঠিয়েছেন তার কোনো প্রমাণ নেই।

এখানেই শেষ নয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কোনো গবেষণার[২২] উল্লেখ না করেই তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বিশ্বভারতী ধাঁচের শিক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রগঠনকারী মানুষ তৈরিতে সক্ষম নয়। শিক্ষা বিষয়টির সঙ্গে মান জড়িত। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সেই মানের প্রশ্নে আপসহীন। রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরি করতে পারে—সুযোগ্য প্রশাসক ও বিজ্ঞানী নয়।' রবীন্দ্রনাথের বহুবিধ পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রধান পরিচয় হলো তিনি একজন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা এখনো প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে বর্তমান লেখক যেখানে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভারতের ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বভারতীর স্থান একাদশ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার কালে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা ছিল উত্তুঙ্গে। মুসলমান সমাজে তখন তিনি গৃহীত হননি। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িকীকরণের চূড়ান্ত ঘটে। তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয় তথাকথিত জাতীয় সংহতি টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে। কিন্তু বাঙালির ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে তিনি হয়ে ওঠেন 'সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তি'।[২৩] ১৯৭১ সালে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যেমন মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিনাশ ঘটেনি, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে

ব্যাখ্যা করার প্রবণতাও কমজোর হয়নি। সেই প্রবণতার একটি 'বাজারে' প্রোপাগান্ডা হলো, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান 'অনুসন্ধানমূলক অভিসন্ধর্ভে'র লেখকও সেই প্রোপাগান্ডাতে অংশ নিয়েছেন।

৩.

আবুল মকসুদের এই বইটিতে তথ্যগত ভুলও পাওয়া যায়। যেসব হিন্দু বুদ্ধিজীবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সমান প্রবেশাধিকার থাকবে। তাঁরা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিযোগ তুলতে থাকেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি 'ভালো কলেজ' ঢাকা কলেজকে ধ্বংস করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক আক্রমণ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজ প্রশাসকেরাও তা থেকে মুক্তি পাননি। 'তিন ইহুদি একত্র হয়েছে, এটার সংস্পর্শ দোষ ঘটেছে, এটা টিকবে না।'[২৪] তিন ইহুদি ছিলেন উপাচার্য পি জে হার্টগ, গভর্নর জেনারেল লর্ড রিডিং ও ভারত সচিব মন্টেগু। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন, 'বলা বাহুল্য, এঁদের তিনজনের সবাই যে ইহুদি ছিলেন, তার প্রমাণ নেই।' (পৃ. ৫২) অথচ এই তিনজন শুধু ইহুদি ছিলেন না, ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইহুদিদের অন্যতম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পি জে হার্টগ যে ইহুদি ছিলেন, তার প্রমাণ বর্তমান লেখক লিখিত হার্টগের জীবনীগ্রন্থেই পাওয়া যাবে। ভারত সচিব মন্টেগু (১৮৭৯-১৯২৪) ছিলেন ব্রিটেনের দ্বিতীয় ইহুদি মন্ত্রী। ১৯১৯ সালে ইংল্যান্ড ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'ট্রিয়েটি অব সার্ভ'-এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতে যে খেলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার বিরোধী। 'জায়োনিজম' এবং ইহুদিদের আলাদা 'হোমল্যান্ড' ধারণার কট্টর বিরোধী এই লিবারেল রাজনীতিবিদকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রস্তাবের (১৯১৯) জন্য ভারতের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্রিটিশ শাসক বলে মনে করা হয়। ১৯২৪ সালের ১৫ নভেম্বর তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার জামনগরে তাঁর মূর্তি উন্মোচনকালে মহারাজা জাম সাহেব তাঁকে 'intellectually, the most brilliant statesman and best friend India ever had since, perhaps, Edmund Burke' হিসেবে অভিহিত করেন।[২৫] ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিডিং (১৮৬০-১৯৩৫) ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রথম কয়েকজন ইহুদি মন্ত্রীর একজন, প্রথম ইহুদি লর্ড চিফ জাস্টিস অব ইংল্যান্ড, প্রথম ও এখনো পর্যন্ত একমাত্র ব্রিটিশ ইহুদি যিনি 'marquessate' হিসেবে ভূষিত হয়েছেন।[২৬]

৪.

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার কারণে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এত উৎসাহ-আয়োজন দেখালেও লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবের পর পূর্ববঙ্গের মুসলমান নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর (১৯১৪) পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নকে নিজের প্রধান রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বানিয়ে এই লক্ষ্যে মাঠে-ময়দানে-লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে দাবিদাওয়া পেশ ও চাপ প্রয়োগ করে অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দেন নওয়াব আলী চৌধুরী। এ ছাড়া আরও যেসব নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব সিরাজুল ইসলাম, স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, আবদুল করিম, এ কে ফজলুল হক, আহছানউল্লাহ প্রমুখ (পৃ. ৫৫-৬৯)।

সৈয়দ শামসুল হুদার ভূমিকা উঠে এসেছে বইটিতে। বিস্মৃতপ্রায় এই নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট কমানোর প্রতিবাদ করেন। ঢাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় যেন 'উন্নত মানের আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়' হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে পূর্ববঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে সেই ব্যাপারে তিনি সরব ছিলেন। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভালো বরাদ্দ দেওয়া, ভালো শিক্ষক নিয়োগ, আধুনিক লাইব্রেরিসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতেও তিনি সোচ্চার ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ঘোষণার পর থেকে বিশ্বযুদ্ধ, সরকারের আর্থিক অসংগতিসহ অসংখ্য কারণে এই প্রকল্প পিছিয়ে যায়। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পকে সরকারের অগ্রাধিকারে রাখার জন্য রাজনীতির মঞ্চে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। শুধু হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণি নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নে তাঁকে আলীগড়পন্থীদেরও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাঁদের আশ্বস্ত করতে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তা প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না।[২৭] বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নাথান কমিটির ২৫টি সাব-কমিটির ৬টিতেই তিনি সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'আঞ্চলিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৬ হাজার টাকার তহবিল দান করা ইত্যাদি ছিল তাঁর অনন্য অবদান। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু পুরাণ প্রাধান্যের পাঠ্যপুস্তকের বদলে যেন মুসলমানদের পছন্দসই পাঠ্যপুস্তক চালু করা হয়, এই ছিল তাঁর একটি সব সময়ের দাবি। মাতৃভাষা প্রশ্নে সমসাময়িক মুসলিম নেতাদের মতো আচ্ছন্নতায় না ভুগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: 'আমাদের মাতৃভাষা উর্দু নয়, বাংলা।' এই জনদরদি নেতা দীর্ঘদিন বিস্মৃত থাকার পর সম্প্রতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামে একটি অডিটোরিয়াম তৈরি করেছে (পৃ.৬৪-৬৬)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নে নিবেদিত আরেকজন মুসলিম নেতা ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। মুসলমানদের শিক্ষা প্রসঙ্গ ছিল তাঁর রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু মুসলমানরা উপকৃত হবে, এই তত্ত্বের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি এর বিরোধিতা করেন, পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি যে বৈষম্য হচ্ছে তার ব্যাপারে তিনি সোচ্চার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি, ছাত্রদের সমস্যার খোঁজখবর করতে নিয়মিত আসতেন। আরেকজন মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি হলেন খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ। শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হওয়ায় তিনি সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে থাকতেন এবং মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করে গেছেন (পৃ. ৬৯-৭২)।

৫.

৩৯২ পৃষ্ঠার বইটি এগারোটি ভাগে বিভক্ত। 'প্রস্তুতিপর্ব' শীর্ষক প্রথম ভাগে লেখক আরও দেখিয়েছেন কীভাবে মুসলিম নেতাদের পশ্চাৎপদতার কারণে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার তুলনায় মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ কীভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও মুসলমানরা বিশেষ উপকৃত হতে পারছিল না। এই বৈষম্যের ফলে মুসলমান নেতারা 'আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন এবং হিন্দু 'অধিপতি শ্রেণি' তা সহানুভূতির সঙ্গে দেখেননি। তাই বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর মুসলমান নেতারা হতাশ হয়ে পড়েন। এই হতাশা ও বঞ্চনাবোধ ক্রমে ঘনীভূত হয় এবং একসময় রাজনৈতিক চেতনায় পরিণত হয়। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম এবং কালক্রমে দেশ ভাগ হয়। লেখক এরপর বলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ প্রথম থেকে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা পেলে এবং তাঁদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হতো না।' (পৃ. ৩৩-৩৪) এ মন্তব্য অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট এবং বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের নানামুখী মাত্রাকে অস্বীকার করে।[২৮]

৬.

বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম 'ভূগোল'। ১৬১০ সালের মোগল রাজধানী ঢাকা ১৭০৪ সালের পর তাঁর জৌলুশ হারিয়ে অবহেলিত শহরে পরিণত হয়। ১৭০৪ সালে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা আবারও প্রাণ ফিরে পায় ১৯০৫

সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ার পর। রমনা, নীলক্ষেত, মিন্টু রোড, হেয়ার রোড এলাকাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় নতুন শহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলেও ঢাকা নতুন করে বিকশিত হয় এবং প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়। নতুন প্রদেশের সরকারের জন্য নির্মিত লাল ইটের ভবনসমূহ, রমনার ছায়াঘেরা সবুজ পরিবেশে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত জায়গা ও অবকাঠামো, চিত্ত ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের উপযোগী নির্মল পরিবেশ নিয়েই যাত্রা শুরু করে উপমহাদেশের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য ও ভারতের জন্য অভিনব প্রাকৃতিক ও শিক্ষাপরিবেশ উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণা থেকে। যথার্থভাবেই একে বলা হতো 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'। উঠে এসেছে ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য, ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবন, সামাজিক জীবন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, চল্লিশের দশকের ঢাকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পৃ. ৭৩-৯৯)।

কিন্তু কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর। পুরোনো হাইকোর্ট ভবন সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, ভবনটি শতাব্দীর শুরুতে নতুন প্রদেশের আইন পরিষদ ভবন ছিল, কিন্তু কোনো অধিবেশন বসেনি। তারপর সেটিকে প্রাদেশিক লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসভবন করা হয়, কিন্তু প্রথম গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সেখানে বাস করেননি (পৃ. ৭৭)। অন্য জায়গায় লিখেছেন, এই ভবনটি নির্মিত হয়েছে ১৯০১-০২ সালে। এরপর তিনি হাকিম হাবিবুর রহমান (আসুদেগানে ঢাকা) উদ্ধৃত করেন, যা তাঁর আগের বক্তব্যের বিপরীত—বাংলা ও আসাম মিলে স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ার পর লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলারের বাসভবন হিসেবে নির্মিত হয়, তিনি পছন্দ না করায় তা প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু কোনো অধিবেশন বসেনি (পৃ. ৯১)।

৭.

তবে এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নবাবদের প্রদত্ত জমি। লেখক জানাচ্ছেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র উল্লেখ না করেই, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘোষিত হতেই নবাব সলিমুল্লাহ নবাব এস্টেটের জমি দেওয়ার অঙ্গীকার করেন এবং সে অনুযায়ী ৬০০ একর জমি দেওয়ার ঘোষণা করেন। প্রধানত নবাবদের জমিতেই এবং সরকারি ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এসব ভবনের মধ্যে রয়েছে কার্জন হল, পুরোনো ঢাকা কলেজ (ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের সাদা বাড়ি), ঢাকা মেডিকেল কলেজের মূল ভবন প্রভৃতি (পৃ. ৮১)। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনটি নবাবদের প্রদত্ত কিংবা তাঁদের জায়গায় তৈরি

তার কোনো উল্লেখ লেখক করেননি।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে নীলক্ষেত থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ১৮৩৯ বিঘা জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে জমি বরাদ্দ দেওয়ার কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য ১৯২৩ সালে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি করা হয় এবং কমিটি-সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে, জরিপ করে দেখে সেখানে অত জায়গা নেই। শেষ পর্যন্ত ৭২৮ বিঘা জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইজারা দেওয়া হয় এবং ১৯২৮ সালের মার্চে সরকারের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়। যদিও ১৯২১ সালের এক আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে এসব ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের জমিসংক্রান্ত আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫৭.৭৭০ একর জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়। এর বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়কে নবাবদের দেওয়া ৩০০ একর জমি ছিল, যার বেশির ভাগ পরে বেদখল হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের চুক্তিপত্র পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে, ১৯৩৬-এর চুক্তির কোনো তথ্যসূত্র পর্যন্ত দেওয়া নেই (পৃ. ৮১-৮২)।

সলিমুল্লাহর জীবনীকার আমাদের এই সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি।[২৯] বাংলাদেশ সরকারের ভূমি সংস্কার অফিসের ওয়েবসাইট থেকে আমরা জানতে পারি,

> ১৯০২ সালে আহছানউল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ জমিদারির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই পারিবারিক কোন্দল শুরু হয় এবং সলিমুল্লাহ পরিবারটির উপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। জমিদারি ব্যবস্থাপনায় এত বেশি ফাটল ধরে যে, সরকারকে প্রদত্ত খাজনার বকেয়া এবং এস্টেটের দেনা ক্রমাগতভাবে বাড়তেই থাকে। এ পর্যায়ে সরকার রাজনৈতিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে নওয়াব সলিমুল্লাহকে অর্থ ও অন্যান্য সকল প্রকার সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করেন। ব্রিটিশ সরকারের এ সাহায্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সলিমুল্লাহকে ১৯০৮ সালে একটি বড় অঙ্কের ঋণ প্রদান করা, যে ঋণ দিয়ে তিনি হিন্দু মহাজনদের নিকট তাঁর ব্যক্তিগত সকল দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম হন।

ঔপনিবেশিক সময়ে একটি সরকারি নীতি ছিল দেশীয় অনুগত ভূস্বামীদের জিইয়ে রাখা। এর নেপথ্যে ছিল শাসকশ্রেণির ওপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমাগত চাপ। এমনি এক পরিস্থিতিতে ভগ্নপ্রায় ও টলটলায়মান ঢাকা নওয়াব এস্টেটকে ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নিয়ে আসা হয়। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে এস্টেটটির প্রথম ব্যবস্থাপক ছিলেন এইচ সি এফ মেয়ার। তারপরে আসেন এল জি পিলেন, পি জে গ্রিফিথ এবং পি ডি মার্টিন। তাঁরা সবাই ছিলেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। ১৯৫০ সালের ইস্ট বেঙ্গল এস্টেট একুইজিশন অ্যাক্টের অধীনে ১৯৫০ সালে ঢাকা নওয়াব এস্টেটের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। কেবল আহসান মঞ্জিল প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন জমিজমা

এবং অন্যান্য স্থানে যেসব জমি রায়তিস্বত্বে খাসজমি ছিল সেগুলো এই অধিগ্রহণ আইনের আওতার বাইরে থাকে।[৩০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঋণদায়গ্রস্ত নবাবের এস্টেট সরকার অধিগ্রহণ করে এবং তা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে চলে যায়। ফলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাবদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,

> ...নওয়াব পরিবারের টাকায় নয়; নওয়াব পরিবারের জায়গাতেও নয়। রমনার যে জায়গায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এর পুরাই খাসমহল, সরকারের জমি। সেটলমেন্ট রিপোর্ট-এ তাই আছে। ...এটার ভেরিফিকেশন তো সোজা। যে কেউ ইন্টারেস্টেড, সে ঢাকা কালেক্টরেটে যেয়ে দেখে আসতে পারেন।[৩১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ইতিহাস-সম্পর্কিত সেই চ্যালেঞ্জ লেখক গ্রহণ করেননি।

৮.

'উদ্বোধন' শীর্ষক বইয়ের তৃতীয় ভাগে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে শুরুর দিনগুলোর কথা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয় 'বাস্তবে রূপায়িত' হয় ১৯২১ সালে। এর আগের কর্মযজ্ঞ ছিল রাজসিক। লেখকের ভাষায়, নতুন প্রদেশ গঠনকালের চেয়েও 'বেশি চাঞ্চল্য আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়।' ব্রিটেন থেকে নিয়ে আসা হয় শিক্ষাবিদ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের—উপাচার্য পি জে হার্টগ, প্রকল্প পরিচালক এইচ ই স্টেপলটন, খ্যাতনামা স্থপতি মি গ্যারেথ। স্টেপলটন একসময় ঢাকার ইন্সপেক্টর অব স্কুল হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯২০ সালের ১১-১২ মার্চ নর্থব্রুক হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত-বিষয়ক এক অনুষ্ঠানের একজন আলোচক হিসেবে তিনি 'আ ইউনিভার্সিটি ইন দ্য মেকিং' শিরোনামে একটি পেপার উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা তুলে ধরে আশা প্রকাশ করেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঢাকা 'পূর্ব বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক রাজধানী' হয়ে উঠবে। তিনি চেয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক শক্তিশালী 'স্কুল অব হিস্টরি', 'প্র্যাকটিক্যাল স্কুল অব সোশ্যাল ইকোনমিকস'। 'বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিষয়ে সেটিই প্রথম লেখা এবং সবচেয়ে প্রামাণিক ও যথার্থ দলিল।' স্টেপলটনের এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক পুস্তিকাটি দেখেছেন (পৃ. ১০০-১০৪)। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো তথ্যসূত্র হিসেবে তার কোনো উল্লেখ করেননি, এমনকি প্রকাশকালও না, গ্রন্থপঞ্জিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। তাই লেখকের চোখের দেখায় আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

'বলধা গার্ডেনে উপাচার্যের ভাষণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি আমাদের 'তদবির-সংস্কৃতি'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। প্রথম উপাচার্য হার্টগ কলকাতায় এসেই তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সমঝোতার আয়োজন করে ঢাকায় আসেন ১৯২০ সালের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব ছিল দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ দেওয়া। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তদবিরের আয়োজন-পরিকল্পনা করতে থাকেন 'ঢাকার হিন্দু সমাজপতিরা'। ১৯২১ সালের ৭ জানুয়ারি বলধা গার্ডেনের নতুন উপাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নবাববাড়ির সদস্য, আইনজীবী, সরকারি কর্মকর্তাসহ ঢাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সংবর্ধনা সভায় উপাচার্য হার্টগ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তিনি আশা পোষণ করেন, 'একটি মহান ও সমৃদ্ধ "বাংলাদেশ" গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশাল ভূমিকা রাখবে।' হার্টগ তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট জানিয়ে দেন, মুসলমানদের শিক্ষায় সুযোগ করে দেওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলেও এটি কোনো মুসলিম কিংবা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হবে না, এটি হবে সবার জন্য উন্মুক্ত। এটি হবে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য সম্মিলন। বক্তব্যে তিনি আয়োজকদের জানিয়ে দেন, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবেন। বিলেতের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও বিকাশের সাক্ষী হার্টগ উপস্থিত নাগরিকদের কাছে কীভাবে নাগরিকদের আনুকূল্যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তবু আয়োজকেরা ক্ষান্ত হননি। তাঁরা শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত 'উপদেষ্টা কমিটি'র ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। তাঁদের প্রধান আশঙ্কা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান-প্রাধান্য সৃষ্টি হবে। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় (পৃ. ১০৪-১১২)।

উপাচার্য হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। উপমহাদেশের পরিবেশে নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ শিক্ষাপ্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বিশেষত ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে ভূমিকা, স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS) প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হওয়ায় এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবেই তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনেও একজন 'প্রভাবশালী ও সবচেয়ে সক্রিয়' সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে স্যার হার্টগের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর স্ত্রী ম্যাবল হার্টগের কাছেও এই জনগোষ্ঠীর

দায় আছে। তখনকার রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ছাত্রীদের এসকর্ট দিয়ে আনা-নেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে নারীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এই কীর্তি অবিস্মরণীয়। এখানে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে, হার্টগ ম্যাবলের চেয়ে ৫১ বছরের বড় ছিলেন (পৃ. ১১৪); ম্যাবলের বইয়ের শিরোনাম *India: New Patter*-এর স্থলে 'Ptters' এসেছে (১১৪); হার্টগের বই *Words in Action*-এর নাম হয়ে গেছে *World in Action* (পৃ. ১১৫)।

প্রকল্প ঘোষণার প্রায় এক দশক পর ১৯২১ সালের ২১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। কিন্তু তার শুরুটাও ছিল বন্ধুর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সারা ভারতের শিক্ষা পরিবেশ বিপর্যস্ত। অনেকটা 'অনাড়ম্বর কিন্তু ভাবগম্ভীর' পরিবেশে সম্পন্ন হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করলে অনগ্রসর মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে ফজলুল হকসহ পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান অনেক নেতা অসহযোগ আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন, কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়। উপাচার্য হার্টগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আদর্শের ফলে উচ্চ বেতনে সারা ভারতের সেরা শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে ইংরেজ শিক্ষকদের তুলনায় ভারতীয়দের বেতন ছিল অনেক কম। এ নিয়ে ভারতীয় শিক্ষকেরা মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ভুগতেন, তা জানা যায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিচারণা থেকে। ফলে কোনো কোনো শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে সরকারি কলেজে যোগ দেন বা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিল বিভাজন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-কলকাতা, উঁচু ডিগ্রিধারী-ডিগ্রির জৌলুশহীন ছিল এ রকম উপদল। তবে যা ছিল না, তা হলো সাম্প্রদায়িকতার কালেও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভাজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত নীতিমালা, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত উদারতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত রাখার ব্যাপারে তাদের অনমনীয় অবস্থান এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক শহরের অভ্যন্তরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতা বাসা বাঁধতে পারেনি, অন্তত প্রথম এক দশক। অন্যদিকে মুসলমানরাও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তদবির করেছেন, তবে ভব্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ রকম পরিবেশেই আবাসিক হল, টিউটোরিয়াল শিক্ষাপদ্ধতি, উচ্চমানসম্পন্ন পরীক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই অঞ্চলে অভিনব এক বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করেছিল (পৃ. ১০০-১২৭)।

শিক্ষকদের বিভাজন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা এসেছে বারবার, ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর বহু উদ্ধৃতি। লেখকের মতে, 'শিক্ষকদের

মধ্যে যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত রেষারেষি ছিল, সেখানে কলকাতা গ্রুপের নেতৃত্ব দেন রমেশ মজুমদার' এবং তিনি 'নানা কারণে অধ্যাপক ও উপাচার্য হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন না।' জনপ্রিয় ছিলেন না তার প্রমাণ হিসেবে লেখক দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত শোকসভায় সভাপতির ভাষণে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে রমেশচন্দ্রের দ্বন্দ্ব। এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে টেনে নিয়ে আসেন যদুনাথ সরকারকে। 'প্রাচীনকাল নিয়ে যে শুধু গবেষণা করেছেন সে জন্য নয়, বয়সের কারণে এবং প্রাচীনপন্থী হওয়ায় তাঁর সঙ্গে দূরত্ব ছিল যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে।' লেখকের ভাষ্য হলো, এত বড় পণ্ডিত ও বাংলা বিভাগ তাঁর হাতে গড়ে উঠলেও ঢাকায় বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে তিনি উপযুক্ত সম্মান ও আনুগত্য লাভ করেননি। এ প্রসঙ্গে 'প্রফেসর সরকারের' নামে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে, তা আসলে রমেশচন্দ্র মজুমদারের। উদ্ধৃতি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে রমেশ মজুমদার কলকাতার সঙ্গে বিশেষত আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কিন্তু তাতে কোনোভাবেই শাস্ত্রীকে তাঁর অসম্মান প্রমাণিত হয় না। এক ইংরেজি বক্তৃতার কারণে তিনি ছাত্রদের কাছে অজনপ্রিয় ছিলেন তা বলার সুযোগও খুব কম। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্ররা স্মৃতিচারণায় রমেশচন্দ্রের প্রশস্তি করেছেন। কারণ, তিনি বিপ্লবী ছাত্রদের নিজ বাসায় আশ্রয় দিতেন, পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে সহায়তা করতেন, এমনকি কারান্তরীণ ছাত্রদের বইপত্র দিয়েও সহায়তা করতেন।[৩২] তাঁর ছাত্র অমূল্যভূষণ সেন বলছেন, 'বস্তুত পুরুষপ্রবর ড. মজুমদার হলের ছাত্রদের শুধু প্রভোস্ট ছিলেন না, পিতার উদ্বিগ্ন চিত্ততায় তিনি ছিলেন তাদের 'friend, philosopher and guide'।[৩৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যদুনাথ সরকারেরও একধরনের সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে এবং তিনি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'History of Bengal, Vol. 2' সম্পাদনা করেছেন। তবে তিনি কোনোকালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু এই আলোচনায় তিনি (তাঁর নামে ভুল উদ্ধৃতিসহ) এমনভাবে এসেছেন, তাতে যে কারও মনে হতে পারে তিনি এখানকার শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষকদের দলাদলির অংশ ছিলেন (পৃ. ১২১-১২৩)।

৯.

'প্রশাসন' শিরোনামে বইয়ের চতুর্থ ভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, একাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, চ্যান্সেলর, শিক্ষক নিয়োগ, ভাইস

চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার ও ট্রেজারার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনুষদ, সমাবর্তন ইত্যাদিসহ প্রথমদিকের প্রশাসনিক কার্যক্রম, প্রশাসকদের যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে তার বিবরণ উঠে এসেছে। প্রথম কোর্ট সভায় প্রতিষ্ঠার বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে আচার্য আর্ল অব রোনাল্ডশে আশা প্রকাশ করেন আবাসিক ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে একটি 'মডেল' বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। উপাচার্য হার্টগ তাঁর ভাষণে আশা প্রকাশ করেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করবে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব হয়নি, এ রকম দাবি প্রসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, সম্প্রদায়ের দাবি মেটাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বিসর্জন দেওয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো সুপারিশ না শুনে একাডেমিক যোগ্যতার ওপর জোর দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় যাতে তার প্রতিশ্রুত শিক্ষার মান রক্ষা করতে পারে, সে জন্য প্রথমদিকের একাডেমিক কাউন্সিল ছিল নিবেদিতপ্রাণ, সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও তাঁরা কাজ করেছেন। প্রথমদিকের উপাচার্যরা ছিলেন জ্ঞানে-গুণে, প্রশাসনিক যোগ্যতায় উপমহাদেশের সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই দশক রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেছেন খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমেদ। অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন নবাব পরিবারের খাজা শাহাবুদ্দিন, খ্যাতিমান আইনজীবী শশাঙ্ক কুমার ঘোষ প্রমুখ। রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম পরিবর্তন হয়েছে চারবার, প্রতীক পরিবর্তন হয়েছে তিনবার। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়ে প্রথম অনুষদসমূহ গঠিত হলেও প্রথম নারী শিক্ষক পেতে সময় লেগেছিল দেড় দশক। ১৯৩৫-৩৬ সালে প্রথম নারী শিক্ষক হিসেবে ইতিহাস বিভাগের সহকারী প্রভাষক পদে যোগ দেন করুণাকনা গুপ্ত।

অর্থনৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়েছে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী 'কংগ্রেস নেতা' প্রভাসচন্দ্র মিত্রের নেতিবাচক ভূমিকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ফজলুল হক ও স্যার আবদুর রহিমের চেষ্টায় তা বাড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। আচার্য তাঁর ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং 'স্মরণ করিয়ে দেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্যাপীঠ হবে না।' উপাচার্য হার্টগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সমাবর্তনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। তার কারণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেন, 'বাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায়', কিংবা 'উপযুক্ত কাপড়চোপড়ের অভাবে' শিক্ষার্থীরা এই জমকালো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

করতে পারেননি (পৃ. ১২৮-১৪৯)। এই ভাগেও লেখক অতিশয়োক্তির দোষ থেকে মুক্ত থাকেননি। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা ছিলেন তখন বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি।' (পৃ. ১৩৮)

১০.

পঞ্চম ভাগের শিরোনাম 'বিজ্ঞান অনুষদ'। প্রথমে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন—এই তিনটি বিভাগ নিয়ে বিজ্ঞান অনুষদ গঠিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রথম যুগে যে গবেষণা-সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল তাতে এই অনুষদের কৃতিত্ব ছিল অনেক। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৯-১৯৫৯), এ বি সেন গুপ্ত, ওয়াল্টার এ জেঙ্কিন্স, জগদ্বিখ্যাত পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ পণ্ডিতকে নিয়ে এই অনুষদ ছিল 'নক্ষত্রের সমাবেশ'। সত্যেন বসুর নিয়োগ নিয়ে আলোচনা থাকলেও এই অনুষদ নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা ছিল সংক্ষিপ্ত, অনুষদের পুরো একাডেমিক কার্যক্রম তাতে ফুটে ওঠেনি। এই ভাগে বরং বেশি এসেছে ঢাকা হলের সাংস্কৃতিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ। ঢাকা কলেজের হিন্দু হোস্টেলকে অসাম্প্রদায়িক নাম দিয়ে 'ঢাকা হল' করা হয়। এই হল থেকেই ছাত্রদের প্রথম ম্যাগাজিন *শতদল* (১৯২৪) প্রকাশিত হয়। এই হলের ছাত্রসংসদ বা 'মন্ত্রিসভা', 'সোশ্যাল সার্ভিস লীগ', 'লাইব্রেরি', 'নাট্যসংঘ' বিষয়ক আলোচনায় হলের প্রাণচাঞ্চল্য, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমনকি সমান্তরাল জাতীয় রাজনীতি-সংস্কৃতির কথাও উঠে এসেছে ভালোভাবে। ঢাকা হলে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আগমন-সম্পর্কিত বিবরণটিও ছিল প্রাসঙ্গিক (পৃ. ১৫০-১৭০)।

১১.

ষষ্ঠ ভাগে এসেছে 'জগন্নাথ হল'। ১৪ পৃষ্ঠার এই অংশে জুবিলী স্কুল, জগন্নাথ কলেজ থেকে জগন্নাথ হলের ইতিবৃত্ত, হলের প্রভোস্টদের ভূমিকা, বর্ণপ্রথার প্রাধান্য, ছাত্রনেতাদের সততা ও কৃচ্ছ্রতা, বার্ষিক পুনর্মিলনী, নজরুলের হলে আগমন, হল ম্যাগাজিন *বাসন্তিকা*-সহ হলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা এসেছে। উঠে এসেছে এই হলের প্রথম দিকের ছাত্র ও পরবর্তী সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিখ্যাত বুদ্ধদেব বসু, মন্মথ রায়, অমলেন্দু বসু প্রমুখের কথা। হল সাময়িকী *বাসন্তিকা* থেকে নেওয়া কিছু উদ্ধৃতির ফলে এই অংশের বিবরণ অনেক তথ্যনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হয়েছে। তবে 'প্রভোস্টগণ : নরেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই দুই প্রভোস্ট সম্পর্কে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা পুনর্বিবেচনার

বিষয়। লেখকের মতে, নরেশচন্দ্র সব ক্ষেত্রে নিজের মতের প্রাধান্য চাইতেন বলে সবার সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধত। ফলে তিনি অজনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন, হতাশ হয়ে কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেও 'শেষ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারেননি' (পৃ. ১৭১-১৮৪)। এই ভাগের পরে আছে ১৫ পৃষ্ঠার একটি অ্যালবাম, তাতে কিছু অমূল্য ছবি আছে।

১২.

লেখকের আদি প্রকল্প ছিল 'মুসলিম হলের ইতিবৃত্ত' রচনা করা, পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখবেন বলে স্থির করেন। ফলে তাঁর পুরো বইয়ের বিন্যাসে তার ছাপ পড়ে। বইয়ের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টির নাম 'মুসলিম হল' (পৃ. ২০১-৮৫)। প্রস্তাবিত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহের চরিত্র কেমন হবে তা নিয়ে কলকাতা স্যাডলার কমিশন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামত নিয়েছিল। 'কমন হল', 'মিক্সড হল', 'সেপারেট হল' নিয়ে মতৈক্য হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনটি হল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯২০ সালের আইনের মাধ্যমে 'মুসলিম হল' প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২৮ সালে এই হলের নামকরণ করা হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। স্বাধীনতার পর 'ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে' গিয়ে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, পরবর্তী সময়ে মামলার মাধ্যমে সাবেক নাম ফিরে আসে। মুসলিম হলের নির্দিষ্ট কোনো অবকাঠামো ছিল না, কলা ভবন অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের দোতলার 'গুদামঘরে' ছাত্রদের থাকতে হতো। মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা দূর করার জন্য উপাচার্য হার্টগের উদ্যোগে গঠন করা হয় মুসলিম হল কমিটি। তারই ফলে ১৯৩১ সালে বর্তমান স্থানে স্বতন্ত্র ভবনটি তৈরি করা হয়। তবে এই ভবন নির্মাণের ব্যাপারে ঢাকা পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ও হিন্দু মহাসভাভুক্ত 'রক্ষণশীল হিন্দু'রা বিরোধিতা করে। কিন্তু এসব বিরোধিতা উপেক্ষা করে এই ভবন তৈরি হয়। হল লাইব্রেরি, পাঠকক্ষ, কমনরুম, ইনডোর খেলাধুলা, হল ইউনিয়ন, হল সাময়িকী, বিতর্ক, হল ম্যাগাজিন প্রকাশ, হলের বার্ষিক ভোজ, ছাত্র-শিক্ষকের মানবিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই হল মুসলমান ছাত্ররা যাতে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, প্রশাসনে নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সেভাবে তাদের প্রস্তুত করে। 'মুসলিম হল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক দিগন্তে (in the intellectual horizon of Bengal) এক নতুন আলোকবর্তিকা রূপে দেখা দেয়'।

হল ইউনিয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলমান ছাত্রদের মানসিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। গভর্নর লিটনের ব্যক্তিগত বদান্যতা ও ভারতপ্রীতির কথা আসে। মুসলিম হলের ছাত্রদের জন্য বিত্তবানেরা বিভিন্ন বৃত্তি চালু করেন। উল্লেখ

করার মতো একটি বৃত্তি ছিল, বলিয়াদির জমিদার কাজেমউদ্দিন সিদ্দিকী প্রদত্ত বৃত্তি। 'সবচেয়ে নিয়মিত নামাজি'র জন্য তিনি পাঁচ টাকার একটি বৃত্তি চালু করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মুসলিম হলে এসে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা বলেন, স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও মুসলিম হলের ছেলেরা এগিয়ে আসে সংস্কারের জগদ্দল পাথর পেরিয়ে। *পতাকা*, *মুসলিম হল ম্যাগাজিন* ইত্যাদি সাময়িকী তাঁদের মধ্যে যে নব 'শক্তি ও ঐশ্বর্যের' উত্থান ঘটেছিল তার প্রমাণ বহন করে। মুসলিম হলে রবীন্দ্রনাথের আগমন হলের ছাত্রদের শিল্প-সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করে, নজরুলের আগমন প্রাণচাঞ্চল্য ও তারুণ্যের উদ্যম সৃষ্টি করে। মুসলিম হলে এসেছেন (১৯২৭) সুভাষচন্দ্র বসু। এই হলেই আবুল হুসেনের মতো যুগান্তরকামী কর্মযোগী ও সংস্কারকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা গোষ্ঠী'। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র মাধ্যমে এই সংগঠনের নেতারা মুসলমান সমাজের সংস্কার এবং আচ্ছন্নতার বদলে জ্ঞান ও যুক্তির আলোক প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।

ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের আধুনিকায়নে যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তার সঙ্গে ঠিক এক শ বছর পরে মুসলমানদের অচলাবস্থা কাটানোর ক্ষেত্রে শিখা গোষ্ঠীর অবদান তুলনীয়। আর এই হলের সামগ্রিক বিকাশে এবং চিত্তবৃত্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উদার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হলের প্রথম প্রভোস্ট ও পরবর্তী সময়ে উপাচার্য স্যার এ এফ রহমান। বইয়ে 'আবুল হুসেন : শিক্ষক ও সংস্কারক' ও 'মহাপ্রাণ রহমান' শীর্ষক দুটি আলাদা পরিচ্ছেদ রাখা যথার্থ হয়েছে। আবুল হুসেন বিষয়ে লেখক পুরোনো গবেষণার দ্বারস্থ হননি। আবুল হুসেনের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সাক্ষাৎকার ও চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বেশি ব্যবহার করেছেন। আবুল হুসেনের কনিষ্ঠ সহোদর সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের যে মূল্যবান চিঠিটি ব্যবহৃত হয়েছে তার তারিখ উল্লেখ থাকলে কিংবা এর কোনো অনুলিপি ছাপলে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ত (পৃ. ২৬৭-২৭০)।

এফ রহমানের ব্যাপারে লেখক বলেছেন, ইতিহাস বিভাগের রিডার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার (১৯২১) আগে 'তিনি ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক' (পৃ. ২৭৬)। কিন্তু এফ রহমান যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ঢাকার নবাবের সুপারিশ কামনা করেছিলেন, তা উল্লেখ করলে এই 'মহাপ্রাণে'র কৃতীর কোনো অসম্মান হতো না। ১৯২০ সালের ৬ মার্চ ঢাকার নবাবের কাছে লিখিত এক পত্রে এফ রহমান লেখেন :

> I am writing this letter to beg a favour from you and to remind you of your very kind promise to me. The Dacca University Bill will become an Act by the end of this month and it is almost certain that some initial appointments will be made immediately. I feel sure that if you spoke to the Governor about me, I may get a good position there in the Dacca University. They are going to start a Muslim Hall in the University; if you care to recommend me for the headship of that with a professorship in the University.[৩৪]

ঢাকার নবাব তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গভর্নরের কাছে অনুরোধ জানান। উপাচার্য হার্টগ অনেকটা বিপাকে পড়েন। কারণ এফ রহমানের কোনো গবেষণাকর্ম ছিল না। কিন্তু ব্যক্তির যোগ্যতা বিচার করেই সে সময় সুপারিশ করা হতো। এফ রহমান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত এফ রহমানকে মুসলিম হলের প্রভোস্ট করা হয় ঠিকই, কিন্তু ইতিহাস বিভাগের প্রফেসরশিপ যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদার লাভ করেন। রহমান নিয়োগ পান রিডার পদে। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন সুযোগ্য শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক ও মানবতাবাদী উদারপন্থী হিসেবে তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

মুসলিম হলের ব্যাপারে লেখক বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় অনেক আবেগপ্রসূত মন্তব্য করেছেন। তার একটি হলো, এই হলের ছাত্ররা 'বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে নিজেদের যুক্ত মনে করলেও মুসলিম জাতীয়তাবাদে'র কথা তাঁদের মাথায় আসেনি। তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং বৃহত্তর পরিধিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। উচ্চবিত্তের হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতার জবাবে অভিজাত মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক হয়েছেন বটে, তবে মুসলিম হলের ছাত্ররা 'অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন' (পৃ. ২০৭)। মুসলিম হলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'শিখা গোষ্ঠী', কিন্তু মুসলিম হলের ছাত্ররা অন্তত ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আগে রাজনীতিতে সাধারণভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঢাকায় বিপ্লবী দলগুলোতে মুসলমান ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল না, সম্ভবপরও ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় ১৫ বছর পর ১৯৩৭ সালে ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। এই সংগঠন ঢাকার প্রায় ৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাখা-প্রশাখা গড়ে তোলে। কিন্তু কমিউনিস্ট সংযোগের ফলে মুসলমান ছাত্ররা এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিরোধী ছিল। তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল হল ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যন্ত। সেই রাজনীতিরও ভিত্তি ছিল আঞ্চলিকতা। যে জেলার ছাত্রসংখ্যা বেশি, সে জেলার প্রার্থীরাই জিতত।

সাধারণত মেধাবী ছাত্ররাই হল ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রার্থী হতেন। এই ধারার বাইরে এসে রাজনীতিকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন ফজলুর রহমান,[৩৫] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যিনি রাজনীতিতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে নাম করেছিলেন।[৩৬] তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে এতটাই 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' ছিলেন যে বাংলাকে আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছেন।[৩৭] তবু মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। কিন্তু সলিমুল্লাহ হলে প্রতিবাদীরাই প্রধান ছিলেন এই প্রমাণ পাওয়া যায় না, অন্তত ১৯৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে আন্দোলনের দুটি কেন্দ্রের একটি ছিল সলিমুল্লাহ হল। এই হলে ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন মোটামুটি 'ইসলামপন্থী'রা। অসাম্প্রদায়িক ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের কেন্দ্র ছিল মেডিকেল কলেজ হোস্টেল।[৩৮]

১৩.

বাংলাদেশ যে নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে এই সম্ভাবনার আদি বীজ বপন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে যুগের অচলাবদ্ধ সমাজে কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা ছিল প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। তাই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের নারীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে যায়। এতে বেশি উপকৃত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীরা। যুগান্তরের বার্তা নিয়ে এগিয়ে আসেন লীলা নাগ, ফজিলতুন নেসা, খোদেজা খাতুন, জামশেদ-উন-নিসা প্রমুখ নারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের যে শিক্ষা পরিবেশ, অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই নারীমুক্তি সম্ভব হয়ে উঠেছিল, তা উঠে এসেছে 'নারীশিক্ষা' শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে। সহশিক্ষা ছিল অনেকটাই আনুষ্ঠানিক, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তবু এই অঞ্চলের নারীরা বৃহত্তর সমাজের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উদার পরিবেশে নাটক, সংগীতানুষ্ঠান ইত্যাদি করেছেন, অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন, খেলাধুলায় এসেছেন, *সুপর্ণা* নামে সাময়িকী প্রকাশ করেছেন, সমাজের যুগ-যুগান্তের অচলাবস্থাকে ভেঙে প্রগতির পথ নির্দেশ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কীভাবে পূর্ববঙ্গে নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে। তবে লেখকের তথ্যনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন তিনি বলেছেন, লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত 'দীপালী সংঘ' শুধু পূর্ববঙ্গের নয়, 'উপমহাদেশের প্রথম ছাত্রী সংগঠন'।

কিন্তু এর কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি (পৃ. ২৯৬)। লীলা নাগের জীবনী ও জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে এ রকম কোনো তথ্য পাইনি।[৩৯] আল মামুন ক্লাবে প্রদত্ত ফজিলতুন নেসার ঐতিহাসিক বক্তব্য থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে, তার এক জায়গায় তথ্যসূত্র দেওয়া হয়েছে '*সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪', অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে (পৃ. ৭৬-৭৮)।

১৪.

বইয়ের নবম ভাগে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কয়েকটি বিভাগের কথা'। বাংলা ও সংস্কৃত, আরবি, সংস্কৃত ও পালি, উর্দু ও ফারসি বিভাগ, ইংরেজি বিভাগ, দর্শন বিভাগ ও দর্শন সমিতি, ইতিহাস সমিতির ইতিহাস চর্চা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম দিকের শিক্ষক, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষা পরিবেশ, গবেষণা, বিভিন্ন বিভাগীয় সমিতির কার্যক্রম উঠে এসেছে। বাংলা বিভাগ শুরু থেকেই গবেষণার ক্ষেত্রে সরব। ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমান পণ্ডিত পাওয়া না যাওয়ায় ঢাকা মাদ্রাসার শামসুল উলামা আবু নসর ওয়াহিদকে নিয়োগ দেওয়া হয় অস্থায়ীভাবে। বুদ্ধদেব বসু, মন্মথনাথ বসু, অমলেন্দু বসুর মতো ছাত্র এবং সুশীল কুমার দে ও মাহমুদ হাসানের মতো প্রখ্যাত শিক্ষকদের নিয়ে ইংরেজি বিভাগ ছিল গবেষণা ও সৃষ্টিকর্মে সমৃদ্ধ। জি এইচ ল্যাংলি, হরিদাস ভট্টাচার্য, মমতাজউদ্দিন আহমদের মতো শিক্ষক থাকলেও 'ইউরোপে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে যেভাবে আধুনিক দর্শনের অনুশীলন হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা হয়নি। সমাজে ধর্মীয় সংস্কারের কারণে যুক্তির চর্চা কমই হয়েছে। সেটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ব্যর্থতা।' তবে পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও আখতার ইমাম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। ইতিহাস বিভাগে ছিল রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো প্রতিভাবান 'প্রথাগত ইতিহাসবিদ', আবার প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ সুশোভন সরকার। মৌলিক গবেষণায় ইতিহাস বিভাগ ও ইতিহাস সমিতির অবদান ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুরু থেকেই এই বিভাগ ছিল 'উঁচু মানসম্পন্ন'। এই বিভাগ কর্তৃক ১৯২০-এর দশকে তিন খণ্ডে পরিকল্পিত এবং ১৯৪৩ ও ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত দুই খণ্ডের 'History of Bengal' বাংলার ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার সম্পাদিত এই দুটি গ্রন্থের যুগ বিভাগ ও অন্যান্য বিষয়ে মতামত দিয়েছেন ও প্রশ্ন তুলেছেন পরবর্তী ইতিহাসবিদগণ। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন এস বিদ্যনাথ আয়ার, ডি এন ব্যানার্জি প্রমুখ। ১৯২২-২৩ সালে পৃথক কমার্স বা বাণিজ্য বিভাগ চালু হলে অর্থনীতির অনেক শিক্ষক সেই বিভাগে যোগ দেন। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা

কারিকুলাম ও টেক্সট বুক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সে সময়ের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, বিভাগের শিক্ষার্থীরা সংবিধান-বিষয়ক পাঠ গ্রহণ করছেন ডি এন ব্যানার্জি, অমিত সেনদের মতো অধ্যাপক ও আমন্ত্রিত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে (পৃ. ৩০০-৩২২)।

১৫.

'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক সর্বশেষ অধ্যায়টি হতে পারত বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ এখানে 'গ্রন্থাগার', 'গবেষণাকর্ম', 'পাবলিক লেকচার', 'উচ্চতর গবেষণা : পিএইচডি, ডিলিট ও ডিএসসি', 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা', 'সম্মানজনক ডিগ্রি প্রদান', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ', 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' ইত্যাদি উপশিরোনামে আলোচিত হয়েছে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গসমূহ। অনন্য গ্রন্থাগার-সংস্কৃতি, গবেষণার মাধ্যমে মৌলিক উদ্ভাবন, নিয়মিত পাবলিক লেকচারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে জানান দেওয়া এবং ইউনিভার্সিটি বুলেটিন কিংবা জার্নালে প্রকাশ করা, আমন্ত্রিত দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের পাবলিক লেকচার সিরিজের মাধ্যমে সমসাময়িক বিশ্ব-জ্ঞানপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকা, নিত্যনতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের আলোকে উদ্ভাসিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে সঘন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল—এসবের মধ্য দিয়েই স্বপ্নদ্রষ্টাদের স্বপ্ন সত্যি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রার প্রথম দুই দশক উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন লাভ করেছিল। এসব বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে এলেও তা একটা পূর্ণ অবয়ব তৈরি করতে পেরেছে। তবে অধ্যায়ের বিন্যাস একে কম গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। শিরোনামের দাবি মেনে এ অধ্যায়ে যেমন এসেছে 'রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা-বিরূপতা ও তার প্রতিবাদ', 'মোহিতলাল আখ্যান', 'ঢাকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি', 'স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা', 'শরীরচর্চা ও খেলাধুলা', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যানটিন' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু থেকেই বিখ্যাত গুণীজনদের সম্মানজনক ডিগ্রি প্রদানের রীতি গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য আর্ল অব রোনাল্ডশে, প্রথম উপাচার্য হার্টগ, বিজ্ঞানী সি ভি রমন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার আবদুর রহিম, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রমুখকে বিভিন্ন সময় ডিগ্রি প্রদান করা হয়। শরৎচন্দ্রকে ডিগ্রি দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল ঢাকার প্রভাবশালী পত্রিকা *ঢাকা প্রকাশ*। রবীন্দ্রনাথ ডিলিট নিতে না আসা প্রসঙ্গে এবার লেখক নতুন যুক্তি হাজির করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও তখনকার ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায়, তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও যদুনাথকে

ডক্টরেট দেওয়ায় তিনি সমাবর্তনে আসেননি। তখন তিনি মনে করতেন, বাংলায় তিনি কারোরই সমপর্যায়ের নন। তাঁর শরীর ভালো নয় এই অজুহাতে তিনি আসেননি।' (পৃ. ৩৩১) 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট খেতাব ফিরিয়ে দিলেও, তাঁকে সেকালে "স্যার" সম্বোধন করলে তিনি অখুশি হতেন না।' (পৃ. ৩৩২) কিংবা 'শরৎচন্দ্রের ডিলিট-প্রাপ্তি প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও খুশি হননি। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের অনুমান শুধু একা রবীন্দ্রনাথকে ডিলিট দিলে তিনি যেতেন।' (পৃ. ৩৩৩) ভবতোষ দত্তের মতো লেখকও শুধু অনুমাননির্ভর কথা বলেছেন, কিন্তু কোনো তথ্যপ্রমাণ হাজির করেননি।

১৬.

প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই 'জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠ বা প্রতীক'। কিন্তু এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সে রক্ষা করতে পারেনি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে তার মানের অবনমন ঘটেছিল। তবু প্রথম চল্লিশ বছর সে এশিয়ার একটি প্রধান উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিল। এই জনপদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং জাতীয়তাবাদী যে আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়, তাতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত...মোটের ওপর একটা আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখে।' কিন্তু স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতির পথ খুলে যায় এবং শিক্ষক নিয়োগে অপরিণামদর্শী দুর্নীতির সংস্কৃতি চালু হয়। একদিকে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অন্যদিকে বহু জায়গা বেদখল হয়ে যাওয়ায় অবকাঠামোগতভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। আবাসন সমস্যা প্রকট হয়, একসময়ের প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতি লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হয়। ফলে, গবেষণা ও সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। উপসংহারে লেখক তাই আফসোস করে বলেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো ও প্রধান বিদ্যাপীঠ হিসেবে গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভূমিকা পালনের কথা ছিল, তা এই প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি করতে পারছে না।' অতীত গৌরবের এই অনুসন্ধান হয়তো আমাদের নতুন করে পথ দেখাতে পারে।

১৭.

মুখের কথা আর গবেষকের সিদ্ধান্ত, এই দুই ক্ষেত্রে দায়িত্বের মাত্রায় তফাত অনেক। গবেষণায় কল্পনার স্থান ইদানীংকালে দেওয়া হচ্ছে, Historical Imagination বা ঐতিহাসিক কল্পনা নামে, তাও একটা পদ্ধতি। এত গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থে লেখক কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিই অনুসরণ করেননি। কিছু ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র দিয়েছেন পুরোপুরি নিয়ম মেনেই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য, অনেক মন্তব্যের প্রমাণস্বরূপ কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। যে দুষ্প্রাপ্য দলিলগুলোর ব্যবহার এই বইয়ের আপাতমূল্য অনেক বাড়িয়ে দিতে পেরেছে, তা অনেক ক্ষেত্রে তৈরি করেছে সংশয়। কারণ, এ রকম অনেক দলিলের কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়নি। কখনো শুধু নামোল্লেখ, কখনো লেখক দেখেছেন এই বলেই দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। প্রায় ২০০ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের কোনো সাল-তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। এসব ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র না দেওয়া থাকায় কোনটা দলিলপত্র কিংবা সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া তথ্য, কোনটা লেখকের নিজের মন্তব্য তা বোঝা দায়সাধ্য হয়ে পড়ে। তথ্যগত ভুলের পাশাপাশি বইয়ের বিন্যাসে গলদ আছে। একই প্রসঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় এত বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে যে তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পাঠকের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। এ রকম একটা বইয়ের কোনো নির্ঘণ্ট নেই, তথ্যসূত্র দেওয়া হয়নি, গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে নির্বাচিত। একই দলিলপত্র নিয়ে কিংবা একই কালপরিধি নিয়ে আগে গবেষণা করেছেন এমন গবেষকদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাল (সত্তর-আশি দশক) এবং প্রকাশকালের (২০১৬) ব্যবধান এর একটি কারণ হতে পারে। দেশের একজন খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ এবং আরেকজন বড় গবেষক এই পাণ্ডুলিপি দেখে পরামর্শ দিয়েছেন বলে লেখক আমাদের জানিয়েছেন (পৃ. ১৭-১৮)। তবু অনেকগুলো গুরুতর ভুল থেকে যাওয়াটা হতাশাজনক। বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে, এই অজুহাত না দিয়ে পরবর্তী সংস্করণে অন্তত তথ্যসূত্র আর বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি দিলে কিছুটা দায়মুক্তি ঘটবে।

স্যার ফিলিপ হার্টগ

সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রথমা, ডিসেম্বর ২০১৬

স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম এই 'আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী' বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়নকারী। ঢাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শন, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর নকশাকার। 'গত ১০০ বছরের আধুনিক বাংলাদেশের যাঁরা নির্মাতা, স্যার ফিলিপ হার্টগ তাঁদের প্রথম সারির একজন।' স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা। সুতরাং স্যার ফিলিপ হার্টগকে স্মরণ করা

আমাদের জাতীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।' কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে এই দায়িত্ব পালন তো করা হয়নি, বরং এক অবিমৃষ্যকারী অবহেলার শিকার হয়েছেন এই মহান শিক্ষাবিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণায় তাঁর সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণনা ও মন্তব্য আছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান বাংলাপিডিয়া[৪০] ও অন্য একটি জীবনীকোষে[৪১] সংক্ষিপ্ত দুয়েকটি ভুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত বইয়ে না-করলেই-নয় জাতীয় আলোচনা। বাংলা একাডেমি চরিতাভিধানে উপমহাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক বেশ কয়েকজন বিদেশিকে নিয়ে ভুক্তি আছে, কিন্তু হার্টগ-সম্পর্কিত কোনো ভুক্তি নেই।[৪২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি হল নির্মাণ করে তার দায় শেষ করেছে। বাংলা একাডেমি এখনো পর্যন্ত প্রায় দেড় শ জীবনী গ্রন্থ ছাপিয়েছে, হার্টগ তাদের বিবেচনায় আসেনি। লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এই জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক দায় নিজের কাঁধে নিয়ে রচনা করেছেন এই গ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের কৃতিত্বের দাবিদার।

১.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত লেখকের আগে আলোচিত বইটির কাজ করতে গিয়ে বর্তমান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এক দিক থেকে সেই বইয়ের বর্ধিত ফলাফল এই কাজ। ফলে 'তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করতে যথেষ্ট বেগ' স্বীকার করলেও বইয়ের বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনো বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার ছাপ পাওয়া যায় না। এমনকি আগের বইয়ে ব্যবহৃত ভুল তথ্যের কোনো সংশোধন কিংবা পুনর্মূল্যায়নও করা হয়নি। বইয়ের কোনো বিষয়সূচি নেই। 'প্রবেশক', 'উপক্রমণিকা'সহ ২৬টি ছোট পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে ১১২ পৃষ্ঠার বইটি। আগের বই থেকে এই বইয়ের উন্নতির দিক হলো এখানে একটি তথ্যসূত্র যোগ করা হয়েছে। প্রচুর প্রাথমিক উৎস, দুষ্প্রাপ্য দলিলাদি ব্যবহার করা হলেও প্রদত্ত তথ্যসূত্রের সংখ্যা মাত্র ১২। 'নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি' হুবহু আগের বইয়ে যা ছিল, তাই আছে। এমনকি সেই গ্রন্থপঞ্জিতে যে মুদ্রণপ্রমাদ ছিল, তারও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।[৪৩] এর মধ্যে 'স্টেপলটনের স্বপ্ন ও কর্ম' ও 'বলধা গার্ডেনে হার্টগের সংবর্ধনা ও তদবির' শীর্ষক দুটি পরিচ্ছেদ হুবহু পূর্বোল্লিখিত বই থেকে নেওয়া। '১ জুলাই ১৯২১: স্বর্ণাক্ষরে লেখা দিন' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি সেই বইয়ের একই নামের পরিচ্ছেদের পরিবর্ধিত রূপ।

২.

হার্টগ তাঁর ৬০ বছরের কর্মজীবনের ৫ বছর ঢাকায় এবং ১৬ বছর উপমহাদেশে কাটিয়েছেন। ভারতে অবস্থানকালীন পুরো সময়ই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

পালন করেছেন, যা ছিল প্রধানত শিক্ষা উন্নয়নবিষয়ক। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল অবহেলিত অথচ সম্পদপূর্ণ পূর্ব বাংলায় যাতে একটি অসাম্প্রদায়িক ও জ্ঞানবিভাসিত সমাজ গড়ে ওঠে।' সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি কাজ করেছেন একেবারেই নিঃস্বার্থভাবে।

১৮৬৪ সালের ২ মার্চ এক ব্রিটিশ ইহুদি পরিবারে ফিলিপ হার্টগের জন্ম। মধ্যযুগব্যাপী নিপীড়নের শিকার ইহুদিদের বারবার দেশ পরিবর্তন করতে হতো। হার্টগের আদি পুরুষদের কয়েক প্রজন্ম ছিল নেদারল্যান্ডসে, সেখান থেকে তাঁরা আসেন ফ্রান্সে। ফিলিপ হার্টগের বাবা আলফন্স হার্টগ ফ্রেঞ্চ শিক্ষকের চাকরি নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা ছিলেন সংস্কারবাদী ও উদারবাদী ইউরোপীয় ইহুদিদের শীর্ষ নেতা আব্রাহাম গেইগারের (১৮১০-১৮৭৮) অনুসারী। লেখক আমাদের জানাচ্ছেন, ফিলিপের বাবা আলফন্স হার্টগ 'বিত্তবান ও সংস্কৃতিমনা' ছিলেন (পৃ. ১৫)। কিন্তু ফ্রেঞ্চ শিক্ষক আলফন্স সংস্কৃতিমনা ছিলেন বটে, কখনো 'বিত্তবান' ছিলেন না। বরং তাঁর এবং ম্যারিয়ন হার্টগের সংসার চলত কোনোমতে। কারণ, তাঁদের 'had no capital and very little of their race's reputed business ability.' স্বামী-স্ত্রী দুজনই ছিলেন স্কুলশিক্ষক। আলফন্স স্কুলে এবং বাড়িতে ফ্রেঞ্চ পড়াতেন। ম্যারিয়ন নিজে ইহুদি শিশুদের জন্য একটি 'বোর্ডিং ও ডে' স্কুল চালু করেন, যেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো।[৪৪] তাঁদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে—নুমা, হেলেনা (নেলি), মারকুস, সিসিলে ও ফিলিপ। আরও দুই সন্তান শিশুকালে মারা যায়। নুমা ও ফিলিপের স্কুলের খরচ দিতেন কয়েকজন বিত্তবান ও প্রভাবশালী ইহুদি। হার্টগ পড়াশোনা শুরু করেছেন মায়ের স্কুলে। এরপর তিনি ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলে। বিখ্যাত ধনাঢ্য ইহুদি রথচাইল্ড পরিবারের ব্যারন ম্যায়ার দে রথচাইল্ড তাঁর স্কুল ফি বহন করতেন। আলফন্স হার্টগের এককালের ছাত্রী ম্যায়ার ফিলিপের বড় ভাই নুমা হার্টগের পড়াশোনার খরচও দিতেন সাবেক শিক্ষকের প্রতি বদান্যতাস্বরূপ। ম্যায়ারের মৃত্যুর পর হান্নাহ এই দায়িত্ব নেন। কিন্তু তাঁর বিয়ের পর এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে ফিলিপের পড়ানো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। কারণ, মায়ের স্কুল চালাতে গিয়ে তখন তাঁদের পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই হার্টগকে তাঁর বড় ভাই ম্যানচেস্টারের ওয়েন্স কলেজের অধ্যাপক মারকুসের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যানচেস্টারের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি ডিগ্রি নেওয়ার পর ফ্রান্সে বসবাসরত তাঁর বোন নেলি ও দুলাভাই সোরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আরসেন ডারমেস্টেটারের কাছে নিয়ে আসা হয়। এই নিঃসন্তান দম্পতি তাঁকে সন্তানের মতো লালনপালন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি ভর্তি হন কলেজ দে ফ্রান্সে এবং সেখানকার পড়াশোনা

শেষে পরবর্তী সময়ে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৪৫] এভাবেই ফিলিপ হার্টগ একটি 'কসমোপলিটন শিক্ষা' লাভ করেন।

৩.

বিজ্ঞানে হার্টগের মৌলিক কোনো গবেষণা নেই। পরিবারের সবাই বিশেষত বোনজামাই প্রখ্যাত ফরাসি ভাষাবিদ ও সোরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরসেন ডারমেস্টেটার (১৮৪৬-১৮৮৮) খুব চেয়েছিলেন তিনি একজন প্রথম শ্রেণির রসায়নবিদ হবেন। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ রবার্ট বানসেনের (১৮১১-১৮৯৯) অধীনে গবেষণার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করার পর হার্টগ উপার্জনের দিকে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বোন নেলির ইচ্ছায় তিনি ফরাসি রসায়নবিদ Marcellin Berthelot (১৮২৭-১৯০৭)-এর ল্যাবরেটরিতে কাজ করার জন্য ফ্রান্সে ফিরে যান। ১৮৮৭ সালে 'প্রিপারেশন অব সালফাইট'-এর ওপরে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানকার পাঠ শেষ করার পর তিনি কেমিক্যাল ফিজিকসে গবেষণার জন্য বছরে ১০০ পাউন্ডের বার্কলে স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। রয়্যাল সোসাইটি থেকেও ৫০ পাউন্ডের একটি বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু গবেষক হার্টগের জন্য প্রথম হতাশা আসে ১৮৯০ সালে তিনি যখন তাঁর সালফাইট-বিষয়ক গবেষণার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি লাভে ব্যর্থ হন। এর কারণ হিসেবে গবেষণা-পরীক্ষকেরা জানান, তাঁর গবেষণার পরিধি খুবই সংকীর্ণ। বৃত্তি শেষ হলে তিনি ওয়েন্স কলেজের সহকারী লেকচারার ও রসায়নের ডেমনেস্ট্রেটরের একটি অতিরিক্ত পদে যোগ দেন। এ সময় তিনি আর্থিক সচ্ছলতার আশায় *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান*-এ বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের সমালোচনা, নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং বিজ্ঞান লেখক হিসেবে সমাদর লাভ করেন। *Dictionary of National Biography*-এর জন্য 'M' আদ্যক্ষরের সব রসায়নবিদের জীবনী লেখেন। এ সময় তিনি দুয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখলেও মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়, রসায়নবিদ হওয়া তাঁর নিয়তি নয়। ওয়েন্স কলেজের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডিক্সনের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বোন সিসিলিকে চিঠিতে লেখেন, 'I had a long talk with Dixon, he told me that he thought my 'genius' lay rather in criticizing and organizing than in experimental observation.' ডিক্সনের এই মন্তব্য মেনে নেওয়া হার্টগের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, কারণ হার্টগ নিজে চেয়েছেন বড় রসায়নবিদ হতে। কিন্তু তাঁর প্রতিভা আপন পথ খুঁজে নেয় দ্রুত। ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির সম্প্রসারণ প্রকল্পের সচিব হিসেবে

যোগদান করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের পথে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় ও সফল যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁর 'ভূমিকা'য় চারবার ও বইয়ের ভেতরে বেশ কয়েকবার হার্টগের নামের আগে 'ড.' বসিয়েছেন। কোথাও বলছেন, 'হার্টগ নিজে ছিলেন একজন খ্যাতিমান রসায়নবিজ্ঞানী' (পৃ. ১৭)। এই অতি মহীয়ান করে তোলার প্রবণতা জীবনীকারের জন্য দোষণীয়।

৪.

হার্টগ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ওয়েন্স (Owens) কলেজের 'বিশপ বার্কলে স্কলার' হিসেবে। সেখান থেকে তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়। রসায়নের অধ্যাপনা থেকে তিনি শিক্ষা প্রশাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৮৯৯-১৯০৩ সময়কালে তিনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করেন। আলফ্রেড মোজলে কমিশন অব এডুকেশনাল এনকোয়ারির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯০২-০৩ সালে। এরপর একাডেমিক রেজিস্ট্রার হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল ১৯০২ সালের আগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অধিভুক্তকারী বিশ্ববিদ্যালয় (affiliated university)। বিশ্ববিদ্যালয়টির কাজ ছিল পরীক্ষা নেওয়া এবং ডিগ্রি প্রদান করা। হার্টগের দায়িত্ব ছিল এই প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাদানকারী (teaching) বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা।[৪৭] এই দায়িত্ব অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে পালন করে তিনি একজন শিক্ষাসংগঠক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আরেকটি যে অসাধারণ কীর্তি গড়েন তা হলো লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, পরবর্তী সময়ে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS) প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন।[৪৮]

৫.

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে অসাধারণ কীর্তি এবং শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে খ্যাতির কারণে হার্টগকে ১৯১৭ সালে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে প্রদত্ত এই কমিটির রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (পৃ. ১৪-২০)। লেখক আমাদের জানাচ্ছেন, হার্টগ ছিলেন এই কমিটির 'সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য' এবং বিশালাকার 'রিপোর্ট প্রণয়নে পনেরো আনা কৃতিত্ব হার্টগের। অন্য সদস্যরা পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু লেখার কাজটি

সদস্যসচিব হিসেবে তাঁকেই করতে হয়েছে।' (পৃ. ১৯-২০) এসব তথ্যের জন্য লেখক কোনো সূত্র ব্যবহার করেননি। কিন্তু অন্য উৎস থেকে আমরা যা জানতে পারি, তা ভিন্ন রকম।

আট সদস্যের কমিশনের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি যথাক্রমে লিডস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. মাইকেল স্যাডলার এবং ভারত সরকারের এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জর্জ অ্যান্ডারসন।[৪৯] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'সদস্যসচিব' নন, হার্টগ ছিলেন কমিশনের একজন সাধারণ সদস্য। কমিশনে 'সদস্যসচিব' বলে কোনো পদ ছিল না। কমিশন তাদের মূল রিপোর্ট পেশ করে ৫ খণ্ডে। সঙ্গে ছিল পরিশিষ্ট, মেমোরেন্ডা, প্রশ্নমালা ইত্যাদি নিয়ে আরও ৮ খণ্ড। মূল রিপোর্টের ৫২টি অধ্যায় ভাগাভাগি করে লেখেন কমিশনের সব সদস্য। সর্বোচ্চ ১১টি করে অধ্যায় লিখেছেন চেয়ারম্যান স্যাডলার, হার্টগ ও অপর সদস্য রামসে মুইর। হার্টগ লিখিত ১১টি অধ্যায়ের মধ্যে ছিল পরীক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার মাধ্যম, ইংরেজি শিক্ষা, মেডিকেল শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত অধ্যায়। তবে হার্টগ লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং বাংলাদেশের সঙ্গে হার্টগের সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো 'The University of Dhaka' শীর্ষক ৩৩ নম্বর অধ্যায়।[৫০] রিপোর্টের চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ১২০ পৃষ্ঠার এই অধ্যায়ে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে, তা অনুযায়ীই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। এখানে তিনি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক, প্রশাসনিক, একাডেমিক কর্মকাণ্ডের এক নিখুঁত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নকশা তৈরি করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন,

> Dacca will be a small university compared to Calcutta, but it is to be remembered that many of the greatest of university teachers have lived and worked in universities besides which Dacca will be large and in many ways the opportunities of Dacca will be Unique. We hope that, in this quiet intellectual centre in the great plains and waters of Eastern Bengal, and in touch with a historic city, there may spring up a fresh synthesis of eastern and western studies. These are the possibilities of Dacca, It will lie with the men who control the University to turn those possibilities into realities.[৫১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে সেই দায়িত্ব প্রধানত তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রশাসনিক নৈপুণ্যে নিজের প্রণীত নকশা বাস্তবায়ন করেন। আবাসিক হল, টিউটোরিয়াল শিক্ষাপদ্ধতি, উন্নত পরীক্ষাপদ্ধতি এবং যে

অনন্য প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে উপমহাদেশের প্রথম 'আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী' বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা ছিল তাঁর দীর্ঘ তিন দশকের শিক্ষা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও এ বিষয়ক বহু গবেষণার ফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একরকম তাঁর নিজের স্বপ্নে ও দর্শনে লালিত সন্তান। সুতরাং, পি জে হার্টগ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যই ছিলেন না, ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপতি। তিনি শুধু একজন অসাধারণ শিক্ষা প্রশাসকই ছিলেন না, ছিলেন একজন মহান শিক্ষা দার্শনিক এবং তাঁর এই প্রায়-বিপরীত দুই গুণাবলির দুষ্প্রাপ্য সম্মিলনীর ফলেই প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল উপমহাদেশের একটি 'মডেল বিশ্ববিদ্যালয়'।

৬.

হার্টগকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় ১৯২০ সালের ২১ জুন, ২৪ জুন তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১ ডিসেম্বর কলকাতায় অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প অফিসে এসে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে লেখক আমাদের জানান, 'উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে হার্টগ ও ম্যাবল হার্টগ তাঁদের শিশুসন্তানদের নিয়ে লন্ডন ত্যাগ করেন ১১ নভেম্বর।' (পৃ. ২২) কিন্তু ম্যাবল হার্টগ স্বয়ং আমাদের জানাচ্ছেন, তাঁরা হার্টগের কাছে এসে পৌঁছান হার্টগের এক মাস পরে। অর্থাৎ ১৯২১ সালের জানুয়ারির শুরুতে, হার্টগ তত দিনে ঢাকায় এসে উপাচার্য অফিসে কার্যক্রম শুরু করেছেন।[৫২] উপাচার্য হিসেবে তাঁকে প্রথম যে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা হলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। নিজের বেতন তোলা, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজ—সব ক্ষেত্রেই এই সমস্যা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে হার্টগকে সহায়তা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল অফিসার ও ইতিহাসবিদ এইচ ই স্টেপলটন। হার্টগের দায়িত্ব গ্রহণের আগে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন তিনি। 'হার্টগের ডান হাত' ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমেদ।

অপরিচিত ঢাকা শহরে ব্যক্তিগত অসুবিধার পাশাপাশি হার্টগকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রধানত যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট, শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে দুই সম্প্রদায়ের তদবির, মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য শিক্ষকের অপ্রতুলতা, কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলমান অসহযোগ আন্দোলন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন আন্দোলন, ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, ঢাকার স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুদের বিরোধিতা ইত্যাদি। এতসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক

যোগ্যতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের—সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক—তদবিরের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু গবেষণা-যোগ্যতাকে প্রধান মাপকাঠি নির্ধারণ করে এ ক্ষেত্রে তাঁর অনমনীয় অবস্থানের ফলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো করতে পেরেছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে উপমহাদেশের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিসমূহের একটি, তারও ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে হার্টগের প্রশাসনিক উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত আগ্রহের ফলে। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের। তাঁরা যাতে তাঁদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারেন সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তরুণ শিক্ষকদের জন্য তিনি ছিলেন দরদি অভিভাবক ও উদ্যোগী পৃষ্ঠপোষক। তরুণ শিক্ষক ও পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বসু এবং ভাষাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ইউরোপে উচ্চশিক্ষার আয়োজনে হার্টগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বসুর আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ তৈরিতেও হার্টগের ভূমিকা ছিল (পৃ. ৫৩-৫৬, ৭১-৭২)।

লেডি ম্যাবল হার্টগের ভূমিকা সম্পর্কে আলাদাভাবে বলা হয়েছে। 'শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি শুধু রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত স্মৃতিচারণা থেকে দীর্ঘ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করা হয়েছে, যেখানে প্রধানত উঠে এসেছে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজনের কথা। ফলে এই পরিচ্ছেদ পাঠককে বিভ্রান্ত করে (পৃ. ৭০)। এই উদ্ধৃতিগুলো পূর্বোল্লিখিত বইয়েও একই ছিল, ফলে এই বইয়ে উদ্ধৃতিগুলোর অন্তর্নিহিত বক্তব্য আলাদা করে চিহ্নিত করে আরও সতর্ক ব্যবহার প্রয়োজন ছিল।

৭.

বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবক্তা', 'কৃষি গবেষণার পথিকৃৎ' এবং 'চামড়াশিল্প নিয়ে গবেষণা' আয়োজনের উদ্যোক্তা হার্টগকে আবিষ্কার। 'বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে' গঠিত 'ঢাকা টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন কমিটি'র সভাপতি হিসেবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের রূপকার হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার আয়োজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরিচ্ছেদ শিরোনামের দাবি অনুযায়ী ভেতরের আলোচনায় তথ্যগত প্রমাণ ও যুক্তির ধারাবাহিকতার বদলে মন্তব্যপ্রবণতা লক্ষ করা যায়। উপরিউক্ত বিষয়ে হার্টগের চিন্তা ও পরিকল্পনা *কলকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্টের* পূর্বোল্লিখিত

'The University of Dhaka' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা আছে।[৫৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার পর সে জন্যই হার্টগকে ক্রমান্বয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবেই তিনি কৃষি, কারিগরি ও মেডিকেল শিক্ষা, চামড়াশিল্প নিয়ে গবেষণা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বেনামে একটি উদ্ধৃতি ছাড়া কমিশন রিপোর্টের সেই অধ্যায়ের নামও উল্লেখ করেননি লেখক। পূর্ববঙ্গের পশ্চাৎপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতি হার্টগের সহানুভূতি ছিল। তিনি চাইতেন এই বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক জ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠুক। মুসলমান ছাত্রদের জন্য আলাদা হল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ উদ্যোগ ছিল, 'মুসলিম হল সাইট কমিটি'তেও ছিলেন তিনি। সোশ্যাল সার্ভিস লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'শিক্ষা ও গবেষণায়, পরীক্ষাগারে ও পাঠাগারে, টেনিস কোর্ট ও খেলার মাঠে' সরব হয়ে সার্বিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠুক (পৃ. ৮৩-৮৭)।

এই অংশে আরও কিছু মারাত্মক ভুল পাঠকের চোখে পড়বে। একজনের উদ্ধৃতি অন্যের মুখে বসিয়ে দেওয়া, ভুল অর্থ করা কোনো কিছু বাদ যায়নি। যেমন ভুল উদ্ধৃতির একটি প্রমাণ, সরকার চায় ছাত্ররা রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক। হার্টগ প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আলেকজেন্ডার বুলওয়ার লিটনের সামনেই 'রাজনীতি আধুনিক জীবনের অংশ' বলে স্বীকার করে বলেছেন, 'তার অর্থ এই নয় যে আপনারা কখনো সক্রিয় রাজনীতিবিদ হবেন।' (পৃ. ৮৭) এই কথাগুলো হার্টগের নয়, প্রথম সমাবর্তনে উপাচার্য হার্টগের বক্তব্য ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। এক পৃষ্ঠার সেই বক্তব্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটের উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করেন।[৫৪] বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লিটন সেদিন দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, উচ্চশিক্ষাদর্শন সম্পর্কে অনেক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য করেন। সেই বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন, '...Most of you, I hope, have political ambitions and whether or not you ever become active politicians, you are probably anxious to see the development of the political consciousness of your country.'[৫৫]

এই উদ্ধৃতিটিরই ভুল ও মনগড়া অর্থ করে লেখক আবার লিখেছেন, 'সক্রিয় রাজনীতি করুন আর না-ই করুন, দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের সচেতনতা থাকতেই হবে, আপনাদের হতে হবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, 'to see the development of the political consciousness of your country.' (পৃ. ৮৭)

একই পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন, 'হার্টগ অব্যাহতভাবে বলেছেন', কারিগরি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বিষয়ে অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী—হিসেবে নিজেকে তৈরি করা (পৃ. ৮৭-৮৮)। এই কথাগুলোও একই ব্যক্তির। লিটনের বক্তব্যের সেই অংশটুকু ছিল এ রকম,

> Now the essential difference between a University and a technical school is this, that at a University every course of study is provided and should be undertaken with the sole purpose of producing the highest standard of achievement in that branch of study. ...if you study them at a University, you should study them as if your object were to become a scholar, a historian, a mathematician, a scientist, and you should be content not with the mere standard of an examination, but with nothing less than the standard of your professors.[৫৬]

পরের পৃষ্ঠায় (পৃ. ৮৮) হার্টগের নামে উদ্ধৃত মন্তব্যটিও লর্ড লিটনের, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'situated as it in Eastern Bengal, Dacca will naturally become the chief centre of Mohamedan learning and devote special attention to higher Islamic studies.'[৫৭]

৮.

১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর উপাচার্য হিসেবে হার্টগের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁকে আরও এক মাস অস্থায়ী ভিত্তিতে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানজনক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এমনকি তাঁর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোর বিরোধী পিপলস অ্যাসোসিয়েশনও তাঁকে আরেক মেয়াদে নিয়োগ দেওয়ার আবেদন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর হার্টগ নবগঠিত ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির মানোন্নয়ন, একাডেমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়া তিনি কমিশনের শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক কমিটি Auxiliary Committee of the Simon Commission-এর সভাপতি হিসেবেও উপমহাদেশের শিক্ষাসংস্কারে

অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই কমিটির উপমহাদেশের এক শ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব করে। ১৯৩১ সালে লন্ডন ফিরে যাওয়ার পর তিনি তাঁর পুরোনো গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা, পরীক্ষাপদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা ইত্যাদি। পরীক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তাঁর লিখিত ৯টি বইয়ের মধ্যে ৪টিই ছিল এই বিষয়ক। এ ছাড়া তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ, আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপের নামীদামি পত্রিকা-সাময়িকীতে। উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো *Some Aspects of Indian Education-Past and Present* (Oxford University Press, 1939)। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো *Words in Action- The Teaching of the Mother Tongue for the Training of Citizens in a Democracy* (University of London Press, 1947) (পৃ. ৯৯-১০৯)। তাঁর বর্তমান জীবনীকার এই গ্রন্থের নাম লিখেছেন *World in Action*। শুধু মুদ্রণপ্রমাদ বলে এই দায় এড়ানো যায় না। কারণ, আগের গ্রন্থেও এই বইয়ের নামে একই ভুল করা হয়েছিল।

৯.

মহান শিক্ষাবিদ হার্টগ ১৯৪৭ সালের ২৭ জুন লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর দূরদর্শী চিন্তা ও প্রশাসনিক দক্ষতার ফসল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে টিকে থাকে দীর্ঘদিন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধঃপতন হয়েছে, এর একটি প্রমাণ এই বিশ্ববিদ্যালয় তার এই মহান স্থপতিকেও যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত এই দুটি বইয়ের লেখকের প্রধান কৃতিত্ব অপরিহার্য অথচ আকর্ষিত বিষয়ে নতুন করে আলো ফেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নের একাডেমিক, প্রাতিষ্ঠানিক, অবকাঠামোগত বিকাশ, সমসাময়িক সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর উন্মেষ ও বিকাশ এবং সুদূরপ্রসারী ভূমিকার ইঙ্গিতবাহী এই বইটি। গবেষণার অধারাবাহিকতা ও দুর্বল গ্রন্থবিন্যাস এর মানহানি করেছে বটে, তবে এদের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত। এই বইয়ে এমন অনেক মন্তব্য আছে যা লেখকের বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু সেসব বিষয়ে গবেষণা জরুরি। সুতরাং, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের জন্য না হলেও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রকল্পের (hypothesis) জন্য সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখিত এই দুটি বই ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য হতে পারে পাথেয়।

University of Dhaka : Making, Unmaking, Remaking
Edited by Imtiaz Ahmed & Iftekhar Iqbal
Prothoma, January 2016

ওপরে আলোচিত বই দুটির প্রকল্প ছিল গৌরবময় অতীত অনুসন্ধানের মাধ্যমে বর্তমানের হতাশাজনক পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তবে প্রধানত অতীত অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনার পরিধি। বর্তমানের অধঃপতনের কারণ কিংবা ভবিষ্যতের সমাধান ও সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয়নি। সেই তুলনায় বর্তমান গ্রন্থটির আওতা অনেক বিস্তৃত, পদ্ধতিগতভাবে উন্নত এবং সংকলনগ্রন্থ হওয়ার সুবাদে নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমৃদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত তিনটি এক দিনের সেমিনারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-একাডেমিকস পঠিত ১৪টি ইংরেজিতে লিখিত একাডেমিক প্রবন্ধের সংকলন। সম্পাদনা করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ইফতেখার ইকবাল। সম্পাদকদ্বয় বিশ্বাস করেন, 'যদি একটি প্রজন্মের মানুষ একটি বিশ্ববিদ্যালয় "নির্মাণ" প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হতে পারে, আরেকটি প্রজন্ম যদি দুঃখজনকভাবে তা "অনির্মাণ" করতে পারে, তাহলে নিশ্চয় আশা থেকে যায় যে, আরেকটি প্রজন্ম তা "পুনর্নির্মাণে" নিজেদের নিয়োজিত করবে।' (পৃ. ৯) সে জন্যই বইয়ের নামকরণ করা হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : নির্মাণ, অনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ' (*Dhaka University : Making, Unmaking, Remaking*)। ভূমিকা, ইনডেক্স ও লেখক পরিচিতি নিয়ে সর্বমোট ৩৩৪ পৃষ্ঠার বইয়ের মূল অংশকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১.

বইয়ের ভূমিকাটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বেশ বিস্তারিত এই ভূমিকায় বইয়ে উত্থাপিত প্রধান প্রধান যুক্তি ও সুপারিশের সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। স্পেনের সর্ববৃহৎ সরকারি গবেষণা সংস্থা Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)-এর ২০১৫ সালে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, পৃথিবীর ২০,০০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ২,৪৬২তম। excellence, openness, impact ও presence—এই চারটি মাপকাঠিতে র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে। excellence-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১,৯৩১, openness-এ ৩,৪৪১, impact-এ তার অবস্থান আরও ভয়াবহ ৬,৭৬৫, শুধু presence-এ তার অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো। এই দুর্গতির জন্য 'চিন্তার দৈন্য' বা 'হতাশাজনক একাডেমিক দক্ষতা'কে

দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু সম্পাদকদ্বয় মনে করেন, যে পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে, তার সঙ্গে এর সংযোগ রয়েছে (পৃ. ১২)।

'সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাড়না' (sheer political compulsions) থেকে খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার একটি। এর প্রথম সমাবর্তনেই গভর্নর ও প্রথম আচার্য লর্ড লিটন সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে হতাশ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য 'রাজকীয় ক্ষতিপূরণ' (Imperial compensation) হিসেবে। ফলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সময়ের বিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'রাজনৈতিক উত্তরাধিকার' তার একাডেমিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমকে গুরুত্বহীন করে ফেলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সম্মুখ-নেতৃত্ব দিয়েছে, ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনও করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এ রকম গৌরব পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এই অনন্য অর্জন যত প্রশংসনীয়ই হোক না কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার 'রাজনৈতিক ভিত্তি' থেকে বের হতে পারেনি। নিজেকে একটি আন্তর্জাতিক 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হওয়ার এটাই সবচেয়ে 'কাঠামোগত কারণ' (foundational or structural raison d'etre) (পৃ. ১২-১৪)।

এই হতাশাজনক পরিস্থিতির কারণ কী? লেখকদের অনুসন্ধান বিশ্লেষণ করে সম্পাদকদ্বয় আমাদের প্রধানত তিনটা কারণ জানাচ্ছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাজনৈতিকীকরণ', শিক্ষাকেন্দ্রিক (teaching-centric) বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে এর শিক্ষকদের জ্ঞানের জন্য বাইরের উৎসের ওপর নির্ভরশীল ও বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মাঝারিদের স্বর্গ' (A heaven for mediocre) বানিয়ে ফেলা এবং ওপরের দুই অবস্থার ফলাফলস্বরূপ 'উদ্ভাবকের পরিবর্তে গণহারে দোভাষী (interpreters) উৎপাদন'। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ বছর পূর্তিকালে পরবর্তী প্রজন্মই এই পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনে এগিয়ে আসবে বলে সম্পাদকদ্বয়ের প্রত্যাশা (পৃ. ১৪-১৬)।

২.

প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে ইতিহাস বিভাগের বর্ষীয়ান অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরীর 'ব্যক্তিগত ভাবনা' (personal reflections) দিয়ে। অধ্যাপক চৌধুরী ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে প্রায় ছয় দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখান, আবাসিক ব্যবস্থা, টিউটোরিয়াল পদ্ধতি, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তি, সুশাসন, গবেষণার অবনমনের মাধ্যমে কীভাবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধঃপতন হয়েছে। অধঃপতনের কারণ হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে অবহেলা, নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য শিক্ষার্থী সংখ্যা, বিপথগামী ছাত্ররাজনীতি এবং একাডেমিক কমিউনিটি হিসেবে নৈতিক অবস্থান ও যথার্থ অনুভূতির অভাবকে দায়ী করেছেন (পৃ. ৩৩-৪৮)।

'Student Politics and youth mobilization' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাত্ররাজনীতি ও তরুণদের সংগঠিতকরণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনটি প্রবন্ধেই ছাত্ররাজনীতির বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে, তবে আলোচনা এগিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সম্পূরক প্রেক্ষিত (complementary perspective) বিবেচনার মাধ্যমে। সৈয়দ মনির খসরু ও মো. তাহমিদ জামি লিখিত পরিচ্ছেদে উনিশ শতকের শুরু থেকে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস বিশ্লেষণের পর সমসাময়িক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে কীভাবে ছাত্ররাজনীতি নিজেদের মধ্যে অন্তঃকলহে লিপ্ত হচ্ছে। দেখানো হয় যে জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার হাতিয়ার বানিয়ে শিক্ষার্থীদের কীভাবে অক্ষমতায়ন (disempowerment) করা হচ্ছে। কীভাবে ছাত্ররাজনীতিতে দুর্নীতি, সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতা রাজত্ব কায়েম করেছে। বিশেষত ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে উদ্দেশ্যহীনতা কীভাবে ছাত্ররাজনীতিকে বিপথগামী করেছে, তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিপথগামিতা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে তাঁদের প্রস্তাব হলো ছাত্ররাজনীতিকে একই সঙ্গে বিবর্তনবাদী (diachronic) ও কালানুবর্তী (synchronic) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। ছাত্ররাজনীতিকে একদিকে আমাদের সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ও মূল্যবোধনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন থাকতে হবে, আবার একই সঙ্গে একুশ শতকের দাবি অনুযায়ী তার কর্মসূচি ও পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে হবে। ছাত্ররাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন না আনলে বাংলাদেশ তার গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার পথ থেকে বিচ্যুত হবে (পৃ. ৪৯-৬৯)।

আনু মুহাম্মদ আরও গভীরে গিয়ে ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্যহীনতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের নব্য-উদারনীতিবাদী কৌশলসমূহ জারি রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের 'রাজনৈতিক অস্ত্র' (political tools) হিসেবে ব্যবহার করছে, যে প্রক্রিয়াকে তিনি 'ruling party student organization (RPSO) phenomenon' বা 'ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন প্রবণতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন, এই RPSO প্রবণতা জমিদারি প্রথার মতো বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোকে গতিরুদ্ধ করছে। বিশ্বায়নের কালে স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা যত বেশি অনুভূত হচ্ছে,

বাংলাদেশ সর্বগ্রাসী দুর্নীতির দিকে এগোচ্ছে। আশঙ্কার ব্যাপার হলো, এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে সব সময় অগ্রগামী মধ্যবিত্তরা। তবে আশার আলো হচ্ছে নির্দলীয় ছাত্ররা RPSO প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস দেখিয়েছেন। ছাত্রদের এই 'রাজনৈতিক গোষ্ঠী' 'সমাজের পুনরুজ্জীবনী শক্তির প্রতিনিধিত্ব' করে বলে মনে করেন তিনি (পৃ. ৭০-৯৩)।

ফকরুল আলমের পরিচ্ছেদে ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি সমান গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে শিক্ষক রাজনীতির প্রসঙ্গও। তিনি দেখান, শিক্ষক রাজনীতি ক্ষমতাপিপাসু জাতীয় রাজনীতির বর্ধিতাংশ ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষকদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণের ফলে ধ্বংস হচ্ছে চিন্তাচর্চা, গবেষণার ধারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ। ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনতে হলে ডাকসুর প্রতিনিধিত্বশীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির বিপথগামিতার কারণ নিহিত ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অপব্যবহারের মধ্যে। আশির দশক থেকে প্রতিটি সরকার এই আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং এর গণতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞাকে অবমাননা করেছে। স্বাধীনতার পর প্রবর্তিত 'restructuring formula' বা এক পদ থেকে অন্য পদে পদোন্নতির পদ্ধতিও এর একটা কারণ। লেখক মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন করতে হলে ১৯৭৩ সালের আইনের 'চেতনা' পুনরুদ্ধার করতে হবে। যেসব শিক্ষকের কোনো প্রকাশনা নেই কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জার্নাল ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশনা নেই, তাদের কোনোভাবেই সহকারী অধ্যাপকের বেশি পদোন্নতি না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। ছাত্ররাজনীতিকে সুফলদায়ী করার জন্য ডাকসু নির্বাচন চালু করতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের শর্ত অনুযায়ী শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতির পুনর্গঠনকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিশন-২০২১' রূপকল্প হিসেবে প্রস্তাব করেন (পৃ. ৯৪-১১৪)।

৩.

'Pedagogy and Curriculum' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারিকুলাম ও শিক্ষণবিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে অতনু রাব্বানি বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত বর্তমান 'জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি'র মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন প্রচুর তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি

দেখিয়েছেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি হতাশাজনক। 'বিশ্ববিদ্যালয়-যোগ্য' শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে বিপুলভাবে, 'কর্মসংস্থান-যোগ্য' স্নাতকের সংখ্যা কমছে। তাই প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরিতে উচ্চশিক্ষার ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠে আসছে। এর সমাধান হিসেবে তিনি প্রশিক্ষিত শিক্ষক, উচ্চতর গবেষণা ও 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুবিধা নিয়ে নতুন কর্মশক্তির উৎপাদন সক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন। রাব্বানির এই 'জোগান-চাহিদা' দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা কর্মসংস্থানহীন স্নাতক এবং শিক্ষার্থীদের বিপথগামী ও সহিংস রাজনীতিতে যুক্ত হওয়াকেও ব্যাখ্যা করে। রিসার্চগেটের গবেষণা আউটপুট বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবির দৃষ্টান্ত দিয়ে রাব্বানি দেখান, বাংলাদেশের পরিবেশেও ফলদায়ী গবেষণা হতে পারে। উঁচু প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগের হার বাড়েনি এবং এখনো পর্যন্ত দেশে একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, যার প্রধান লক্ষ্য গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ প্রোগ্রাম। রাব্বানি মনে করেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত 'কনসোর্টিয়াম' হতে পারে উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (পৃ. ১১৫-১৩৮)।

মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন খান লিবারেল আর্টস ও সমাজবিজ্ঞান কারিকুলামের প্রাসঙ্গিকীকরণ (contexualization) চেয়েছেন শিক্ষা ও শিক্ষাদানের দৃষ্টিকোণ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কারিকুলাম বিশ্লেষণ করে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভাগের (department) তুলনামূলক স্বশাসনকে অপব্যবহার করে 'ব্যক্তিস্বার্থ, কনসালটেন্সি অগ্রাধিকার, ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের কায়েমি স্বার্থ' সংরক্ষণের স্বার্থে কীভাবে কারিকুলাম ও কোর্স আউটলাইন তৈরি করা হচ্ছে। খান মনে করেন, ১৯৭৩ সালের আইনে উচ্চশিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ও শিক্ষাদানসংক্রান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি এবং এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনেক ঔপনিবেশিক কাঠামো রয়ে গেছে। উপরিউক্ত পরিস্থিতির জন্য তিনি এই আইন এবং আনু মুহাম্মদের মতো নব্য-উদারনীতিবাদী ব্যবস্থাকে দায়ী করেন (পৃ. ১৬৮-১৮০)।

মোহাম্মদ আবুল কাওসার কলা ও মানববিদ্যা কারিকুলাম প্রাসঙ্গিকীকরণ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ইতিহাস বিভাগকে কেস স্টাডি হিসেবে নিয়েছেন এবং আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধানত বার্নেটের কারিকুলাম তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেছেন। শিক্ষকদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সক্ষমতা, চাকরির বাজার, শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানিক অবস্থান, বিভাগের অবকাঠামো ইত্যাদি মাপকাঠি ব্যবহার করে ইতিহাস বিভাগের কারিকুলামের কার্যকারিতা ও প্রায়োগিকতা বিশ্লেষণ করছেন। শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী তাঁদের

কোর্স সাজান, তবে কারিকুলাম নির্ধারণে কখনো তাঁদের যুক্ত করা হয় না। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাকরির বাজারোপযোগী করে তোলার জন্য নতুন কোর্স চালু করেন। যেমন ইতিহাস বিভাগে 'জেন্ডার স্টাডিজ' খোলা হয়েছে, কারণ তার ফলে এনজিওগুলো শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দিতে আগ্রহী হবে। এই বিভাগের কারিকুলামে স্থানীয় ইতিহাসকে মোটামুটি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকদের পাঠদানপদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসের সাইজ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাধারণত ক্লাসের সাইজ বড় হওয়ায় শিক্ষাদান পদ্ধতি 'ইন্সস্ট্রাক্টর-ফোকাসড', 'ইন্টারেক্টিভ' নয়। কাওসার দেখান, প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা করতে উৎসাহিত করে না। শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের পছন্দ ও সক্ষমতা অনুযায়ী কোর্স নির্ধারণ করেন বলে দাবি করেছেন, কিন্তু সত্য হলো এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাজারের চাহিদা আছে বলে যেসব নতুন কোর্স চালু করা হয়, তাও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ধারণাভিত্তিক। চাকরিদাতাদের পরামর্শ নিয়ে তাঁরা এসব উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। এই অনুসন্ধানের ওপর নির্ভর করে তিনি সামগ্রিকভাবে কলা ও মানবিদ্যাভুক্ত বিভাগসমূহের কারিকুলাম পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর একটি ঢালাও প্রস্তাব হলো আরও বেশি বেশি কোর্স ইংরেজিতে চালু করলে শিক্ষার্থীরা বাজারের জন্য অধিকতর উপযুক্ত হবে (পৃ. ১৩৯-১৬০)।

ইন্টারনেটের যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আতিক রহমান তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, অনলাইন ভর্তি পরীক্ষা, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, ডিজিটাল জার্নাল, রেফারেন্স তথ্যভান্ডার ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ইন্টারনেট যুগের উচ্চশিক্ষা অবকাঠামোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পশ্চাদ্‌গামী। রহমান মনে করেন, যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের 'ডিজিটালি ইনফর্মড সিটিজেন' হিসেবে তৈরি করতে হবে (পৃ. ১৮১-২০০)।

৪.

'Campus life' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক। এ এস এম আলী আশরাফ দেখিয়েছেন, দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মেরুকরণের রাজনীতির ফলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিকীকরণ' হয়েছে। ইমতিয়াজ আহমেদ উদ্ভাবিত একটি শব্দ ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিকসদের বদলে কীভাবে ক্ষমতাসীন দলের অনুগামী 'পার্টি-ডেমিকস'দের আধিপত্য চলছে। এই পার্টি-ডেমিকসরা ক্যাম্পাস জীবনের সর্বত্র তাঁদের গোষ্ঠীস্বার্থে প্রভাব বিস্তার করছেন। তবে তিনিও নির্দলীয় শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমকে 'আশার মরূদ্যান' হিসেবে দেখতে চান। উন্নততর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁর সুপারিশ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশাসনিক কাঠামোর বিরাজনৈতিকীকরণ, প্রক্টর অফিসের সংস্কার, উন্নত দেশের মতো ক্যাম্পাস পুলিশ চালু করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতার বিকাশ এবং শিক্ষকদের গবেষণার জন্য বিনিয়োগ করা (পৃ. ২০১-২৩১)।

মো. রেজওয়ানুল হক ও মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন খান ক্যাম্পাস জীবনকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করছে এমন কিছু দিকে আলো ফেলেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, আইন ইত্যাদির পাশাপাশি কয়েকটি কেস স্টাডির ওপর আলোচনা করেছেন। আবাসিক হলের কাঠামোগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তাঁরা বিভিন্ন হলের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এবং কিছু গুরুতর আশঙ্কার জায়গা তুলে ধরেছেন। হলের অবকাঠামো, আবাসন, খাবার, একাডেমিক পরিবেশ, এক্সট্রাকারিকুলার কার্যক্রম এবং হলের প্রভোস্ট ও টিউটরদের ভূমিকা এবং হলের ছাত্ররাজনীতি ইত্যাদি। তাঁরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন (পৃ. ২৩১-২৫৫)। উল্লেখ্য, পরিচ্ছেদের শুরুতে তাঁরা দাবি করেছেন, 'এই ধরনের কাজ এটাই প্রথম।' তাঁদের এই দাবি আংশিক সত্য। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ও ১৯৭১ সালে শহীদ ড. মনিরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক পটভূমি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন।[৫৮] শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।

লাইলুফার ইয়াসমিন একটি সাংস্কৃতিক সমীক্ষা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষত ছাত্রীদের পোশাক বিশ্লেষণ করে তিনি বাঙালি ও মুসলিম পরিচয়ের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশ্বায়ন কীভাবে তরুণদের এই আত্মপরিচয়-সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তাতে কী ভূমিকা রাখছে তা অনুসন্ধান করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'মুসলিম ও বাঙালি এখন আর পরস্পর সাংঘর্ষিক সত্তা নয়।' (পৃ. ২৫৬-২৭২)

৫.

'Governanace, politics and higher education' শীর্ষক সর্বশেষ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক কালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও এর রাজনৈতিকীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণার পথিকৃৎ। মূলত তাঁর পূর্ব গবেষণার হালনাগাদ ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বর্তমান প্রবন্ধে উঠে এসেছে।[৫৯] ভর্তি-প্রক্রিয়া, উপাচার্য ও অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে

তিনি দেখিয়েছেন শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয়, patron-clientelism-এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কীভাবে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে প্রদত্ত প্রশাসনের মৌলিক কাঠামোকে লঙ্ঘন করছে। কোনো কোনো আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের রাজনীতি না করার শপথ করিয়ে ভর্তি করাচ্ছে—এ রকম কিছু ইতিবাচক দিকও তিনি তুলে ধরেন (পৃ. ২৭৩-২৯৭)।

ঔপনিবেশিক কালের হেজিমনিক জ্ঞানকাঠামো এখনো আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক এলিটদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে দাবি করে আমেনা মহসিন বলেন, 'আমরা এখনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশিত' হয়ে আছি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিকীকরণের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে বিভিন্ন আইন-অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি 'রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়' করে রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার পরও আমরা এই প্রক্রিয়া থেকে বের না হতে পারার ব্যর্থতাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার চেতনা কী ছিল, আর আমরা কী থেকে নিজেদের মুক্ত করেছি?' তিনি মনে করেন, একাডেমিক উৎকর্ষ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় রাজনীতির লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতির 'গৌরব'-এর 'metanarrative' থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার সময় এসেছে। উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকেই প্রধান মাপকাঠি করা উচিত (পৃ. ২৯৮-৩১২)।

সর্বশেষ অধ্যায়ে ইফতেখার ইকবাল উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দৃঢ়মূল যাত্রা তা স্মরণ করে ভবিষ্যৎ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। উচ্চ পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিক্ষক নিয়োগ, তুলনামূলক উন্নত বেতনকাঠামো, ফেলোশিপ ও এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্কলারলি নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রথম যুগে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, বৈশ্বিক প্রেক্ষিতেই তার অবস্থান ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা না করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক সত্তার সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাসের মধ্যেই তার অর্থপূর্ণ সংস্কারের প্রধান বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়া যাবে (পৃ. ৩১৩-৩২৮)।

বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষায় বিনিয়োগ কমছে। সামগ্রিক শিক্ষা বাজেটে উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ ১ শতাংশেরও কম। অথচ এশিয়ার অন্যান্য দেশ চীনে তা ৬০ শতাংশ, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় ৩৭-৩৮ শতাংশ। চীন শক্তিশালী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে শুধু তার দ্বৈত অর্থনীতির জন্য নয়, উচ্চশিক্ষায় অগ্রাধিকারের বদৌলতেও। এমডিজি-উত্তর পৃথিবীতে 'জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি' তৈরি করতে হলে এখন আর প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্য অর্জনই যথেষ্ট

নয়, উচ্চশিক্ষায় প্রচুর বিনিয়োগ করা দরকার। এ জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। এ রকম একটি উপায় হলো 'কালোটাকা', যা বাংলাদেশের অর্থনীতির ৪০-৫০%, তা 'সাদা' করে আবাসন খাত এবং স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করা গেলে তার একটা বড় অংশ উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যয় করার মাধ্যমে বৈধ করার বিধান সরকার করতে পারে।

উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রয়োজন স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন রূপকল্প নির্ধারণ করা। এ রকম লক্ষ্য না থাকায় বিশ্বব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে নেওয়া প্রকল্পগুলো বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থানের উন্নতি করতে প্রায় কোনো লক্ষণীয় প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। গবেষণার মান মূল্যায়নের জন্য যুক্তরাজ্যের REF (Research Excellence Framework) মডেল গ্রহণ করা যেতে পারে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আরও সুসংগঠিত সরকারি সংস্থা থাকা উচিত, যাতে ব্যক্তি-গবেষকেরা অর্থায়ন পেতে পারেন সহজে। গবেষণা-পৃষ্ঠপোষণের লক্ষ্যে এ রকম সংস্থার উদ্যোগে হতে পারে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে উচ্চশিক্ষা খাতে ইতিবাচক নীতিনির্ধারণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৃহত্তর সম্পদ বরাদ্দের ওপর। রাজনৈতিক মতৈক্য থাকলে কীভাবে দ্রুততর সময়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতি করতে পারে তার উদাহরণ কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি ব্রুনেই দারুসসালাম, রাসেল গ্রুপ ও আইভি লিগ প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ রকম অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উঠে এসেছে এই সংকলনের গবেষকদের কাছ থেকে। তবে এটি সংকলনগ্রন্থ হওয়ায় সমস্যা নিরূপণ ও সমাধান প্রস্তাবের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য রয়ে গিয়েছে। তাই সুপারিশগুলো আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যায় না। বিশেষত কোনো গবেষক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সুপারিশ করেছেন, কেউ আবার সব সমস্যার মূল দেখেছেন নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আগেকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা অনালোচিত থেকে গেছে। দেশভাগের ফলে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক কাঠামোতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম গুরুতর সংকটের মুখে পড়েছিল। সেই সংকট চিহ্নিত করার লক্ষ্যেই মুনিরুজ্জামানের পূর্বোক্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছিল। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গোলাম জিলানী করেছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।[৬০] এই গবেষণাগুলো পর্যালোচনা করলে সমস্যা নিরূপণের কাজটা আরও সহজ হতো, সুপারিশগুলো হতে পারত আরও লক্ষ্যভেদী। তবু শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পুনর্নির্মাণের' কাজ যে শুরু হয়েছে, তার প্রমাণ এই গ্রন্থ। কারণ, পুনর্নির্মাণের পথে অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে এই বিষয়ে বিপুল ও বিস্তৃততর গবেষণা।

তথ্যসূত্র

১. M.A. Rahim, *The History of the University of Dacca,* University of Dacca, 1981

২. Serajul Islam Choudhury (ed.), *Dhaka University : Convocation Speeches*, University of Dhaka, 2 Vol, 1988

৩. দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৩

৪. দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

৫. কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

৬. কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

৭. *নওয়াব সলীমুল্লাহ : জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬; *নওয়াব আলী চৌধুরী : জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

৮. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : স্মৃতি নিদর্শন*, শস্যপর্ব, ঢাকা, ২০১১

৯. রঙ্গলাল সেন, *বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩; রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বছর*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৩

১০. রতন লাল চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত বইটি এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থানীয়। এ ছাড়া রয়েছে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস*, বিজয় প্রকাশ, ২০০৬

১১. সৈয়দ রেজাউর রহমান, *গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, মউর, ঢাকা, ২০০১

১২. এই বিষয়ে লিখিত এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হলো Zillur Rahman Siddiqui, *Visions and Revisions : Higher Education in Bangladesh 1947-1992*, UPL, 1997

১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলীমুল্লাহ : জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ১৫১-১৬৬; *নওয়াব আলী চৌধুরী : জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ১২৭-১৩৮

১৪. Sufia Ahmed, 'Nawab Khwaja Salimullah', *Journal of The Asiatic Society,* Dacca, Vol. xxi, No. 3, December 1976, p. 169; উদ্ধৃত : ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ১৯৮৬, পৃ. ১৫৫

১৫. M.A. Rahim, ibid, p.5

১৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ওই

১৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ১৯৮৬ , পৃ. ১৫৯-১৬০

১৮. গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮১, পৃ. ৬৪

১৯. ভূঁইয়া ইকবাল, *রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ*, প্রথমা, ২০১০, পৃ. ১৫২

২০. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, শিক্ষা চিন্তা, রবীন্দ্ররচনা সংকলন*, পৃ. ১২৬,

২১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ওই, পৃ. ১৫৯-১৬০

২২. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে ধারণার জন্য দেখুন, সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা), পূর্বোক্ত

২৩. গোলাম মুরশিদ, ওই

২৪. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, ২০০২, পৃ. ৬৬

২৫. Naomi Levine; 'Introduction: Who Was Edwin S. Montagu', *Politics, Religion and Love : The Story of H.H. Asquith, Venetia Stanley and Edwin Montagu, based on the Life and Letters of Edwin Samuel Montagu,* New York University Press, 1991, p. 4

২৬. Denis Judd; *Lord Reading: Rufus Isaacs, First Marquess of Reading, Lord Chief Justice Viceroy of India 1860-1935*, Faber & Faber, 1982.

২৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ১৯৮৭, পৃ. ১৩০

২৮. বাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদের নানা মাত্রা এবং এর উন্মেষে হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন অমলেন্দু দে। দেখুন, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭

২৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ১৯৮৬

৩০. ভূমি সংস্কার বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার http://www.lrb.gov.bd/site/page/9d7fa745-118e-41a5-96fd-7dd545d915c3)

৩১. সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০, পৃ. ১৭

৩২. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, ২০০২, পৃ. ৮২-৮৬

৩৩. অমূল্যভূষণ সেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার বিপ্লব সাধনা', রঙ্গলাল সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান*, ইউপিএল, ২০০৯, পৃ. ২২

৩৪. রতন লাল, ২০০২ , পৃ. ৬৪

৩৫. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৬, পৃ. ৪৪-৪৯

৩৬. তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের একটি ভাষ্য এবং তখনকার মুসলমান ছাত্রদের রাজনৈতিক মানসের পরিচয় পাওয়া যাবে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকারে। দেখুন, সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৬১-৬৫; আবু আল সাইদ, *ফজলুর রহমান : অনুদার ইতিহাসের এক দশক ১৯৩৭-৪৭*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭। এই বইয়ে ফজলুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যাবে।

৩৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০, পৃ. ২৫৬-২৭৩

৩৮. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ২৫০-৫১

৩৯. দীপঙ্কর মোহান্ত, *লীলা নাগ*, বাংলা একাডেমি (জীবনী গ্রন্থমালা), ১৯৯৯; অজয় রায় ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, সাহিত্য প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩

৪০. দেখুন, *বাংলাপিডিয়া* (২০১১), খণ্ড-১৪, পৃ. ৩৪২

৪১. Syed Murtaza Ali, *Personality Profiles*, National Institute of Profiles Administration, Dacca, 1965

৪২. শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

৪৩. W. Adams, *Third Report on the State of Education in Bengal*-এর প্রকাশকাল এক শ বছর এগিয়ে লেখা হয়েছে ১৯৩৮, যা হবে ১৮৩৮। দুটি বইতেই এই একই ভুল তথ্য ছাপা হয়েছে।

৪৪. Mabel Hartog, *P. J. Hartog : A Memoir by his Wife*, Constable, London, 1949, p. 4

৪৫. Mabel Hartog, ibid, pp. 7-8

৪৬. Mabel Hartog, ibid, pp. 11-23

৪৭. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্টগের দায়িত্ব এবং তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে দেখুন, Mabel Hartog, ibid, pp.45-64

৪৮. SOAS প্রতিষ্ঠার জন্য হার্টগকে তখনকার লন্ডনের এসটাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে কী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তা জানতে দেখুন, Mabel Hartog, ibid, pp. 65-84। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে SOAS-এর অবদান অতুলনীয়। এখান থেকে পিএইচডি করেছেন রফিউদ্দিন আহমেদ, সুফিয়া আহমেদ, আবদুল করিম, এম এ রহিম, এ আর মল্লিক, এ এফ সালাহউদ্দিন আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম, ওয়াকিল আহমেদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখ বাংলাদেশি পণ্ডিত। এই কারণেও হার্টগের প্রতি এই জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

৪৯. *Hundred Years of History of University of Calcutta,* 1957, p. 263, cited by M.A. Rahim, p. 10

৫০. Mabel Hartog, ibid, p. 80

৫১. *Calcutta University Commission, 1917-19, Report Vol. 1, Part-2*, 1919, pp. 121-242

৫২. Mabel Hartog, ibid, p. 87

৫৩. *Calcutta University Commission, 1917-19, Report Vol. 1, Part-2*, 1919, pp. 185-190

৫৪. Serajul Islam (ed.). *Dhaka University: Convocation Speeches*, University of Dhaka, 1988, Vol.1. p. 30

৫৫. Serajul Islam Choudhury, ibid, pp. 28-29

৫৬. Serajul Islam Choudhury, ibid, p. 28

৫৭. Serajul Islam Choudhury, ibid, p. 26

৫৮. A. N. M. Muniruzzaman, *The Living & Working Conditions of Students of the University and Colleges of Dacca, 1957: A Sample*

Survey, Department of Statistics, University of Dacca.

৫৯. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি : প্রকৃতি ও প্রতিকার*, টিআইবি ও এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০০৮

৬০. দেখুন, Ghulam Jilani, *Teacher-Student Relationships at The Dacca University*, University of Dacca, 1961; Ghulam Jilani and B. M. Omar, *An Inquiry into the Factors Influencing the Academic Atmosphere of the Dacca University*, Pakistan Institute of Human Relations, Publications No.1, Department of Philosophy, University of Dacca,1956



বাদাবনের বিজ্ঞান

পাভেল পার্থ

সারসংক্ষেপ

একক আয়তনে দুনিয়ার বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। স্থানীয়ভাবে বাদাবন হিসেবে পরিচিত এই বনটি সচরাচর বর্ণিত হয় বিদ্যায়তনিক ও জ্ঞানকাণ্ডের অধিপতি তল থেকে। সুন্দরবনের মৌয়াল, বাওয়ালি, জেলে, মাঝি, চুনারি, মুন্ডা, বাগদী—মূলত সুন্দরবননির্ভর বনজীবীদের জ্ঞানভাষ্যে এই বৃহৎ বনের কোনো বিবরণ ও রচনা দেখা যায় না। চলতি আলাপখানিতে মূলত পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবন বিভাগের সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলে ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত গবেষণার ভেতর দিয়ে সুন্দরবনের লোকায়ত বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। মোট ৫৩টি ভিন্ন শিরোনামে সুন্দরবনের প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশের জটিল সম্পর্কের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যা কেবল সুন্দরবন নয়, ম্যানগ্রোভ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এক নতুন সংযোজন।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাদাবন, সুন্দরবন, লোকায়ত জ্ঞান, বনজীবী, মৌয়াল, স্থানীয় জ্ঞান, বাঘ, মধু

উৎসর্গ

নিদু মোড়ল, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
বিখ্যাত গুনিন ছিলেন। বনের বাঘকে কাছে ডেকে এনে মাছ খাওয়াতেন, গোলপাতা বিছিয়ে ঘুম পারাতেন। প্রবীণ বয়সে বাঘের কামড়ে মারা যান।

কবিরাজ সুশীল মণ্ডল, পূর্ব কালিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, সাতক্ষীরা, শ্যামনগর
সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে আহত রোগীর বিখ্যাত চিকিৎসক। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বাঘে ধরা মানুষের চিকিৎসা করেছেন এবং প্রায় ২০ জন কুমির ও কামটে কাটা। তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা জানতে ইতালি, জাপান ও ইউরোপ থেকে অনেকে বাংলাদেশিদের সঙ্গে এসে চাপ দিয়েছেন অনেকবার। তিনি এই বিদ্যা সুরক্ষা করেছেন।

ভূমিকা

প্রতিটি জ্ঞানকাণ্ড একটা ক্ষমতা নিয়েই হাজির হয় এবং বহাল থাকে। কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেখানে লেপ্টে থাকে বাহাদুরি, বাণিজ্য আর বারুদের ঝাঁজ। যা অস্বীকার করে বিরাজিত আরও নানা জ্ঞানভাষ্য ও বিবাদ। জুলুম আর জবরদস্তি বহাল রেখে যা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান যেখানে দলিত আর দর্শন বিশৃঙ্খল। জ্ঞানকাণ্ডের এই অধিপতি প্রশ্নহীন ময়দানে চলতি আলাপখানি শুরু হচ্ছে সুন্দরবন নিয়ে। সুন্দরবনকে সচরাচর পাঠ করা হয় কীভাবে? সুন্দরবনকে সচরাচর আমরা পাঠ করি অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাকরণ ও ভাষ্যে। 'একক আয়তনে দুনিয়ার বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন', 'বিশ্বঐতিহ্য', 'রামসার এলাকা', 'বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন যেখানে বাঘ বেঁচে আছে', 'বাংলা বাঘ ও ইরাবতী ডলফিনের বৃহৎ বিচরণস্থল' কিংবা 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল'। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকাণ্ডে সুন্দরবনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এমনসব তকমায়, যা এই জনপদের অরণ্যদর্শন থেকে এই বনকে এক বিচ্ছিন্ন, অনৈতিহাসিক ও অপর অঞ্চল বানিয়ে রেখেছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী হিসেবে দক্ষিণবঙ্গের এই অঞ্চল পরিচিত হলেও মৌলঙ্গী নামের এক পেশাজীবী জনগোষ্ঠী যে এই বনাঞ্চলে নদীর জল থেকে লবণ তৈরির কারিগরি বিকশিত করেছিল সেই হদিস তো একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে অধিপতি দলিল-দস্তাবেজে। তার বাদেও সুন্দরবনকে আগলে বিকশিত হয়ে চলেছে প্রাণ ও প্রকৃতির এক জটিল সংসার। কেবল বাঘ, বনবিবি, বাগদা বা বাউলে লতা নয়; এই সংসারের বাসিন্দা সুন্দরবননির্ভর বনজীবীরাও। বনজীবীরা নিজেদের পরিচয় দেন 'বাদা করা লোক' হিসেবে, কখনো মৌলে-বাউলে। মৌয়াল/মৌয়ালি, বাওয়ালি, চুনারি, জোংরাখুটা, মাঝি, জেলে। এদের কেউ বন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করে, কেউ গরানের ছিটে, কেউ গোলপাতা, কেউ মাছ, কেউ জোংরা। এই মানুষদের জন্ম কি মরণ সবই এই বনের কোলে। ১৯৬০ সালের দিকে উপকূলীয় বাঁধ দিয়ে জলপ্রবাহ ও জঙ্গলের মেলামেশায় প্রথম বড় আকারের রাষ্ট্রীয় বাধা দেওয়া হয়। তার পরপরই নদীর লোনা পানি আটকে কৃষিজমিকে হত্যা করে শুরু হয় বাণিজ্যিক চিংড়ি ঘের। শহরের ধনী মানুষেরা বড় বড় চিংড়ি মাছ খাবে বলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আর বিশ্বব্যাংকের চোখরাঙানিতে বনের আশপাশের সব গ্রাম হয়ে যায় বাণিজ্যিক চিংড়িঘের। খেতকৃষি হারিয়ে দিশেহারা মানুষ নামে বনের জোয়ার-ভাটায়। চিংড়ি পোনা ধরা শুরু হয়, এখন বাচ্চা কাঁকড়া। হাজার বছর ধরে এই অরণ্যগর্ভে জন্ম নিয়ে টিকে আছে যে বনজীবী জনগণ তারা কীভাবে বহুল আলোচিত সুন্দরবনকে পাঠ করে? বনজীবী জনগণের জ্ঞানভাষ্যে সুন্দরবন কেমন? এমন প্রশ্ন কি আমরা করেছি কখনো? তাহলে বনজীবী

নিম্নবর্গের সেই জ্ঞানভাষ্য কোথায়? সুন্দরবনের বনজীবী জ্ঞানভাষ্যের দুটি বিষয় কেবল তথাকথিত মূলধারায় কিছুটা আলোচিত হয়। এর একটি হলো গাজীর গান এবং অন্যটি বনবিবির আখ্যান। মূলত এসব জ্ঞানভাষ্যের উপস্থাপন হয় সব সময় 'লোকসংস্কৃতির' মোড়কে, যাপিত জীবনের বিজ্ঞান হিসেবে নয়। একসময় পচাব্দী গাজীর বাঘ শিকারের কাহিনি শিশুশ্রেণির পাঠ্য হয়েছিল। পশ্চিম সুন্দরবন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনীর সোরা এলাকার বিজ্ঞ বাওয়ালি পচাব্দী গাজীর অরণ্য অভিজ্ঞতা কিন্তু অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে পাঠের বিষয় হয়নি, হয়েছিল তার বাঘ শিকারের পুরুষালি *কীর্তি*। কারণ রাষ্ট্রবাহাদুর আর বন বিভাগের হুকুম পালন করেই তাকে বাঘ মারতে হয়েছিল। সেই বাঘ হত্যা সুন্দরবনের অরণ্যবিজ্ঞানের অংশ ছিল না। তার মানে সুন্দরবনকে আমরা বরাবর দেখি এই বন-সংসার থেকে বহুদূরের কিছু অন্য মানুষের নির্দেশ ও উপস্থাপনায়। এমনকি বাঘ থেকে শুরু করে বন্য প্রাণ গবেষণায় সুন্দরবনের আগত মহান গবেষকেরা বরাবর স্থানীয় বনজীবীদের দিয়ে তাদের নানা কিসিমের কাজ করান, বনজীবীদের সঙ্গে বনেবাদায় ঘুরে বেড়ান। বিস্ময়করভাবে বনজীবীদের কাছ থেকে জানা বন্য প্রাণ-সম্পর্কিত জ্ঞানভাষ্যই হয়ে ওঠে তাদের গবেষণা দলিল। সেসব দিয়ে তাদের বিদ্যায়তনিক ডিগ্রি হয়, নানা কিসিমের ক্যারিয়ার হয়। বইপুস্তক ছাপা হয়। গবেষণার নামে সুন্দরবনের বনজীবীদের জ্ঞানবিজ্ঞান ডাকাতি হয়ে আজ কোথায় কতভাবে বিক্রি হচ্ছে তার হদিস কে রাখে!

চলতি আলাপ এই জ্ঞানডাকাতি বা নিম্নবর্গের মেধাস্বত্ব সুরক্ষা নিয়ে নয়। চলতি আলাপখানি সুন্দরবনের বনজীবীদের লোকায়ত অরণ্যবিজ্ঞানের কিছু নমুনাকে একত্র করে সুন্দরবন নিয়ে নিম্নবর্গীয় জ্ঞানকাণ্ডের ময়দানে শামিল হতে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। পশ্চিম সুন্দরবন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জ, পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই ও খুলনা রেঞ্জের ধারেকাছের বনজীবীদের অরণ্যভাষ্য থেকে চলতি আলাপখানি শুরু হচ্ছে। সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার সুন্দরবনসংলগ্ন মোট ১৬০ জন বনজীবীর সরাসরি জ্ঞানভাষ্যে চলতি আলাপখানি তৈরি হয়েছে। এই বনজীবীদের ভেতর জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, বয়স, অঞ্চল ও পেশাগত ভিন্নতা আছে। ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মোট চার বছরের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ব্যাখ্যা ও সূত্রের ভেতর দিয়ে চলতি আলাপের বিবরণ দাঁড়িয়েছে। চলতি আলাপখানির একটা সংক্ষিপ্ত ও সহায়ক রূপ কোনো ধরনের সূত্র উল্লেখ ছাড়াই (যদিও সেটিও হয়তো একটা আলাদা লেখা) একই শিরোনামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *সর্বজনকথার* তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালের নভেম্বরে।

সুন্দরবন ও লোকায়ত জ্ঞান : পূর্বের গবেষণার হদিস

সুন্দরবনের নিজস্ব লোকায়ত বিজ্ঞান নিয়ে কতখানি এবং কী ধরনের কাজ হয়েছে তা কিছু খতিয়ে দেখা জরুরি। চলতি আলাপে বিষয়টি বোঝার তাগিদে আমরা কেবল বাংলাদেশের নয়, ভারতীয় সুন্দরবন এবং সারা দুনিয়ার ম্যানগ্রোভ বন ও উদ্ভিদ নিয়ে এর লোকায়ত জ্ঞান বিষয়ে কী ধরনের গবেষণাকাজের নজির আছে তা জানার চেষ্টা করব। সুন্দরবন নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত গবেষণাধর্মী পুস্তক ও সাহিত্যকর্ম খুব একটা নেই। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারত থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু পুস্তক প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশের সুন্দরবন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা একেবারেই নেই। ভারত থেকে প্রকাশিত সুন্দরবন-বিষয়ক পুস্তকগুলোতে[১] মূলত সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের জনজীবন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে 'লোকসংস্কৃতির' মোড়কে। সুন্দরবননির্ভর বনজীবীদের অরণ্য অভিজ্ঞতাকে সেসব পুস্তকে বিজ্ঞান নয়, মূলত 'অন্যদের সংস্কৃতি' বা 'অপরের সংস্কৃতি' হিসেবেই পাঠ করা হয়েছে।

স্টিফেনরিস্ট ও ফরিদ দাদাহ গুয়েবাস (২০০৬) ভারত, কেনিয়া ও শ্রীলঙ্কার ম্যানগ্রোভ বনের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় জ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় বৈজ্ঞানিক ও লোকায়ত জ্ঞানের সমন্বয় জরুরি।[২] মেলিসা (১৯৯৯) কম্বোডিয়ার পিএম ক্রাসাওপ বন্য প্রাণী ম্যানগ্রোভ অভয়ারণ্যের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পরিবেশজ্ঞানের উপযোগিতা উল্লেখ করে তার বিদ্যায়তনিক অভিসন্দর্ভে[৩] দেখান, স্থানীয় জ্ঞান ম্যানগ্রোভ বনের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সংরক্ষণ-প্রক্রিয়া রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। ম্যানগ্রোভ বনের সুরক্ষা ও বিকাশে স্থানীয় লোকায়ত জ্ঞান অনিবার্য হলেও দুনিয়াব্যাপী লোকায়ত জ্ঞানের ময়দান থেকে ম্যানগ্রোভ বনকে তালাশ করার রচনা একেবারেই কম। সেখানে বাংলাদেশের সুন্দরবন ঘিরে এমনতর রচনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সুন্দরবনের প্রাণবৈচিত্র্য ও জীবনযাত্রা নিয়ে তথাকথিত মূলধারার গবেষণা ও চিন্তাগুলো সব সময় সুন্দরবনকে একটা সম্পদের আধার এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীকে গরিব অসহায় হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। যাদের নিয়ে এবং যাদের জন্য বন ব্যবস্থাপনাকে কোনো কোনো গবেষণা[৪] দেখে সেসব চিন্তাকে সাধারণত 'জনমুখী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এসব তথাকথিত 'জনমুখী' গবেষণাগুলোয় কখনোই বনজীবীদের চিন্তা ও জ্ঞানপদ্ধতির উল্লেখ থাকে না। আবার এমনসব গবেষণাও[৫] আছে যেখানে সুন্দরবন নিয়ে স্থানীয় চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করলেও কোথাও সেই চিন্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ম্যানগ্রোভ বন নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা ও কাজের নজির আছে। কিন্তু অধিকাংশ গবেষণা দলিল[৬] উপস্থাপিত হয় বিদ্যায়তনের একটা অধিপতি কাঠামোর

ঘের থেকে, যেখানে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের লোকায়ত বিজ্ঞানের জায়গা নেই। বনবীজীরা নানাভাবে ম্যানগ্রোভ বন ও এর বৈচিত্র্যকে শ্রেণিবিন্যস্ত করে থাকেন এবং এই জনশ্রেণিবিন্যস্ত জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণভাবেই আজ স্বীকৃত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা যায়, মূলধারার গবেষণা ও রচনাগুলোতে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের উদ্ভিদের বিবরণ ও শ্রেণিবিন্যাস উপস্থাপনের[৭] ক্ষেত্রে লোকায়ত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন ঘিরে যেসব রচনায় লোকায়ত জ্ঞানের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় সেখানে কীভাবে এই অরণ্য প্রকাশিত হয়েছে। রায় (২০১৩) ভারতীয় সুন্দরবন অংশের মৌয়ালদের জীবনযাত্রা ও আর্থসামাজিক এক গবেষণায় জানান, মৌয়ালরা তাদের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করেন। কিন্তু সেই নিজস্ব জ্ঞানের কোনো বিবরণ তাঁর লেখায়[৮] নেই। মিয়া ও অন্যরা (২০০৩) এক যৌথ গবেষণায়[৯] জানান, বাংলাদেশের সুন্দরবনের বাগেরহাট অঞ্চলে গ্রামবাসী কৃষকেরা গোলপাতা চাষ করতে জানেন এবং তাঁরা গোলপাতা চাষে তাঁদের নানা লোকায়ত পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রানী ঘোষাল (২০০৬) উল্লেখ[১০] করেছেন, সুন্দরবনের জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতি আছে। যেমন ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্রের ব্যবহার, বিভিন্ন গাছের পাতার রস, শিকড় ইত্যাদির ব্যবহার। নিজস্ব চিকিৎসার কোনো বিবরণ কি ব্যাখ্যা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। মাহমুদ ও অন্যরা (২০১৪) এক সমীক্ষায়[১১] বলেছেন, সুন্দরীগাছের পাতা, কাণ্ড ও শিকড় সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানীয় মানুষেরা ডায়াবেটিস, পেটের পীড়া, বাত, চর্মরোগসহ নানা কাজে ব্যবহার করে। পূর্বকৃত কিছু গবেষণাকাজের সূত্র উল্লেখ করলেও বাংলাদেশের সুন্দরবনের কোন অংশ থেকে এসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং কাদের কাছ থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে তার কোনো বিবরণ ও সূত্র রচনাটিতে নেই। মূলধারার এ রকম সূত্রবিহীন রচনাগুলো কেবল মেধাস্বত্ব অধিকারই লঙ্ঘন করে না, বরং করপোরেট প্রাণডাকাতিকে উসকে দেয়। রায় (২০১৪) তাঁর এক লেখায়[১২] সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের মৌয়াল, বাওয়ালি ও মুন্ডা আদিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ২৫টি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের কেবল ঔষধি ব্যবহার উল্লেখ করেছেন।

এ তো দেখা গেল সুন্দরবনের মতো এক 'দলিত' অরণ্যের কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ম্যানগ্রোভ অরণ্য নিয়ে রচনার ক্ষেত্রে লোকায়ত জিজ্ঞাসার জায়গাখানি খুবই কম ও সংকীর্ণ। দেখা যায়, দুনিয়াজুড়ে ম্যানগ্রোভ বনের লোকায়ত জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে কী ধরনের রচনা তৈরি হয়েছে? দাদাফগুয়েবাস ও অন্যদের (২০০৬) এক সমীক্ষা[১৩] থেকে দেখা যায়, ভারতের পূর্ব গোদাবরী

বদ্বীপের ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বাসিন্দারা বাইনগাছ জ্বালানি ও গৃহনির্মাণে, গরানের বাকল মাছ ধরার জাল মজবুত করতে, খলসিগাছের বাকল মাছ ধরার 'বিষ' হিসেবে, বাইন ও গেওয়ার পাতা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। রিভাথি ও অন্যরা (২০১৩) তাঁদের এক গবেষণায়[১৪] দেখিয়েছেন, বাইনগাছের আধিক্য যেখানে থাকে সেখানে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও ডেঙ্গু জীবাণু মরে যায়। মিরেরা ও অন্যরা (২০১৩) ম্যানগ্রোভ বনের কাঁকড়া ধরার ক্ষেত্রে স্থানীয় কৌশল ও লোকায়ত জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের গবেষণায়[১৫]। মাসারু ও অন্যরা (২০১০) তাঁদের বইয়ে[১৬] তাঞ্জানিয়ার সমুদ্র উপকূলে প্রবাল দ্বীপ ও মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোকায়ত জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও সামাজিক নিষেধাজ্ঞাগুলো আলোচনা করেছেন। গার্ডনার ও অন্যরা (২০১৬) মাদাগাস্কারের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে পাখিগণনা শীর্ষক এক সমীক্ষায়ী[১৭] দেখান, পাখিগবেষকেরা নিজেরা ৭৩ প্রজাতির পাখি গুনেছেন কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা আরও ১৮ প্রজাতির পাখিকে গণনায় যোগ করেন, যা আগে কখনোই কেউ যুক্ত করেনি। এই সমীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা জানান, ম্যানগ্রোভ বনে পাখিগণনার কাজে লোকায়ত জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিলিপাইনের শ্বাসমূলীয় বনে গরান বৃক্ষের আধিক্য থাকায় গরান পরিচিতি পেয়েছে 'হলুদ ম্যানগ্রোভ' হিসেবে। সেখানকার ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের মানুষ জ্বালানি, গৃহনির্মাণ, মাছ ধরার উপকরণ, রং তৈরি, জাল মজবুত করতে এবং হাত-পা কেটে গেলে ক্ষত ও রক্তক্ষরণ সারাতে গরানের বাকল ব্যবহৃত হয়[১৮]। রোসা ও অন্যরা (২০০৫) দেখিয়েছেন ব্রাজিলের সমুদ্র উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের জেলেদের লোকায়ত জ্ঞান সমুদ্রঘোড়া সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে[১৯]।

ম্যানগ্রোভ বন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নিয়ে সুন্দরবন বাদে ভারতের অন্যান্য সমুদ্র উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার অঞ্চলে বেশ কিছু গবেষণা ও রচনায় কিছু লোকায়ত চর্চা ও স্থানীয় জ্ঞানের বিবরণ জানা যায়। তবে সেসব রচনার অধিকাংশই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ঔষধি গুণাগুণ ও ব্যবহার নিয়ে। মূলত কাঠামোবদ্ধ মূলধারার জন-উদ্ভিদ গবেষণা। কিন্তু ম্যানগ্রোভের বনের বাসিন্দাদের জ্ঞানভাষ্যে বনের বিবরণ রচনাসমূহে দেখা যায় না। যেমন গোবিন্দস্বামী ও কান্নান (২০১২) যৌথ গবেষণায়[২০] জানান, বিশ্বব্যাপী ১৮ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ লোকায়ত চিকিৎসায় স্থানীয়ভাবে ভারত, কেনিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবহৃত হয়। কাঁকড়াগাছের কাণ্ডের নির্যাস মানুষের দুই জটিল টিউমারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। স্মরণরাজ ও সুজিতা (২০১৫) এক যৌথ গবেষণায়[২১] দেখান, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের নির্যাস মশা নিরোধ, ছত্রাকনাশক, ব্যাকটেরিয়ানাশক, ভাইরাসনাশক, ক্যানসার প্রতিরোধ ও

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সারান্য ও অন্যরা হরগোজা উদ্ভিদের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁদের গবেষণায়[২২] জানিয়েছেন, এই উদ্ভিদ সাপে কাটা চিকিৎসা থেকে শুরু করে বাত ব্যথায় ব্যবহৃত হয়। বন্দরনায়েকে (১৯৯৮) ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলোর ঔষধি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, যদিও লেখাটিতে[২৩] এসব সর্বজনীন প্রাকৃতিক সম্পদ ঘিরে একটা করপোরেট বাণিজ্যিক আহ্বান আছে। কাশেম ও অন্যরা (২০১৪)[২৪] পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের এক জন-উদ্ভিদ সমীক্ষায় ৫৪টি গাছের ব্যবহার জানান। কিন্তু সেগুলো ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদবৈচিত্র্য নয়। রবীন্দ্রান ও অন্যরা (২০০৫) ভারতের তামিলনাড়ুর পিচাভারাম ম্যানগ্রোভ বনের ওপর এক জন-উদ্ভিদ সমীক্ষায়[২৫] ১১ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের লোকায়ত ব্যবহার বর্ণনা করেন। ভারতের ওড়িশা রাজ্যের ভেতর কানিকা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য থেকে ৫১ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের স্থানীয় ব্যবহার বর্ণনা করেছেন পট্টনায়েক ও অন্যরা (২০০৮) আরেক সমীক্ষায়[২৬]।

সুন্দরবন নিয়ে মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত 'চিহ্ন' হলো বাংলা বাঘ। সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে মো. মনিরুল এইচ খানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম আছে। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভে[২৭] বনজীবীদের বাঘ-জ্ঞান স্বীকৃতিসহ উল্লিখিত না হলেও তিনি জানান, সুন্দরবনের আশপাশের মানুষের কাছে বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের চাহিদা আছে, যা বাত ব্যথা, শক্তিবৃদ্ধি, যৌনশক্তি ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এমনকি বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের বাংলা বাঘ নিয়ে করা এডাম বার্লোর (২০০৯) পিএইচডি অভিসন্দর্ভের[২৮] কোথাও বাঘসম্পর্কিত লোকায়ত জিজ্ঞাসার কোনো সূত্র নেই। অথচ এসব গবেষণায় বাংলা বাঘ নিয়ে উত্থাপিত অনেক কিছুই সুন্দরবনের বনজীবীদেরও জ্ঞান।

গবেষণা ও লেখালেখির জায়গা থেকে ম্যানগ্রোভ অরণ্য দীর্ঘ সময়জুড়ে জীববিজ্ঞানীদের দখলে ছিল। করমিয়ের-সালেম (১৯৯৯) আফ্রিকার ম্যানগ্রোভ বনবিষয়ক গবেষণাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, প্রকৃতিবাদী গবেষণার পাশাপাশি দুই যুগ ধরে ম্যানগ্রোভ বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণাও শুরু হয়েছে[২৯]। যদিও সামাজিক গবেষণাগুলোও সুন্দরবনের লোকায়ত জিজ্ঞাসাসমূহ তুলে ধরছে না। সুন্দরবন ও বননির্ভর জনগণের চিন্তায় কাহিল[৩০] মূলধারার উন্নয়ন ডিসকোর্সগুলো 'জনগোষ্ঠীভিত্তিক পর্যটনের' সাফাই শুরু করেছে মূলত ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার পরপর। মোটা দাগে ২০০৭ থেকে সুন্দরবনে এমনতর পর্যটন সম্ভাবনার প্রসঙ্গ তুলছে অনেকেই। এসব জনগোষ্ঠীভিত্তিক পর্যটন কর্মসূচি যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁদের কোনো চিন্তাসূত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চোখে বনকে দেখা হয় না। সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীভিত্তিক 'ইকোট্যুরিজমের' পরিকল্পনা করে রচিত এক

যৌথ লেখায়[৩১] হক ও অন্যরা (২০১৬) সুন্দরবনের লোকায়ত জ্ঞানের কোনো হদিস না রেখে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোকে 'আধুনিক'[৩২] পর্যটকের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন।

আলাপের এ পর্যায়ে আমরা সরাসরি বনজীবীদের লোকায়ত জ্ঞান ও ভাষ্যে বাদাবনের বিজ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা করব। মোট ৫৩টি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বনজীবীদের হাজারো বছরের লোকায়ত বয়ানের ভেতর দিয়ে বাদাবনের বিজ্ঞানকে জানাবোঝার এক ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হয়েছে। সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ বন-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণা ও রচনা বিশ্লেষণ করে এটি দেখা যায়, লোকায়ত জ্ঞানভাষ্যে সুন্দরবন কি ম্যানগ্রোভ বন-সম্পর্কিত রচনা খুব একটা নেই। বাংলাদেশের সুন্দরবনের মূলত পূর্ব ও পশ্চিম বন বিভাগের সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত সুন্দরবন-সম্পর্কিত চলতি আলাপে উত্থাপিত সব ভাষ্য, তথ্য ও বিবরণই এ বিষয়ের একেবারেই প্রথম উপস্থাপন।

১. বাদাবন ও বনবিবি

সুন্দরবন স্থানীয়ভাবে বাদা বা বাদাবন, হুলোবন, শুলোবন, মাল, মহাল হিসেবে পরিচিত। বাদা মানে জোয়ার-ভাটা বয়ে যায় যে বনে। ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় এই বাদার নাম হয়ে যায় মহাল। মধুমহাল, গোলমহাল। সুন্দরবনে বৃক্ষবৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে বলে থাকেন 'সুন্দরী'গাছের আধিক্যর কারণেই এই বন সুন্দরবন নাম পায়। তবে স্থানীয়ভাবে এই বন 'বাদা' নামেই পরিচিত। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে শ্বাসমূলীয় অরণ্য স্থানীয় ব্যক্তিরা তেলেগু ভাষায় 'মাদাআদাভি' বলেন। যদিও 'মাদা' বলতে স্থানীয় ব্যক্তিরা বাইনগাছকে বোঝান এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শ্বাসমূলীয় বনে বাইনেরই আধিক্য বেশি[৩৩]। বাদাবনের এক এক অংশে এক এক বন্য প্রাণের বিচরণ। বাদাবনে পাখিদের বিশেষ আবাসস্থলকে বাদাল বলে। সাতক্ষীরা রেঞ্জে চুনকুড়ি নদীর পাশে সুবদে-গোবদে খালের পাশে বাংলাদেশের বড় বাদাল। এক নদীর সঙ্গে আরেক নদীর সংযোগ খালকে ভাড়ানি বলে। অনেক জায়গায় একে দুইনে বা দোনেও বলে। আবার এক মুখ বন্ধ খালকে জোলা বলে। সুন্দরবনে অনেক জায়গার নাম হুলো। হুলো মানে নদীর বাঁক। এসব জায়গায় একটা বাঁক অনেক সময় বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার ঘুরে একটা জঙ্গল-দ্বীপের মতো আদল তৈরি করে।

বাদাবনের ভেতর হঠাৎ প্রাকৃতিকভাবে ফাঁকা জায়গাকে চটক বলে। চটক জায়গায় গেওয়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়ার মতো বড় বড় গাছ থাকে। বড় গাছের নিচে ঝোপজঙ্গল কম থাকে। চটক জায়গায় বাঘ কম থাকে। নদীর ভেতর হঠাৎ নতুন ছোট্ট চরে বন জন্ম নিলে তাকে টেক বলে। বাদাবনে নদীর তীর থেকে বনের

ভেতর পর্যন্ত নানা গাছের নানা সারি। এক এক গাছের এক এক পরিবার। ধানি বা ধানচি চর থেকে শুরু হয়, তারপর তীর থেকে বনের ভেতরের দিকে থাকে হরগোজা, হেন্তাল, গোলপাতা, কেওড়া, বাইন, গেওয়া ও সুন্দরী। তুলনামূলকভাবে সাতক্ষীরা ও চাঁদপাই রেঞ্জে বাঘ, বনশূকর বেশি। এখানে মধুও বেশি। খুলনা রেঞ্জে সুন্দরীগাছ বেশি, সুন্দরীর শুলো বেশি বলে সেখানে বাঘ কম বিচরণ করে। খুলনা রেঞ্জে হরিণ বেশি। সাতক্ষীরা রেঞ্জে প্রবীণ কেওড়া, বাইন ও পশুরগাছের আধিক্য আবার খুলনা রেঞ্জে সুন্দরীর। বাদাবনের রক্ষাকবচ হলেন মা বনবিবি। মা বনবিবি ও শাহজঙ্গলি ধর্মে মুসলিম, কিন্তু বাদাবনে তাঁরা পূজিত হন। তাদের নামে মুরগি ছেড়ে উৎসর্গ করে তারপর বাদায় প্রবেশ করতে হয়। মুসলিম কি সনাতন হিন্দু, বাঙালি কি আদিবাসী মুন্ডা, মাহাতো বা বাগদি সবাই মা বনবিবিকে মান্য করে বাদাবনে। বাদাবনের অনেক জায়গায় বনবিবির থান আছে। এমনতর থানগুলো পবিত্র জঙ্গল হিসেবে সুরক্ষিত হয়। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের শামাগাজীর হুলো এমন এক বনবিবির থান। এসব থানে প্রতি মধু মৌসুমের শুরুতে বা কোনো মানত নিয়ে বনজীবীরা গিয়ে মোরগ-মুরগি উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়। এসব পবিত্র থানের গাছগাছড়া কেউ কাটে না। এই থানগুলোতে বৃক্ষ ও প্রাণীবৈচিত্র্য বেশি দেখা যায়। আজ পর্যন্ত বনবিবির থান এলাকায় কোনো বনজীবী বা বাঘ কেউ আক্রান্ত হয়নি।

২. আঠারভাটির পথ

বাদাবন দিনে চারবার রূপ বদলায়। দিনে দুবার ভাটা ও দুবার জোয়ার হয়। বাদাবনের সবচেয়ে দূরতম এবং কঠিনতম অঞ্চলের নাম আঠারভাটির পথ। বনজীবীদের কাছে এটি এক পবিত্র অঞ্চল। ১৮টি ভাটি এবং ১৮টি জোয়ার পাড়ি দিয়ে সে জায়গায় পৌঁছাতে হয়। একটি বাঘ এক দিনে এই আঠারভাটির পথের সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। বাদাবনের বহুল চর্চিত মা বনবিবির পালা ও পুঁথিতে বারবার এই আঠারভাটির পথের বিবরণ আছে।

৩. মাছের নামে স্থানের নাম

একটি অঞ্চলকে সার্বিকভাবে বুঝতে হলে অঞ্চলটির স্থানের নামের আদ্যন্ত জানা জরুরি। অধিকাংশ সময় কেবল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতায় একটি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয় মূলধারার রচনাগুলোতে। যেখানে স্থানীয় জনজীবনের ইতিহাস ও জনসংস্কৃতি একেবারেই অনুচ্চারিত থাকে। সুন্দরবন নিয়ে মূলধারার রচনাগুলোয়ও স্থানের নামের সার্বিক বিশ্লেষণ দেখা যায় না। কেবল 'সুন্দরবন' নামটি কেন সুন্দরবন হয়েছে এটি নিয়ে রচনাসমূহে একটা

'প্রারম্ভিক বাহাস' থাকে। বুহনেনের (১৯৯২) এক গবেষণায় দক্ষিণ সেনেগাল, গাম্বিয়া ও জার্মানির উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের স্থানের নামের সঙ্গে ঐতিহাসিক কারণগুলোর কিছু যুক্ততা দেখা যায়[৩৪]। বাদাবনের নদীতে নানা জাতের মাছ। মাছের নামেই বাদাবনের স্থানের নাম পরিচিত হয়েছে। পারশেখালী, কৈখালী, দাঁতিনাখালী, ভেটখালী, ভেটকীখালী, আমাদি, চিংড়াখালী, জোংড়াখালী। সুন্দরবনের আশপাশের এই স্থানগুলোর নাম মাছের নামে গড়ে উঠেছে। পারশে, দাঁতিনা, ভেটকী, চিংড়ি, আমাদি, জোংড়া সবই সুন্দরবনের নদী-খালে পাওয়া যায়। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের সুন্দরবন লাগোয়া এক প্রাচীন গ্রামের নাম দাঁতিনাখালী। সুন্দরবনের বিখ্যাত দাঁতিনা মাছের স্মৃতি নিয়ে এই গ্রাম। গ্রামের পাশে মালঞ্চ ও চুনো নদীর খালে দাঁতিনা মাছের আধিক্য ছিল বেশি। এই অঞ্চলটি দাঁতিনা মাছের বড় বিচরণস্থল ছিল। সুন্দরবনে তিন প্রকারের দাঁতিনা মাছ দেখা যায়। কাঁকরভাঙা, রুচো ও সাদা দাঁতিনা। দাঁতিনা মাছকে অনেকে দাঁইতনে মাছও বলে। কাঁকরভাঙা দাঁতিনা মাছের গায়ে কালো কালো ফুট (দাগ) আছে। দাঁতিনার ভেতর এদেরই ওজন বেশি হয়। দেখতে বড় হয়। বনের ভেতরের খালে থাকে। রুচো দাঁতিনার শরীরে সাদা সাদা দাগ থাকে। এদের ওজন ৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম হয়। জঙ্গলের পাশের খালে এদের দেখা যায়। একদম সাদা রঙের দাঁতিনা, এরা রুচো থেকে বড় হয়।

৪. বন থেকে গ্রামে উড়ে আসা মাছ

বাদাবনের এক বিশেষ মাছের নাম বাঙশ। মাঝবয়সী কোনো বনজীবী নারীর ডান হাতের মাপে প্রায় চার হাত লম্বা হয় এই মাছ। বর্ষাকালে নদীতে এর আধিক্য বেশি থাকে। তবে শীতকালে এই মাছ বাদা থেকে উড়ে গ্রামে চলে আসে। বাদাবনের আশপাশের গ্রামে ধানের গোলা হয় উঠানের মাঝে। বাঙাশ মাছ ধানের গোলা থেকে ধান খেয়ে আবার উড়ে বাদায় ফিরে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বাদাবন থেকে কেওড়া ফল ঝরে পড়ে নদীতে। ঝরে পড়া কেওড়া ও বাইন ফল খেতে আসে পাঙাশ মাছ। কেওড়াভোজী পাঙাশ গায়েগতরে বড় হয় এবং খেতে কিছুটা টক স্বাদের হয়ে পড়ে। পাঙাশ মাছের আকার ও ওজন দেখে বোঝা যায় কেওড়ার ফলন কেমন হয়েছে। মাছের আকার বেড়ে যাওয়া মানে কেওড়ার ফলন বেশি হওয়া। কেওড়ার ফলন বেশি হওয়া মানে বনে ফুলের পরাগায়ন ভালো হয়েছে। পরাগায়ন ভালো হয়েছে মানে মৌমাছিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ আছে। মৌমাছিরা নিরাপদে আছে মানে মধু-মোমের পরিমাণও ভালো হয়েছে। মৌয়ালিরা যদি ভালোভাবে মধু আহরণ করে এবং জেলেরা মাছ ধরতে পারে তবে বন বিভাগও ভালো রাজস্ব পায়। বনজীবী পরিবারগুলোও ভালো থাকে। মাছ, ধান, মৌমাছি, মানুষ, বন বিভাগ সব নিয়ে এক জটিল সংসার বাদাবন।

৫. পাকলে খাওয়া যায় এমন কোনো ফল নেই

পাখি, হরিণ, বানর, মাছ বা পতঙ্গ বাদাবনের ফলমূল খেয়ে বাঁচে। তাদের অনেকেই কাঁচা ও পাকা ফল খেতে পারে। কিন্তু পাকলে মানুষ খেতে পারে, এমন কোনো ফল নেই বাদাবনে। কেওড়া হলো বাদাবনের সবচেয়ে বেশি আহরিত ও ভোজ্য ফল। কেওড়া দিয়ে সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামে নোড়া, আচার, টক নামের নানা পদের খাবার তৈরি হয়। কেওড়া, হেন্তাল, ধুতল, বাবলে, জানা, ছইলা, গোল, বান্দা, ঘড়িয়া ও হরিণআড়ুগাছের ফল কাঁচা অবস্থাতেই খায় মানুষ। পাকলে এসব ফল মানুষ খেতে পারে না। তবে একমাত্র হরিণআড়ুর ফল পাকলেও কেউ কেউ খেয়ে দেখেন। কাঁচা সুন্দরী ফল পোক্ত হলে সিদ্ধ করে কষ-পানি ফেলে দিয়ে এর শাঁস চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়।

৬. বাদাবনের উল্কি

বনজীবীরা উল্কি করাকে বলেন 'ঠেংনা করা'। এটি বাদাবনের একধরনের প্রাচীন চিকিৎসারীতি। মানুষের 'লিভার' অসুখ হলে এটি করা হয়। লিভার হলে পেট বড় হয়ে যায়, বেশি বেশি খিদে পায়। পায়খানা অনিয়মিত হয়, পায়খানা পাতলা হয় এবং একসময় স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। বনজীবীদের গ্রামে গুনিনের বাড়িতে কোথাও বাঘ মারা গেলে সেখান থেকে এক টুকরো জিব সংগ্রহ করে রাখা হয়। লিভারের চিকিৎসায় ঠুঁটে কলার ভেতর শস্যদানার পরিমাণ মরা বাঘের জিবের মাংস পুড়িয়ে ভরে খাওয়া হয়। পাশাপাশি হরগোজাগাছের শিকড় পুড়িয়ে হাতে ঠেংনা করা হয়। সাধারণত বাম হাতে এটি করা হয়। ঠেংনা করা হাত দুটি সাক্ষ্য দেয়, ব্যক্তিটি হয়তোবা বনজীবী পরিবারের কেউ এবং তার কখনো লিভার হয়েছিল।

৭. সব গাছে মৌচাক হয় না

বাদাবনের গাছেরা নোনা জলের গাছ। এদের হুদো বা হুলো আছে। মাটির তলা থেকে ওপরে উঠে আসা হুলো দিয়েই গাছেরা শ্বাস নেয়। বাদাবনের প্রায় গাছের পাতাই রসে ভরপুর। পাতা টিপলে নোনা স্বাদের পানি বের হয়। অনেক গাছে ফলের পেটেই চারা জন্মায়। নানা জাতের গাছ হলেও সব গাছে মৌমাছি চাক বানায় না। মৌমাছিরা সবচেয়ে বেশি চাক বানায় কাঁকড়া, জানা, পশুর ও গেওয়াগাছে। এসব গাছে চাক বানানোর কারণ গাছগুলোর কাণ্ড চওড়া এবং তাদের আশপাশ খোলামেলা থাকে। কারণ এসব গাছ একাই বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত থাকে। এসব গাছে চাক তৈরি করলে মৌচাকগুলো ভালো

হাওয়া-বাতাস পায়। তারপরই মৌমাছিদের পছন্দ বাইন ও গরান। তুলনামূলকভাবে জানা, পশুর ও কাঁকড়াগাছে বানানো চাকের আকার বড় হয়। এসব চাকে অনেক মৌমাছি একসঙ্গে থাকে। এদের সমাজ বড় সমাজ। কিন্তু গরানগাছে বানানো চাক ছোট হয় এবং এখানে মৌমাছিদের সংখ্যাও কম থাকে, মধুও কম হয়। হেন্তাল ও হরগোজার ঝোপও মৌমাছির প্রিয় আবাসস্থল, অনেক মৌচাক গেওয়া, ধুন্দল, পশুরের বড় বড় ঢোঁড়ের ভেতর দেখা যায়। কাঁকড়াগাছের ডালপালা সব সময় হেলা (বাঁকা) হয়ে লম্বা হয়, যা চাক বানাতে মৌমাছিদের পছন্দ। কারণ বাঁকানো ডালে ও ঝোপে চাক বানালে চাক টেকসই বেশি হয়। ঝড়, বাতাস ও জোয়ার থেকে সুরক্ষিত থাকে।

চান্দা, বনলেবু ও গোলগাছে সাধারণত মৌমাছি চাক বানায় না। বনলেবুর গাছের ডাল চিকন ও গোলের ডাল পিচ্ছিল ও দ্রুত পচে যায়। চান্দাগাছের ডালের ছালে একধরনের গন্ধ আছে। এসব কারণে এসব গাছে মৌমাছি চাক বানায় না। সুন্দরীগাছ থেকে মধু সংগ্রহ না করলেও এই গাছের ধরন এমন যে মৌমাছি চাক বানাতে পছন্দ করে। হেন্তাল গাছের ঝোপে চাক বানাতে পছন্দ করে মৌমাছি, কারণ ঝোপের ভেতর সরাসরি রোদ লাগে না এবং জায়গাটি তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা থাকে। সাতক্ষীরা রেঞ্জে গরান ও খলসিগাছ বেশি বলে মৌচাক বেশি ও মধু বেশি। তুলনামূলকভাবে খুলনা রেঞ্জে গাছের উচ্চতা বেশি, তাই মৌমাছি সেখানে সাতক্ষীরা রেঞ্জের পর চাক তৈরি করে। বাইন ও সুন্দরীগাছে বানানো চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা খুব কঠিন। গাছগুলো সোজা ও লম্বা ধরনের, গাছে ওঠার জন্য ধরার মতো কোনো ডালপালা নেই। চান্দাগাছে মৌমাছি কখনোই চাক বানায় না। চান্দাগাছের বাকল চিবালে মুখ লাল হয়ে যায়। বনলেবুগাছে মৌমাছি চাক বানায় না। বনলেবুর ডাল খুব চিকন, চাকের ভার সইতে পারে না। গোলফলের ডালেও চাক হয় না। কারণ গোলের ডাল খুব পিচ্ছিল ও তেলতেলে। খুব সহজেই পানি লেগে ডাল পচে যায়।

৮. ফুলপঞ্জিকা

বাদাবনে একেক ফুলের একেক রং। আর ফুলের রঙেই বদলে যায় মধুর স্বাদ। জানাগাছের ফুল নীলচে সাদা, সুন্দরীর লাল, হরিণআড়ুর ফুল লালচে, বাইনের লাল, গেওয়ার সোনালি, কিরপি-ঢালচাকা-পশুরের লালচে সাদা, কাঁকড়ার সবুজ, গোলের লালচে ও হরগোজার ফুল বেগুনি। এ ছাড়া বাদাবনের প্রায় গাছের ফুলের রংই সাদা। 'হিন্দুদের ঢাকে বাড়ি পড়লে' মানে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় কেওড়ার ফুল ফোটা শুরু হয়। মাঘ মাসে ফোটে গরানের নীলচে ফুল ও তরার সাদা ফুল খলিসা ফুটতে শুরু করে ফাল্গুন থেকে। কিরপি,

ঢালচাকা, পশুর, ধুন্দল, গুঁড়ে, কাঁকড়া, কালোলতা, হরগোজা, গোল, জানা, বনলেবু, কেয়া, লাটমে, সুন্দরী, ধানি, বাউলে লতা, বাঁকঝাঁকা, হরিণআড়ু, কেওড়া, বাইন, গেওয়ার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র থেকে ফোটা শুরু হয় এবং প্রায় আষাঢ়-শ্রাবণ পর্যন্ত অনেকের ফুল থাকে। এক ফোঁটা মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌমাছিকে প্রায় আশিটি ফুলে যেতে হয়। চাকের ভেতর এক কেজি মধু জমাতে মৌমাছিদের নিজের বসতি চাক থেকে নানা ফুলে ফুলে যাতায়াত করতে হয় প্রায় দেড় লাখবার। নানান মধুর ভেতর আগুনে মৌমাছিদের চাকের পদ্মমধু স্বাদে ও গন্ধে সেরা। এটি খলসি ফুলের মধু। বাদাবনের প্রায় ফুল থেকে আহরিত মধু সাদা রঙের হলেও ঢালচাকার মধু লালচে ও গেওয়ার মধু কিছুটা সোনালি আভার। গরান ফুল থেকেই পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি মধু, লাল রঙের এই মধুর স্বাদ ঝাঁজালো মিষ্টি। কেওড়ার মধু হালকা টক, গেওয়ার মধু একটা কষা তিতকি স্বাদের। বাইন ও গেওয়ার মধু তিতা স্বাদের। রং হলদে এবং ঝাঁজ বেশি।

৯. গুটলিবৈচিত্র্য

গুটলি হলো পরাগরেণুর দলা। ফুল থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করে মৌমাছিরা গুটলি করে চাকে জমিয়ে রাখে। গুটলি দিয়ে তারা চাকের মুখ বন্ধ করে। এসব গুটলির ওপর নির্ভর করে চাকের স্থায়িত্ব। কোনো গুটলি বেশি আঠালো, কোনোটা ঝুরঝুরে। বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটা থেকে গুটলিই মধুকে সুরক্ষা করে চাকের ভেতর। একেক ফুল থেকে সংগ্রহ করা গুটলিও একেক রকম। গেওয়া ও সুন্দরীগাছ থেকে সংগ্রহ করা পরাগরেণুর গুটলি হলুদ রঙের। কেওড়া ও গরানের গুটলি খয়েরি রঙের। বাইনের গুটলি হলদে-খয়েরি। চাকের গুটলির রং দেখেও বোঝা যায় চাকে কোন গাছ থেকে বেশি মধু সংগ্রহ করা হয়েছে। হেন্তালগাছ থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে না, শুধু পরাগরেণু সংগ্রহ করে। তাই অনেক চাকে হেন্তালের গুটলি দেখা যায়।

১০. মৌমাছিদের আত্মাহুতি

কখনো কখনো মৌমাছিরা দলবেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মাহুতি দেয়। বাংলা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বেশি দেখা যায়। দেখা যায় ঝাঁক বেঁধে একদল মৌমাছি উড়ে উড়ে নদীর মাঝবরাবর এসে তারপর পানিতে পড়ে যায়। তারপর পানিতে তাদের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। তবে হেন্তাল ও হুদোগাছের ঝোপে যেসব চাক থাকে চৈত্র মাসের গরমে সেসব চাকের মধু অনেক গরম হয়ে যায়। মধুর গরমে থাকতে না পেরে চাক থেকে মৌমাছিরা তখন বাইরে বেরিয়ে আসে।

১১. বাঘের সঙ্গম

বাদাবনে বাঘের সঙ্গম সচরাচর দেখা যায় না। আশ্বিন-কার্তিক মাসের শেষে সাতক্ষীরা রেঞ্জে কোনো কোনো বনজীবী পুরুষ তা দেখেছেন। সঙ্গমের সময় মেছি বা মাদি বাঘ (নারী বাঘ) খুব উন্মত্ত থাকে। হলা বা মদনা বাঘ (পুরুষ বাঘ) শব্দ করতে থাকে। হলা বাঘের গায়ে পশম বেশি থাকে, তাই গায়ের ডোরাকাটা কম বোঝা যায়। দূর থেকে দেখতে হলুদ রঙের মনে হয়। মেছি বাঘে ডোরাকাটা বেশি বোঝা যায় এবং দেখতেও সুন্দর। বাঘের লিঙ্গ সোনালি বিড়ির মতো চিকন ও লম্বাটে ধরনের এবং এটি প্রায় এক হাত লম্বাও হয়। সঙ্গমের সময় বাঘের লিঙ্গ বের হয়। সঙ্গমের সময় মদনা বাঘ মাদি বাঘের পেছন পেছন অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এবং লাফিয়ে ওপরে উঠতে চায়। দুজনেই বনের কাদায় আছারিপিছারি খায় এবং কাদায় উভয়ের শরীর লেপ্টে যায়। সঙ্গমের পর বাঘেদের হলুদ-কালো ডোরাকাটা শরীর যেভাবে কাদায় মাখামাখি হয় অন্য কোনো সময় সচরাচর এমন হয় না।

১২. বাঘের স্বভাব

কাদামাটিতে বাঘের পায়ের কড় বা ছাপ দেখে বোঝা যায় বাঘটির স্বভাব। মেয়ে না ছেলে বাঘ। কড় দেখে বাঘের বয়স ও তার কিছু আচরণ বোঝা যায়। সঙ্গমের পর কড়গুলো স্পষ্ট সব বোঝা যায় না। মাটিতে থেবড়ে আচড়ে যাওয়া কড়, কখনো গভীর হয়ে গর্ত হয়ে যাওয়া কড়। হুলো বাঘের পায়ের কড় মেছি বাঘের চেয়ে বড় হয়। প্রতিটি বাঘের পায়ের ছাপ আলাদা। বাঘের দুধ কুকুরের দুধের মতো। বাঘের জিব খুব ধারালো, চিরুনির মতো। বাঘের বাচ্চা হওয়ার পর মাদি বাঘ বাচ্চা পাহারা দেয়, মর্দা বাঘ অনেক সময় বাচ্চা খেয়ে ফেলে। বাঘ মৌপোকাকে ভয় করে। কারণ রেগে গেলে মৌপোকারা বাঘকে আল ফুটিয়ে দেয়। বাঘ তখন হেন্তালগাছের গোড়ায় শরীর ডলাডলি করে।

১৩. মানুষ খেতে পারে এমন কোনো পাতা নেই

কখনো কেউ কেওড়ার কচি পাতা চিবিয়ে দেখে। কিন্তু বাদাবনে কোনো গাছের পাতাই মানুষের খাওয়ার জন্য নেই। তবে বনের ভেতরের দিকে উঁচু জায়গায় কোথাও কোথাও বনপুঁই ও কলমি নামে গাছ আছে। যার পাতা ও ডগা বাদায় থাকাকালীন বনজীবীরা রান্না করে খান। সাগরের কাছাকাছি চরে অনেক সময় জেইত্তপালং বা জেইদ্দপালং নামের একপ্রকার গাছ দেখা যায়, যার পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। তবে খুবই বিরল এসব গাছ মূল ছোট গাছ এবং বনে খুব একটা পাওয়া যায় না। বড় গাছের ভেতর কোনো গাছের পাতাই খাওয়া হয় না।

১৪. মাছেদের ডিম-পঞ্জিকা

বাদাবনের নদীতে একেক মাছের আবাসস্থল একেক জায়গায়। নদীর ওপরের দিকে থাকে টেংরা মাছ। পায়রা, রুছো, কাইন ও ভেটকি মাছ থাকে মাঝবরাবর। নিচের দিকে গভীর পানিতে থাকে মেদ মাছ। দাঁতিনা, পার্শে ও চিংড়ি মাছ থাকে চরের কাছাকাছি। সব মাছের প্রজননকাল এক সময় নয়। প্রজনন ঋতুতে বনজীবী বিশেষত জেলে ও বাগদি আদিবাসী মাছ ধরেন না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা রাতেও মাছ ধরা হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে ডিম ছাড়ে টেংরা ও কাইন মাছ। আষাঢ় মাসে ডিম ছাড়ে দাঁতিনা, শ্রাবণ মাসে পায়রা মাছ। মেদ ও আইড় মাছও শ্রাবণ মাসে ডিম ছাড়ে। পৌষ মাসে ডিম ছাড়ে পার্শে মাছ। মাছ যখন ডিম ছাড়ে তখন পোনা মাছেদের নিরাপদে বড় হওয়ার জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করা হয়। ভাদ্র মাসে সাধারণ মাছেরা ডিম ছাড়ে না।

১৫. গোলবনে মাছের ঝাঁক

বাদাবনে নদীর তীর ধরে ধানি ঘাস, হেন্তাল, হরগোজা ও গোলপাতা জন্মে। গোল বনে মাছেদের ঝাঁক বেশি দেখা যায়। বিশেষত পায়রা, পার্শে, ভাঙ্গান, গলদা ও ছাটি চিংড়ি মাছ। গোলের ডাঁটায় যে শেওলা জন্মায় তা এসব মাছের খুব প্রিয়। বিশেষত বিকেলের দিকে এবং ভোরবেলা এসব মাছ ঝাঁক বেঁধে গোলবনের ভেতর থাকে। তাই অনেক জেলেকে ওই সময় গোলবনের ধারে ঝিম মেরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

১৬. বাদাবনের নৌকা

সুন্দরবনে একেক নদী এবং একেক অংশে একেক কাজের জন্য নৌকার গড়ন একেক রকম। বাদাবনের প্রতিটি নৌকায় দুটি পবিত্র অঞ্চল থাকে। একটি হলো নৌকার সামনের দিক এবং আরেকটি হলো নৌকার মাঝামাঝি অংশ, যাকে নৌকার নাভি হিসেবে কল্পনা করা হয়। এই অংশ দুটিতে পা দিয়ে মাড়ানো হয় না। ভারতীয় সুন্দরবন অংশের দারুশিল্পীরা যখন দেশি নৌকার শিরদাঁড়া (মাঝখানের মেরুদণ্ডস্বরূপ) তৈরি করেন তখন তুলসী, সোনা, রুপা, তামা দিয়ে বিশ্বকর্মার পূজা করেন[৩৫]। ভারতীয় সুন্দরবন অংশে ঘুঘু, বেতনাই, ছিপ, পানসি, বালায়, ভাউলে, কিস্তি, ভড়, বজরা নৌকা দেখা যায়[৩৬]। বাংলাদেশের সুন্দরবন অংশে গল্লাবাড়ি, বেতনা, মধুকাটার নৌকা, ডিঙে, মাছ ধরার নৌকা, খেওয়া ও বাইচের নৌকা দেখা যায়। সুন্দরবনের জেলেরা নৌকাকে মায়ের গর্ভ হিসেবে দেখে এবং নৌকার নাভি অংশকে 'যোনি' অঙ্গ হিসেবে দেখে। বনেবাদায় তাই যখন নৌকায় কেউ অবস্থান করে তখন সে নিরাপদ থাকে। কারণ মায়ের গর্ভ

থেকে কখনোই কারও ক্ষতি কেউ করে না বা করতেও পারে না। ঘুমানোর সময় উপুড় হয়ে নৌকায় ঘুমাতে নেই, যেহেতু মায়ের গর্ভ ও স্ত্রী অঙ্গ হিসেবে কল্পনা করা হয় তাই। নৌকায় থাকাকালে সাধারণত চিত হয়ে ঘুমানোর নিয়ম। চিত হয়ে ঘুমালে খাল ও জঙ্গলের নানা কিছু দেখাও যায় সহজে।

১৭. বনের বিস্তার

বাদাবনে মানুষ গাছ লাগায় না। এখানে জোয়ার-ভাটাই গাছ থেকে ঝরে পড়া ফল ও বীজ কাদা মাটিতে পুঁতে দেয়। সেখান থেকেই চারাগাছ জন্মে। জোয়ারের জলে ভেসে আসা বীজ ও ফল বনের ধারে চরের কাদামাটিতে আটকে যায়। কাদামাটিতে প্রথম জন্মায় ধানচি ঘাস। এসব ঘাস না থাকলে বীজ আটকাতে পারে না। যেসব ফল জোয়ারের স্রোতে বনের ভেতরে গিয়ে হুলোতে আটকায় সেসব গাছের চারা সেখানেই জন্মে। এভাবে দেখা যায় জোয়ারের টান এবং ফলের আকার ও ওজন বনের একেক স্তরে একেক গাছের বীজ নিয়ে যায়। আর তাই বাদাবনে একেক স্তরে একেক গাছের জন্ম হয়। আবার বনের ভেতর কোনো কোনো গাছের চারা ফল থেকেই গজিয়ে নিচে কাদামাটিতে আটকে যায়। এভাবেই বাদাবনের বিস্তার ঘটে। বাদাবনে অধিকাংশ গাছেরই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফুল হয় এবং আষাঢ় মাসে বীজ ঝরে পড়ে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বনতলজুড়ে নতুন চারা দেখা যায়।

১৮. ঢোঁড়

গাছের খোঁড়ল বা গর্তকে ঢোঁড় বলে। বাদাবনে সব গাছে ঢোঁড় হয় না। গেওয়া, পশুর, বাইন, কেওড়া, ধুতল গাছে ঢোঁড় বেশি হয়। আর এসব ঢোঁড় বন্য প্রাণের আবাসস্থল। মৌমাছি চাক বানায় এসব ঢোঁড়ে। পশুর, বাইন ও কেওড়ার ঢোঁড়ে মধুর চাক বেশি পাওয়া যায়। বাইন ও কেওড়ার ঢোঁড়ে বনমুরগি বেশি থাকে। ধুতল ও পশুরের ঢোঁড়ে সাপ থাকে। বাইনগাছের ঢোঁড়ে তাইরকেল (গুইসাপ) বেশি থাকে। ঢোঁড়ের মধু খেয়ে বোঝা যাবে না কোন ফুলের মধু। ঢোঁড়ের মোমের রং কালচে।

১৯. গোণ ও ভাটিকা

বাদাবনের সবকিছুই চন্দ্রনির্ভর। বনজীবীদের জীবন গোণ ও ভাটিকার গণিত মেনে চলে। প্রতি ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হয়। প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির তিন দিন আগ থেকে তিন দিন পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ হচ্ছে গোণমুখ। গোণমুখে বনজীবীরা বাদায় থাকে। এ সময় জোয়ারের প্রাবল্য বেড়ে যায়। প্রতি মাসে দুটি গোণমুখ আসে। প্রতি দশমী তিথিতে একটি নতুন গোণের জন্ম হয়।

চতুর্দশী পর্যন্ত গোণ থাকে। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হবে। গোণমুখের পর সাত দিন ভাটিকা পড়ে। ভাটিকার সময় বনজীবীদের গ্রামে থাকার নিয়ম। একটি গোণমুখ ও একটি ভাটিকা হয় পূর্ণিমা তিথিতে, পরের গোণমুখ ও ভাটিকা মিল অমাবস্যা। ভাদ্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে আশ্বিনের শুরুতে হয় বছরের সবচেয়ে বড় গোণমুখ। একে বলে কলাকাটা গোণ। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে যে গোণ হয় তাকে বলে পান্তাভাসান গোণ। গোণেই বছরের সবচেয়ে বড় জোয়ার ওঠে। গোণ ও ভাটিকা বাদাবনের জীবনে এমনই জড়িয়ে আছে গোণমুখের সময় মহাজন থেকে বনজীবীরা যে টাকা ধারকর্জ করে তাকে বলে গোণমুখী দাদন বা গোণদাদন। গোণমুখের সময় চিংড়ি ও কাঁকড়া বেশি পাওয়া যায় এবং ভাটিকার সময় সাদা মাছ বেশি পাওয়া যায়। কোকো নামে এক পাখি আছে, যা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফুটায়। কোকো পাখি কু-কু-কু-কু করে ডাকে। কোকো পাখি ডাকলে বোঝা যায় ভাটিকা লাগার সময় হয়েছে।

২০. রাতে গাছ ঘুমায়

দিনের বেলা গাছ সজাগ থাকে এবং রাতের বেলা গাছ ঘুমায়। রাতের বেলা গাছের শরীরে হাত দিয়ে তাকে জাগাতে নেই। এতে গাছ বিরক্ত হয়। রাতের বেলা গাছের পাতা ও ফল ছিঁড়তে নেই। এতে গাছ খুব কষ্ট পায়। রাতের বেলা গাছের গায়ের চাক থেকে মধুও সংগ্রহ করতে নেই। মূলত দিনের বেলায়ই সব কাজ করতে হয়। রাতের বেলা বাদা ঘুমিয়ে পড়ে। বনজীবীরা তাই সন্ধ্যার আগেই বন থেকে নৌকায় চলে আসেন। রাতের বেলা বাদায় বনবিবি, দক্ষিণরায় এরা ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণরায়ই বাঘের রূপ ধরে অনেক সময় মানুষকে আক্রমণ করে।

২১. একেক গাছের একেক অংশ

বাদাবনের সব গাছই বনজীবীরা ব্যবহার করেন না। সব গাছের সব অংশও ব্যবহৃত হয় না। গোলগাছের পাতা ঘর ছাওয়ার কাজে লাগে। হেন্তাল পাতা দিয়ে মধু সংগ্রহের সময় ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিকে চাক থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারু বানানো হয়। কেওড়া ও গেওয়াগাছের পাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেওড়া, হেন্তাল, ধুতল, বাবলে, জানা, ছইলা, গোল ও হরিণআড়ুগাছের ফল কাঁচা অবস্থায় খায় মানুষ। সুন্দরী, গেওয়া ফলের বীজের শাঁস হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো হয়। পশুর, বাইন, গরানগাছের ডাল দিয়ে ঘরের বেড়া হয়। সুন্দরী ও পশুরের কাঠে আসবাবপত্র হয়। মধু চাক কাটার দায়ের বাঁট/আছাড় বানানো হয় খলসি ও গেওয়া কাঠ দিয়ে। গরান ও কেওড়ার ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গরানের ছাল দিয়ে লাল রং বানানো যায় এবং কাপড় রাঙানো যায়। সুন্দরীগাছের ছাল

বেটে মাথাব্যথায় লাগানো হয়। গেওয়া ও সেজিগাছের আঠা দিয়ে মাছ ধরা যায়। হরগোজা ও কেওড়ার চারা জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগে। পশুরগাছের শুলো দিয়ে নারীরা চামচ, হাতা এসব নানা গৃহস্থালি জিনিস বানায় এবং বাচ্চারা খেলনা গুটি বানায়।

২২. শুলো দিয়ে দম নেয় গাছ

বাদাবনের গাছেরা শুলো বা হুলো দিয়ে দম নেয়। বাদাবনে সবচেয়ে লম্বা শুলো হয় সুন্দরীগাছের। আদিবাসী মুন্ডা নারীর কোমর সমান উচ্চতার। মাথা ভোঁতা। সুন্দরীর পর কেওড়ার শুলো বড় হয়। তবে অনেক সময় বাঁক নিয়ে নিয়ে কেওড়ার শুলো মাটিকে গুচ্ছাকারে ছড়িয়ে যায়। পশুরের শুলো বেশ চওড়া ও মোটা এবং প্রায় অর্ধেক চাঁদের মতো দেখতে। বাইনের শুলো খুব ছোট ও কালো রঙের ও চিকন। এসব শুলো বাদায় হাঁটার সময় পায়ে খুব লাগে। বাইনগাছের লম্বা ও মোটা শিকড় হয়। এই শিকড় ঠেস দিয়ে মাটিতে বিস্তার লাভ করে।

২৩. বনের খাবার

বনবাসী বনের নানা গাছপালা ও বন্য প্রাণের ওপর একে অপরে নির্ভর করে। বানর কেওড়ার ফল, ধানচিগাছের শিকড়, কেওড়ার ছোট শুলো, হেন্তালগাছের মাথি খায়। কেওড়া, পশুর ও গেওয়ার পাতা হরিণের প্রিয়। হরিণ কেওড়া, হেন্তাল ও আমুগাছের ফলও খায়। খলিসা ও বাইনের পাতাও খায় হরিণ। সুন্দরীগাছে জন্মানো চিলি নামে পরগাছার পাতাও হরিণ খায়।

২৪. বোঝাই পোকা ও খালিন পোকা

গাছ থেকে মধু খেয়ে এবং সংগ্রহ করে যেসব মৌমাছি চাকের দিকে ফিরে আসে তাদের বোঝাই পোকা বলে। এসব পোকা চাকবরাবর উড়ে আসে, অন্য কোনো দিকে তারা যায় না। তাদের শরীর ভার থাকে। শরীরে একটা ভাব থাকে। চাকা থেকে মধু সংগ্রহ করতে বের হওয়া মৌমাছিদের খালিন পোকা বলে। তারা মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে চাকের নানা দিকে ঘোরাফেরা করে অন্যদের দেখায় কোথায় ভালো মধুর উৎস আছে। মৌপুদের এই নাচ খুব সুন্দর লাগে দেখতে। তারা সোজা যায় না, তাদের শরীর হালকা থাকে। বোঝাই পোকা দেখে তাদের পেছন পেছন এলে মধুর চাক পাওয়া যায়।

২৫. মৌপোকাদের নাচ

বনে গাছে গাছে ফুল ফুটলে বনজুড়ে মৌমাছিরা নাচে। প্রতিটি মৌচাকে নানা

জাতের মৌপোকা থাকে। প্রতিটি চাকের প্রধান পোকাটি থাকে অনেক বড়, এর কাজ শুধু বাচ্চা জন্ম দেওয়া। এই পোকাকে মাইয়ে পোকা বা আলসি পোকা বলে। এই পোকা কখনোই মধু আনতে যায় না। মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার সময় খুব সাবধানে প্রথমেই চাকের ভেতর এই আলসি পোকা ও চাকের বাচ্চা পোকাদের বাঁচাতে হয়। মৌয়াল পরিবারে ছোট থেকেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকের যে অংশে পোকারা থাকে সেই অংশটি খুব যত্ন করে সুরক্ষা করা হয়। কারু জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে চাকের মধু জমানো অংশের বড় মৌমাছিদের তাড়ানো হয়। আলসি পোকাকে পবিত্র প্রাণ হিসেবে দেখা হয়। আলসি পোকা ও বাচ্চা পোকাদের মারলে পাপ হয় এবং মা বনবিবি রুষ্ট হন। এসব পোকা না বাঁচলে নতুন চাক হবে না, চাক না হলে মধু হবে না। মৌপোকারা বন ঘুরে ঘুরে মধুর সন্ধান করে। কোথায় কেমন জাতের মধু আছে তার নমুনা নিয়ে আসে। তারপর চাকের কাছে এসে নেচে নেচে মধুর উৎসস্থল কোথায় আছে তা দেখায়। মৌপোকার নাচন দেখে বনের কোন অংশে কেমন ফুল ফুটেছে তা বোঝা যায়।

২৬. মধুর চাক না কাটলে কী হবে

শ্রীপঞ্চমীর দিনে মৌপোকারা উড়ে আসে বাদাবনে। বন ঘুরে ঘুরে চাক বানানোর গাছ পছন্দ করে। এ সময় তারা আড়াইঘর চাক তৈরি করে প্রথম। প্রতিবছর নিয়ম করে মৌয়ালরা মধুচাক না কাটলে পরের বছর মৌচাক ও মধুর পরিমাণ অনেক কমে যাবে। এক ফোঁটা হলেও মধুচাক কেটে ঝরাতে হবে। মধুর চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয় বলেই মৌমাছিরা আবার মধু সংগ্রহ করে। তা না হলে চাকে জমা মধু খেয়ে খেয়ে তারা অলস ও ভারী পোকা হয়ে যায়। এভাবে তাদের শক্তি কমে যায়। মৌমাছিরা যদি অলসভাবে চাকে বসে থাকে এবং বনের ফুলে ফুলে না যায় তবে গাছের মিলন বন্ধ হয়ে যাবে। মৌমাছির চাকে গুটলি দেখেই বোঝা যায় কেমন মিলন হয়েছে বনের গাছে। ঠিক একইভাবে এক বছর গোলপাতা না কাটলে, গোলের ঝাড় পরিষ্কার করে না দিলে পরের বছর গোলপাতা জন্মাবে কম। গোলের মাইঝ পাতা রেখে নিয়ম করে কাটতে হয়। পাতা না কাটলে এমনিতেই মরে শুকিয়ে পচে গিয়ে তা নতুন পাতার বৃদ্ধি ও বিকাশে বাধা দেয়।

২৭. বাঘ-কুমিরের কামড় শনাক্তকরণ

কীভাবে বোঝা যায় বাঘ না কুমির কামড় দিয়েছে? বাঘের কামড়ে ক্ষতস্থান ২৪ ঘণ্টার ভেতর পচে যায়। আক্রান্তের শরীরে একধরনের বোঁটকা গন্ধ হয়। গাল দিয়ে অনবরত নাল (লালা) ঝরে। আক্রান্ত স্থানটি পচে সাদা ঘা হয়ে যায় এবং সেখান থেকে একধরনের মাছি পোকার জন্ম হয়। আক্রান্ত স্থানে খিলেন দাঁতের

দাগ থাকে। আক্রান্ত স্থানটি একেবারে কুড়াল দিয়ে কেটে নেওয়ার মতো মনে হয়। বাঘের আক্রমণে অধিকাংশ সময়ই বোঝা যায় না, কারণ বাঘকে দেখা যায় না। ঘটনাটি খুবই দ্রুত ও চোখের নিমিষে ঘটে। কিন্তু সচরাচর পানিতেই কুমির ও কামটে কামড়ায়, তাই সেখানে বোঝা যায়। কুমিরের কামড়ে আক্রান্ত স্থানে আট পাটি দাঁতের বড় গর্তওয়ালা দাগ থাকে। কুমির মাংস কামড় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

২৮. বাঘ ও কুমির-বন্দনা

বাদাবনে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। বাঘ ও কুমির মানুষের আরাধনা ও বন্দনার অংশ। বাদাবনের রক্ষাকবচ মা বনবিবির বাহন হলো বাঘ। বনবিবির পূজার সময় মাটি দিয়ে বাঘ বানানো হয়, তার ওপর চেপে বসে বনবিবি। চৈত্র মাসে বাদাবনের ধর্মদেল উৎসবে মাটি দিয়ে কুমির বানানো হয়। কুমির, ধনামনা, সাগরপিড়ি, সূর্যপিড়ি, কামদেব, নীলদেব, মালঞ্চ মাটি দিয়ে বানানো হয়। ধানজমিন বা পুকুরের নরম মাটি দিয়ে কুমির বানানো হয় এবং সারা শরীরে খেজুর ফল গেঁথে দেওয়া হয়। বনবিবি পূজা ও ধর্মদেল উৎসবে বাঘ ও কুমিরের সুস্থ থাকার জন্য প্রার্থনা করা হয়। পাশাপাশি বাঘ ও কুমির যাতে মানুষের কোনো ক্ষতি না করে এ জন্যও আবদার করা হয়। বাদাবনে কুমিরকে সাধারণত গন্ধকালী হিসেবে দেখা হয়। ত্রেতা যুগে গন্ধকালী নাচতে নাচতে একদিন ধনপতি কুবেরের বাড়ি যায়। কিন্তু নাচতে নাচতে তার পা লেগে যায় কুবের মুনির শরীরে। মুনির অভিশাপে গন্ধকালী কুমির হয়ে গন্ধমাদন থেকে বাদাবনে চলে আসে। পাশাপাশি বাদাবনে বাঘকে মনে করা হয় দক্ষিণরায়।

২৯. মানুষশিকারি বাঘ

বাঘ যখন মানুষকে আক্রমণ করে তখন মনে করা হয়, দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে সেটি করেছে। বাঘ অসুস্থ হলে বা দীর্ঘ সময় রোগে ভোগার পর কিংবা আহত হলে এবং বয়স বাড়লে আশপাশে শিকার ধরতে না পেরে মানুষের ওপর আক্রমণ করে। কারণ তুলনামূলকভাবে মানুষকে আক্রমণ করা সহজ। একবার বাঘ মানুষের শরীরের রক্তের স্বাদ পেলে সে আর তা না খেয়ে থাকতে পারে না। মানুষের রক্তে বাঘের বুদ্ধি ও শক্তি বেড়ে যায়। বাঘ তখন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বাদা থেকে নদী সাঁতরে মানুষের গ্রামে চলে আসে। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ধরতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের হাতে বেঘোরে প্রায় হারায়। মানুষশিকারি বাঘ চলার সময় একেবারেই কোনো শব্দ করে না। এমনকি কাদামাটিতে তার পায়ের কড়ও স্পষ্টভাবে পড়ে না। কারণ হাঁটার সময় সে পা পাক দেয়, তাই ছাপ থেবড়ে যায়। বাঘ যখন প্রথম মানুষকে আক্রমণ করে

শিকার করে তখন সেই বাঘের ভেতর একধরনের উত্তেজনা থাকে। বাঘের তখন পেছনের পায়ের দুই উরু অনবরত কাঁপতে থাকে। বাঘ ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত চেটে চেটে খায়। প্রথমবার বাঘ মাংস কামড়ে ছিঁড়ে খায় না। রক্ত খায় আর একটু পরপর পানি খেতে যায়। কয়েক দিন ধরে বাঘটি লাশের কাছে থাকে, যদি লাশটি সরিয়ে না নেওয়া হয়। তারপর সে মাংস কামড়ে খাওয়া শুরু করে। কিন্তু প্রথমবার শিকারের পর বাঘের পা কাঁপা কমতে থাকে। যে বাঘ যত বেশি মানুষ শিকার করে ধীরে ধীরে এই পা কাঁপা বন্ধ হয়ে যায়। বাঘের পায়ের কড় দেখেও বোঝা যায় এটি মানুষশিকারি বাঘ কি না। এমনিতে বাঘের পায়ের কড় থেকে মেছি ও হুলো শনাক্ত করা যায়। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের ক্ষেত্রে মেছি ও হুলো শনাক্ত করা কঠিন। তাদের বাঁ পায়ের কড়ে পাঁচটি আঙুলের ছাপ এবং ডান পায়ের কড়ে চারটি আঙুলের ছাপ দেখা যায়। মানুষশিকারি বাঘ বেশিদিন বাঁচে না। কারণ সে বেশিদূর দৌড়ে যেতে পারে না, খাবার খাওয়ার পর অলস বসে ঝিমায়। মানুষশিকারি বাঘের ঘুম ভালো হয় না। শরীরে একটা ঝিমুনি এসে যায়। মানুষশিকারি বাঘের কোনো কারণে মাথা ও কপালে ঘা হলে সে আর বাঁচে না। কারণ বাঘ নিজের জিব দিয়ে সারাক্ষণ শরীর পরিষ্কার করে ও চাটে। জিব উল্টিয়ে মাথা ও কপাল চাটা সম্ভব হয় না বলে এই ঘা ভালো হয় না এবং শরীরে ছড়িয়ে যায়।

৩০. বাঘ মানুষের যে অংশ প্রথম খায়

প্রাণিকুলের ভেতর বাঘ হচ্ছে হিংসা জাত। কারণ বাচ্চা হওয়ার পর অনেক সময় নিজের বাচ্চাদেরও খেয়ে ফেলে হুলো বাঘ। তবে মেছি বাঘ বাচ্চাদের সামলে রাখার জন্য যুদ্ধ করে। মানুষশিকারি বাঘ মানুষকে আক্রমণ করলে প্রথমে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত খায়। তবে এরপর শরীরের মাংস খাওয়া শুরু করে। বাঘে ধরলে প্রথমেই পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে স্তন খায় বাঘ। পুরুষাঙ্গ ও স্তন দিয়েই বাঘ খাওয়া শুরু করে। সাধারণত বাঘ মানুষের মাথা খায় না। কোমরের নিচের অংশ থেকে পা পর্যন্ত, পেট এবং ঘাড়ের অংশ এসবও খায় বাঘ। বাঘ সাধারণত মানুষের ভেতর পুরুষদেরই বেশি আক্রমণ করে। বাঘ নারীদের মাংস খায় না। যদিও বাঘের আক্রমণে কিছু নারীর মৃত্যু হয়েছে, তবে বাঘ তাদের শরীর খায়নি। বাঘ নারীদের খায় না, কারণ নারীরা সব সময় হক খায়, পাপ করে না। তারা এমনি এমনি কোনো জিনিস জোরজবরদস্তি করে তুলে নেয় না, চুরি করে না। এসব কারণে বাঘ নারীদের খায় না। মানুষের ঘাড়ে শরীরের সব শিরা এসে জোড়া লাগে। বাঘ যখন পেছন থেকে কোনো মানুষকে আক্রমণ করে তখন ঘাড়ে কামড় বসায় এবং ঘাড় মটকে দেয়। মানুষ তখন

বিড়ালের মতো ছটফট করে অজ্ঞান হয়ে যায়। বাঘের নখ ও দাঁত অনেক বড়, তা মানুষের ঘাড়ে ঢুকিয়ে দেয়।

৩১. জঙ্গলে জোংড়া পোড়ানো যায় না

বাদাবন থেকে জোংড়া নামের এক ঝিনুক জাতীয় প্রাণী সংগ্রহ করা যেত। মূলত চুন বানানোর জন্য চুনারি ও জোংড়াখুটারা এসব সংগ্রহ করত। জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা জোংড়া নদীর চরে, গোলফলের ডাঁটা এবং বড় গাছের কাণ্ডে লেগে থাকত। জোংড়া সংগ্রহকারীরা শীতের সময় বেশি জোংড়া পায়। ভাটার সময় জোংড়া সংগ্রহ করা হতো। জোংড়া খুঁটতে গিয়ে অনেকে বাঘের কামড়ে মরেছে। বাড়িতে এনে চুন বানানোর জন্য জোংড়া ধুয়ে তারপর শুকিয়ে পোড়ানো হয়। পোড়ানো ছাই থেকে চুন তৈরি হয়। জঙ্গলে কোনোভাবেই জোংড়া পোড়ানো হয় না, কারণ সেখানে সেটি পোড়ে না। কাঁচা জোংড়া পোড়ালে সাঁ সাঁ শব্দ হয়। বাড়ি ফিরেই জোংড়া পোড়ানো হয়।

৩২. মানুষ বাদায় পড়ে

বাদাবনে বাঘের আক্রমণে মানুষ মারা গেলে কখনোই বলা হয় না বাঘে মেরেছে বা বাঘে খেয়েছে। বলা হয় মানুষটি বাদায় পড়েছে। সাধারণত বাওয়ালি ও জেলেদের চেয়ে মৌয়ালরাই বেশি বাদায় পড়ে। মৌয়ালরা মধুর চাক খোঁজার জন্য গাছের ওপরের দিকে তাকিয়ে হাঁটে, তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে থাকে বলে বাঘ পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে। তবে বনজীবী নারীরা নদীতে যখন মাছের পোনা ধরে তখনো তাদের পেছন লাগোয়া বন থাকে, কিন্তু বাঘ খুব কমই এমন নারীদের আক্রমণ করে। বনে বাঘের উপস্থিতিকে বলা হয় 'বাদা গরম', মানে জঙ্গলে ধারেকাছে বাঘের উপস্থিতি আছে। কখনোই বলা হয় না জঙ্গলে বাঘ আছে।

৩৩. বাঘের রূপ

বনজীবীরা বিশ্বাস করে বাঘ মানুষ খায় না, বাঘের রূপ ধরে দক্ষিণরায় বা অতৃপ্ত আত্মা মানুষকে ধরে। বনসংলগ্ন জেলে, বাগদি ও বনজীবীরা মৃত্যুর পর জঙ্গলের চরেই লাশ সমাধি দেন। এ ক্ষেত্রে বাঘ-কুমিরের কামড়ে নিহত ব্যক্তিদের লাশও জঙ্গলের চরেই রাখা হয়। এসব মানুষের আত্মা বাঘের রূপ ধরে জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। মলয় দাস (২০১১) জানান, ভারতীয় সুন্দরবনে যাদের বাঘের হাতে মৃত্যু হয় তাদের আত্মা 'বেঘোমুড়ি' হয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তারা 'কুই' আওয়াজ দিয়ে মানুষকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায় এবং অনেক সময় বাঘের রূপ ধরে আসে[৩৭]। বাদাবনে বাঘ এতখানিই অপরিহার্য যে বাস্তবেও বাঘ, রূপকল্পনায়ও বাঘ।

৩৪. জঙ্গলেই মঙ্গল

জঙ্গলই জীবনের পাঠশালা, জঙ্গলই জীবনের চিকিৎসাঘর। সব বালামুসিবত সামলানোর হদিস জঙ্গলে আছে। বাঘে আঁচড় দিলে বা কামটে কামড়ালে হেন্তাল পাতার রস লাগাতে হয়, গরানের শিকড় কাটাছেঁড়াতে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ করে, আমাশয়ে খলসির ছাল বেটে রস বা জ্বর হলে পশুর পাতার রস গরম করে খেতে হয়। জঙ্গলে হাত-পা কাটলে গরান ফুলের পরাগরেণু কাটা ক্ষতে লাগানো হয়। জঙ্গলে পানির পিপাসা লাগলে চিলেগাছের ডাঁটা ছুলে চিবিয়ে খেলে পিপাসা মেটে। মুন্ডা আদিবাসীরা বাদাবনের সিন্দ্রি বা সুন্দরীগাছের পাতা সারহুল পূজায় ব্যবহার করে। গনগনে মাছ খেলে প্রসূতি মায়ের বুকে দুধ বাড়ে। মেন মাছ পুরুষের শরীরের বল বাড়ায়। বাদায় প্রবেশের আগে বনজীবীরা শরীরে পশুর পাতার রস মেখে নেন। এই রস গায়ে মাখলে বারী পোকা কামড়ায় না। গরানগাছের তলায় গরান ফুলের রেণু নিচে পড়ে হলুদ হয়ে থাকে। বনের ভেতর মধুর চাক, গোলপাতা বা গরানের ছিটে কাটতে গেলে অনেক সময় শরীরে দায়ের কোপ লাগে। গরানের ওই হলুদ রেণু কাটা ক্ষতে দিলে ক্ষত সেরে যায়। জঙ্গলে পানির পিপাসা লাগলে চিলেগাছের ডাঁটা ছিলে চিবিয়ে খেলে তৃষ্ণা দূর হয়। চিলেগাছ একটু ভেতরের দিকে গভীর বনে এবং বড় গাছের আশপাশে হয়। পাতা দেখতে তেঁতুল পাতার মতো। বনের যেসব খালের ধারে কেওড়াগাছ বেশি সেসব খালের গর্তে সেজিগাছের কষ ঢেলে দিলে কাইন মাছ কিছুটা সময়ের জন্য বেহুঁশ হয়ে ঘোলা পানিতে কিছু দেখতে না পেয়ে পানির ওপরে চলে আসে। এভাবে অনেকেই কাইন মাছ ধরেন।

৩৫. ফুলপটি মধু

বাদাবন থেকে সংগৃহীত বছরের প্রথম মধু হয় সাধারণত খলসে বা খলিসা ফুলের। বছরের প্রথম চাক কাটা মধুকে ফুলপটি মধু বলে। এই মধু পূজা কৃত্য ওষুধ উৎসবের জন্য আলাদা করে রাখা হয়। নৌকা পূজার সময় এই ফুলপটি মধু দিয়ে নতুন নৌকাকে স্নান করানো হয়। ফুলপটি মধুমাখা নৌকার ভেতর বিপদ মোকাবিলার শক্তি জন্মায়। আর এই নৌকা দিয়েই তো বাদাবনে ঘুরে বেড়াতে হয়।

৩৬. ঝরা পাতায় মেথানি, নয়া পাতায় মধু

বাদাবনে গাছের পাতা থেকে মাছ, মাছ থেকে মাটি, মাটি থেকে মানুষ জন্ম নেয়। পুরো বাদাবন যেন পাতার খেলা। ঝরা পাতা, নয়া পাতা, মরা পাতা। রংবেরঙের নানা পাতা। বাদাবনের পাতা দেখেই বলে দেওয়া যায় বনের শরীর কেমন আছে।

কি গাছে থাকা পাতা, কি ঝরা পাতা। পাতার বর্ণ ও গন্ধ জানান দেয় বাদাবনের সুস্বাস্থ্য। জোয়ার-ভাটায় ঝরা পাতারা এক খাল থেকে আরেক খালে, এক চর থেকে আরেক চরে জমা হয়। কাদামাটিতে নানা বয়সী নানা জাতের পাতা জমে জমে স্তূপ তৈরি হয়। কাদাজলে জমে জমে এই স্তূপ রং বদলায়। একসময় ঝুরঝুরে নরম কালচে স্তরীভূত মণ্ড হয়ে ওঠে। ঝরা পাতার এই অবস্থাকে 'মেথানি' বলে। এই মেথানিতেই চিংড়ি মাছের জন্ম হয়। মেথানি হলো বাদাবনের চিংড়ির আঁতুড়ঘর। তারপর জোয়ার-ভাটার স্রোতে মেথানি থেকে চিংড়ি পোনা খালে খালে জঙ্গলে জঙ্গলে নদীময় ছড়িয়ে পড়ে। এই পোনা ধরেই টিকে আছে বাণিজ্যিক চিংড়িঘের। বাদাবনে মেথানি না জন্মালে চিংড়ির জন্ম হবে না। চাপড়াজাতীয় (চাকা) চিংড়ি বেশি দেখা যায় মেথানিতে। সাধারণত সুন্দরী, খলিসা, বাইন, পশুর, কাঁকড়া, গেওয়া ও জানাগাছের ঝরা পাতা বেশি জমেই মেথানি তৈরি হয়। ঝরা পাতা থেকে যেমন মেথানি, ঠিক তেমনি জঙ্গলে নতুন পাতা দেখা দিলেই মধু মৌসুমের সূচনা হয়। নয়া পাতা মানেই মৌমাছিদের আগমন এবং নতুন মধুর বার্তা। বাদাবনের এই ঝরা পাতা ও নয়া পাতা দেখেই বনজীবীরা মাছ ও মধুর ভবিষ্যৎ হিসাব করেন।

৩৭. শঙ্খ লাগা

বাদাবনে প্রাণিকুলের সঙ্গমকে বলা হয় 'শঙ্খ লাগা'। যখন এ সঙ্গম মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীতে প্রাণীতে ঘটে। এ এক মধুর মিলন। ভরপুর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার সময় কাইন মাছ ও টেপা মাছের সঙ্গে সঙ্গম হয়। সাপ ও মাছের এ শঙ্খ লাগা দীর্ঘ সময় ধরে চলে। তখন কেউ এ সময় তাদের অবিচার করে না, বিরক্ত করে না। বাদাবনের কাইন ও টেপা মাছ নাভি ফেলে রান্না করা হয়। কারণ সাপের সঙ্গে এসব মাছের শঙ্খ (সঙ্গম) লাগে। এসব মাছের বিষ থাকে নাভিতে। বাদাবনের নারীরা জানেন কীভাবে এই বিষ-নাভি সরিয়ে ফেলতে হয়। তুলনামূলকভাবে শীতকালে বিষ-নাভিতে বেশি বিষ জমে।

৩৮. বাদাবনের মন্ত্র

বাদাবন থেকে যেকোনো কিছু আহরণ ও সংগ্রহ করতে হলে বনের দারে অনুমতি নিতে হয়। মা বনবিবির কাছে এই অনুমতি নিতে হয়। সাধারণত গুনিন বাওয়ালিরা বনে প্রবেশের অনুমতি নেন। তাঁরা নানা ধরনের মন্ত্র দিয়ে এই কাজটি করেন। বনবিবি, গাজী কালু, চম্পাবতী, আলীবদর, খোয়াজখিজির, দুখে, শাহ জঙ্গলি, দক্ষিণরায়, রায়মণি, বড় খাঁ এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাতে বাদায় কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে। বনবিবির কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাতে এক

যাত্রায় জুটে যায় বছরের খোরাক। গুনিন বাওয়ালিরা খিলান মন্ত্র, ছুকে মন্ত্র, চালান মন্ত্র দিয়ে বনের সুন্দরীগাছের গায়ে 'মাল' করেন। এটি বনের কাছে বনজ দ্রব্য সংগ্রহের অনুমতি প্রার্থনার প্রথম কৃত্য। বাদা রক্ষাকারী বনবিবি এই 'মাল' কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, মালের সীমানায় যেন কোনো আপদ-বিপদ না ঘটে।

৩৯. সবারই কর্মভাগ আছে

কর্মগুণে কেউ মাছ, কেউ বাঘ, কেউ গাছ আর কেউ মানুষ। বাদাবনে সবারই কর্মভাগ আছে। একটি মৌচাকে একেক মৌপোকার একেক রকম কাজ। তেমনি একটি মৌয়াল দলের প্রত্যেকে নিজেদের ভেতর আলাপ-আলোচনা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে নিজেদের দলগত কর্মবিভাজনগুলো তৈরি করেন। দলের সবাই মিলে দলের দলপ্রধান নির্বাচন করেন। মৌয়াল দলের দলপ্রধানকে সাজুনী বা মাঝি বলা হয়। সাত থেকে দশজনের একটি দল তৈরি হয়। কিন্তু গোল-গরান আহরণের ক্ষেত্রে আটজনের দল থাকে। গোলপাতা কাটতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাওয়ালি দলের প্রধানকে মাঝি বলে। আটজনের ভেতর চারজন গোলের পাতা পছন্দ করে, সেই পাতা নিয়মমতো কেটে নেয়, এরা কাটা বাউলি। বাকি চারজনের কাজ হচ্ছে সেসব পাতা ফেঁড়ে নৌকা বোঝাই করা, এরা ফাঁড়া বাউলি। এ ছাড়া এ দলে একজন বাবুর্চিও থাকেন, যিনি রান্না সামলান ও নৌকা তদারক করেন।

মৌয়াল দলে সাজুনী ছাড়া কাটনি বাউলি থাকেন দুজন। কাটনি বাউলিদের মূল কাজ হচ্ছে মধুর চাক কাটা। একটি দলে দুজন আড়ি বাউলি থাকেন, যারা মধু কাটার সময় চাকের নিচে বাঁশ-বেতের তৈরি আড়ি ধরে রাখেন। তারাই মধু ও মধুর চাক বন থেকে বহন করে নৌকায় এনে বোঝাই করেন। একটি দলে একজন বাবুর্চি বা ভার বাওয়া লোক থাকে। তার কাজ হলো নৌকায় বসে সবার জন্য রান্নাবান্না করা। খাল থেকে তীরের কাছাকাছি এলাকার জ্বালানি সংগ্রহ করা। যখন সবাই মধু ও মোম খুঁজতে বনের ভেতর চলে যায়, তখন এই বাবুর্চি রান্নাবান্না করে নৌকা বেয়ে নৌকা দলের কাছাকাছি নিয়ে যান। দলে একমাত্র বাবুর্চিই শিঙ্গা বাজান। এই শিঙ্গা দলের অবস্থান জানার জন্য, আবার কখনো কখনো বেশি মধু-মোমপ্রাপ্তির আনন্দ প্রকাশের জন্য। একটি মৌয়াল দলের সবাইকে নৌকা বাইতে হয়। দলের সাজুনীর কাজ হচ্ছে বন বিভাগ থেকে বনে প্রবেশ ও আহরণের আইনি অনুমতি সংগ্রহ করা। দলের নেতৃত্বও পরিচালনা করা। কখনো কখনো সাজুনী মধু কাটেন এবং বনের ভেতর বা নৌকায় এনে মৌচাক চাপেন। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে মৌয়াল দলের প্রধানকে দোহাসি

বলে। এ ছাড়া দলে গাছি (যে গাছে ওঠে), গাঙ নেয়ে (নৌকায় থেকে যিনি রান্নার দায়িত্বে থাকেন), বগরদার (গুনিন), আড়িদার (মধুপাত্র বহনকারী) ও ছাটার লোক থাকে[৩৮]।

৪০. মালযাত্রার নিয়ম

বাদাবনে বনজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে মালযাত্রায় যাওয়ার আগে পরিবার-পরিজনের বাজার সদাই, খরচাপাতি সব দিয়ে যান। কারণ একবার মালযাত্রা থেকে গ্রামে ফিরতে ফিরতে এক সপ্তাহ থেকে পনেরো দিন লেগে যায়। এই দীর্ঘ সময় পরিবারের নারীরাই ঘরসংসারের যাবতীয় দিক সামলান। মালযাত্রার আগে বনজীবী সনাতন হিন্দু পরিবারের মালযাত্রীরা বেশ কিছু নিয়ম পালন করেন। মালযাত্রীরা তেল-মসলা জাতীয় খাবার বা নেশাজাতীয় খাবার গ্রহণ করেন না। শরীর অসুস্থ হয় বা শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমন কাজ করা থেকে মালযাত্রার আগে কিছুটা বিরত থাকা হয়। শুক্রবার বাদাবনে বনবিবির দিন। এ দিনে মা বনবিবি বাদায় বের হন। তাই শুক্রবারে বাদায় নামে না কেউ। এ দিন বন থেকে কোনো কিছু সংগ্রহও করা হয় না। মালযাত্রার আগে শুক্রবার সনাতন হিন্দু পরিবারের অনেকেই উপবাস থাকেন। আবার হিন্দু কি মুসলিম বনজীবী পরিবারের নারীরা যত দিন তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাদায় থাকেন তত দিনই রোজা রাখেন এবং উপবাস পালন করেন। যত দিন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাদায় থাকেন তত দিন বনজীবী পরিবারের নারীরা মাথায় তেল মাখেন না এবং সাবান ব্যবহার করেন না। যত দিন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাদাবনে থাকেন, তত দিন চুলার ছাই বাইরে ফেলা যায় না। মাটিতে দা বা ধারালো কিছু দিয়ে আঁচড় কাটা হয় না। এ সময় কোনো কিছু ঋণ বা কর্জ করে আনা যায় না। মালযাত্রায় যাওয়ার সময় পরিবারের নারীরা গুনগুনিয়ে গান করেন। তবে সুন্দরবনের বাংলাদেশ ও ভারতীয় অংশে কৃত্য ও রীতিগত ভিন্নতা দেখা যায়। মলয় দাস (২০১১) জানিয়েছেন, ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে যাঁরা বনে যান সেই পরিবারের নারীরা পুরুষদের জন্য হাঁড়িতে চাল নেন না রান্নার জন্য, কারণ তাঁরা বেঁচে ফেরত আসবেন কি না বিষয়টি অনিশ্চিত[৩৯]। সুন্দরবনের কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু পরিবারে জঙ্গলে যাওয়ার আগে স্ত্রীদের শাঁখা খুলে দিয়ে যেত, যদিও এই রীতি বর্তমানে খুব কম দেখা যায়[৪০]। বনে গিয়ে স্বামী নিখোঁজ হলে স্ত্রীরা ১২ বছর শাখা-সিঁদুর পরে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে[৪১]। তিনি আরও জানান[৪২] কাঠুরেরা বনে ঢুকেই কাষ্ঠবুড়ি বিশালাক্ষীর পূজা করে। তারা জঙ্গলে চুল, নখ কাটে না। বাড়িতে ওই সময় নারীরা কাপড়-চোপড় কাচে না, সিঁদুর পরে না ও আয়নায় মুখ দেখে না।

৪১. নিহত বলা গাছ ও ঝলসানো বনতল

বনতলের উদ্ভিদবৈচিত্র্য দেখে সুন্দরবনের সুস্থতা বোঝা যায়। যদি উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ও বিন্যাস বেশি থাকে তবে বোঝা যায় সুন্দরবনের স্বাস্থ্য ভালো এবং লবণের মাত্রা কম। জার্মানির হোয়েনহেম বিশ্ববিদ্যালয়ের এস হারুন রশিদ, কানাডার লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেইনহার্ড বকার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম এনায়েত হোসেন ও আবু সালেহ খান ২০০৭ সালে সুন্দরবনের বনতলের উদ্ভিদবৈচিত্র্য এবং এর সঙ্গে লবণাক্ততার সম্পর্ক নিয়ে একটি যৌথ গবেষণায়[৪৩] দেখিয়েছেন, বনতলের লতাগুল্ম তীব্র জোয়ার ও উচ্চ লবণমাত্র সহ্য করতে পারে না। বনের স্তরবিন্যাসের ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, পূর্ব সুন্দরবনে চাঁদপাই রেঞ্জে বারবার আগুন লেগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির ধকল সইতে হচ্ছে বনতলকে। এমনকি সুন্দরবনের নদী-খাল ও খাঁড়ি থেকে বনের ভেতরের দিকে প্রাণবৈচিত্র্যের যে বিন্যাস তা উল্টেপাল্টে গেছে। বিপর্যস্ত হয়েছে খাদ্যশৃঙ্খল এবং আঘাত লেগেছে সামগ্রিক খাদ্যজালে। কারণ আগুন লাগছে মূলত বনপ্রান্তে এবং সেখানে হরগোজা, ধানচি, বাঘ-ফার্ন, সিংড়া, বলা, কালিলতা, গোলপাতা, কেয়া, হেন্তাল, আঙুরলতা, বাওয়ালি লতারই আধিক্য বেশি। এটিই সুন্দরবনের বৃক্ষসমাজের অবস্থান বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনের জন্য এই বনতল খুবই গুরুত্ববহ এবং এখানকার সব প্রাণসম্পদ পুরো বনের টিকে থাকা ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। বারবার আগুনে সবচেয়ে বেশি পুড়েছে বলা, সিংড়া ও লতাগুল্ম। বনের এই অংশটুকু নানা প্রাণীর আশ্রয়স্থল। বিশেষত কাঁকড়া, শামুক, গুইসাপ, ব্যাঙ, সাপ, পতঙ্গ ও নানা জলচর পাখির। বলা গাছের ঝোপে বাটাং, ঘুঘু, বক ও কুকু পাখি বাসা বানায়। বলা গাছের ঝোপ এই পাখিদের আশ্রয়স্থল। এই গাছের ছাল সুন্দরবন অঞ্চলে দড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নানা কিছু বাঁধার কাজে এই দড়ি কাজে লাগে। সিংড়া গাছের কাণ্ড ঘরের খুঁটি হিসেবেও অনেকে ব্যবহার করেন। বনের আশপাশের অনেকের কাছেই শুকনো বলা ও সিংড়াগাছ জ্বালানির উৎস। বলা ও সিংড়ার ঝোপে মৌমাছি চাক বানায়। এসব চাক ঘন ঝোপের আড়ালে থাকে বলে অনেক সময় নানা আকৃতির হয় এবং এসব ঝোপের মধু মিশ্র স্বাদের হয়। বলা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ। অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ জে উদ্দিন, ডারেন গ্রেস ও এভেলিন টিরালংগো ২০০৮ সালে বাংলাদেশের ১২টি ঔষধি উদ্ভিদের সাইটোটক্সিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা[৪৪] করেন। এতে দেখা যায়, বলা গাছের এই গুণ যথেষ্ট, যা ক্যানসার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে। বারবার চাঁদপাই রেঞ্জের ধানসাগর ও নাংলী অঞ্চলে আগুন লাগায় বনতল পুড়ে যাওয়ায় এর বৃক্ষবৈচিত্র্য ও বিন্যাসে এক পরিবর্তন তৈরি হচ্ছে। দশ বছরে এই অঞ্চলের ঝোপে মৌচাকের সংখ্যা নিদারুণভাবে কমে

এসেছে। এটি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরাগায়ন ও নতুন বন জন্ম এবং বিকাশের জন্য এক বিপদবার্তা।

৪২. জোয়ার-ভাটার সংকেত

বাদাবন হলো জোয়ার-ভাটার বন। বাদাবনের জীবেরা নানানভাবে জোয়ার-ভাটার জানান দেয়। কালো বর্ণের কোকো নামে এক পাখি বনে উড়ে বেড়ায়। কোকো পাখি কু-কু-কু-কু করে ডাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফুটায়। কোকো পাখির ডাক ভাটার নির্দেশনা দেয়। কোকো পাখি ডাকতে শুরু করলে বোঝা যায় ভাটার সময় হয়েছে। কাঁকড়া ও শামুক যখন নদীর চর থেকে বনের ভেতরে গাছের ডালে উঠতে শুরু করে তা জোয়ার আসার নির্দেশনা দেয়। আবার তারা মাটিতে নেমে আসা ভাটার জানান দেয়।

৪৩. বকুলজানা

সুন্দরবনের খুব কম গাছের ফলমূল কি পাতা মানুষ রান্না করে খায়। রান্না করে খাওয়া যায় বকুলজানাগাছের ফল। পৌষ মাসে বকুলজানাগাছের ফুল আসে। আষাঢ় মাসে ফল হয়। ভাদ্রের শেষে ফল পাকে। ভাদ্র-আশ্বিনে বকুলজানাগাছের ফল গাছ থেকে কাদামাটিতে ঝরে পড়ে। এভাবেই অঙ্কুর গজায় ও নতুন গাছ হয়। সাধারণত খালের কিনারে এই গাছ বেশি দেখা যায়। বকুলজানাগাছের সবুজ রঙের জালি (কাঁচা) ফল শজনের মতো ছিলে গরম জলে সিদ্ধ করে কষ ফেলে দিতে হয়। কুচে চিংড়ি দিয়ে রান্না করে খাওয়া হয়। বকুলজানা খেতে পেঁপে সিদ্ধর মতো লাগে কিছুটা। এই ফলকে অনেকে বাদাবনের শজনে বলে।

৪৪. গরানের ভাগ

বাদাবন থেকে সংগৃহীত কাঠবহির্ভূত উল্লেখযোগ্য এক বনজ সম্পদ গরান গাছের ডাল। গরানের ডালের তিনটি ভাগ। কচা, ছিটে ও খুঁটি। কচা হলো সবচেয়ে চিকন ও ছোট ডাল। এটি ঘরের বেড়া তৈরিতে কাজে লাগে। ছিটে হলো মাঝারি আকারের ডাল। ঘরের পাইর ও চাল তৈরিতে কাজে লাগে। খুঁটি হলো সবচেয়ে বড় ও মোটা আকারের ডাল। ঘরের খুঁটি তৈরিতে কাজে লাগে। সাধারণত গরানের ছিটেই বেশি সংগ্রহ করা হয়।

৪৫. নতুন চাক ও পুরান চাক

মৌমাছি যখন চাক তৈরি শুরু করে তখন প্রাথমিক চাকটি দেখতে বাঁকা কাস্তে বা অর্ধচন্দ্রাকৃতির মতো দেখতে হয়। প্রাথমিক এই চাককে 'চান চাক' বলে।

বনজীবীদের কাছে চান চাক খুব পবিত্র। কোনোভাবেই চান চাক স্পর্শ করা হয় না। চাক দেখে চাকের বয়স আন্দাজ করা যায়। নতুন ও পুরোনো চাকের পরীক্ষাটি করা হয় কারু দিয়ে। হেন্তাল ও হরগোজা পাতা দিয়ে কারু বানানো হয়। কারু দিয়ে চাকের তলে ধোঁয়া দেওয়া হয়। চাকটি যদি পুরোনো হয় ধোঁয়া দিলে সব মৌপোকা উড়ে যায় না। চাকটি যদি নতুন হয় এবং মধুভর্তি না থাকে তবে ধোঁয়া দিলে সব মৌপোকা উড়ে চলে যায়। দ্রুত চাক পোকাশূন্য হয়ে যায়।

৪৬. চাকের প্রলেপ

চাক করলে মৌপোকারা গাছের ডালে একধরনের প্রলেপ তৈরি করে। ওই প্রলেপই মৌপোকাদের বসতি চিহ্ন। যা দেখে পরের বছর ওই ডালে আবার চাক তৈরি করে তারা। মধু সংগ্রহের সময় মৌয়ালরা খুব সাবধানে চাক কাটে। যেন গাছের ডালে কোনো দায়ের কোপ না পড়ে, প্রলেপে কোনো ক্ষত তৈরি না হয়। কখনোই এই প্রলেপ চেঁছে তুলে ফেলা হয় না। কোনোভাবে প্রলেপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরের বছর আর মৌপোকারা এই ডালে বসে না।

৪৭. চোঙের আঠা

মৌচাকের প্রতিটি ষড়ভুজাকৃতির একক ঘরকে চোঙ বলে। নিজেদের মুখের লালা ও চরের পলি মাটির সর দিয়ে চোঙ বানায় মৌপোকারা। একটি চোঙের সঙ্গে আরেকটি চোঙ খুব কায়দা করে আঠা দিয়ে লাগায় মৌমাছিরা। কাজটি কর্মী মৌমাছিরা করে। আঠার জন্য তারা দুটি উৎস ব্যবহার করে। জঙ্গল ও জল। বনের সুন্দরী, কাঁকড়া, পশুর ও বটগাছের কষ থেকে আঠা সংগ্রহ করে। শুধু গাছের কষ নয়, পাতা থেকেও আঠা সংগ্রহ করে মৌপোকারা। যখন গাছের জালি পাতা (নতুন পাতা) বের হয় তখন সেই পাতা থেকে আঠা সংগ্রহ করা যায়। আবার ভাটির সময় যখন নদীর জল থুমথুমি (একেবারে স্থির ও ঠান্ডা) হয় তখন জলের স্রোত ও পলিমাটিতে তৈরি হওয়া সরানি (জলের গ্যাজা) জমে চরের মাটির ওপরের স্তরে। মৌমাছিরা সেই সরানি চুষেও আঠা সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করা আঠা দিয়ে একটি চোঙের সঙ্গে আরেকটি চোঙ জোড়া লাগানো হয়। চোঙ তৈরি করে মৌপোকারা নিজেদের শরীরের মাপে। তাই সব চোঙ সমান মাপের হয় না, কিন্তু নকশা ও গড়ন একই থাকে।

৪৮. ফুলহারা মৌসুম

চৈত্র থেকে আশ্বিন এই সাত মাস সুন্দরবনে নানা ফুল ফোটে। এই মৌসুম ফুলের মৌসুম। মৌমাছিরা তখন বনে ঘুরে ঘুরে ফুলের মধু খায় এবং চাকে মধু জমায়।

কার্তিক থেকে মাঘ এই তিন মাস মৌমাছিরা চাকের মধু খায়। এ সময় মৌপোকারা চাকে বসে বাচ্চা ফুটায় ও বাচ্চাকে দেখাশোনা করে। এ সময়টিই সুন্দরবনের ফুলহারা মৌসুম। এ সময় মৌমাছিরা বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করে। বাচ্চা ফুটিয়ে বড় করেই তারা চলে যায়।

৪৯. সূর্যপাতালি ও দক্ষিণপাতালি মৌ

একেক দিকে মুখ করে একেক চাক তৈরির রেওয়াজ সুন্দরবনের মৌমাছি সমাজে। পুবমুখী চাকের কদর বেশি মৌপোকা কি মানুষের মাঝে। গাছের প্রজাতি ও এলাকার ওপর নির্ভর করে চাক কোনমুখী হবে। পুব দিকে মুখ করে বানানো চাকের মধুকে সূর্যপাতালি মৌ বলে। দিনের প্রথম আলো পড়ে এসব চাকে। এসব চাকের পোকার রাগ খুব বেশি। এদের মধুর পরিমাণও বেশি হয়। প্রতিটি চাঙে বা খোপে অন্য চাকের তুলনায় রস জমে বেশি। সাধারণত বাইন ও গেওয়া গাছে বেশি সূর্যপাতালি চাক দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে মুখ করে বানানো চাকের মধুকে দক্ষিণপাতালি মৌ বলে। এসব চাকের পোকার রাগ কম। মধুও কম হয়। সাধারণত জানাগাছে এই চাক দেখা যায়। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমমুখী চাকও মাঝেমধ্যে দেখা যায়।

৫০. লেজ ও দাঁত

সুন্দরবনের একেক মাছের লেজ ও দাঁতের গড়ন একেক রকম। সবচেয়ে বড় লেজ মুইল্যে মাছের। খাটো/ছোট লেজ দাঁতিনা, পায়রা, রুচো, পানখাগি ও কাঁকরবাঙা দাঁতিনার। হাঁ করলে সবচেয়ে বড় মুখ হয় কামট মাছের। তবে সুন্দরবনের সবচেয়ে ছোট হাঁ করে পায়রা মাছ। খরগুল্লো মাছের চোখ গোল গোল এবং সবচেয়ে বড়। এদের চোখ মাথায় থাকে। কেকশেল মাছের চোখ ছোট। যেসব মাছ জলের গভীরে যায় ও যেতে পারে তাদের চোখ বড় হয়। যেসব মাছ জলের গভীরে যায় না, সাধারণত জলের ওপরে ভেসে বেড়ায় তাদের চোখ ছোট হয়। সুন্দরবনে যত মাছ আছে তার ভেতর মুচর মাছের পেটেই সবচেয়ে লম্বা ডিম থাকে।

৫১. চাকের দেশ

সুন্দরবন যেন চাকময়, এই দেশ চাকের দেশ। এখানে মৌমাছির বসতিকে চাক বলে এবং মাছের ঝাঁককেও চাক বলে। মাছেরা 'গেজাগেজি' করে এবং 'কেত্তন' (কীর্তন) করে বেড়ায়। গাংগুয়া মাছ, খয়রা মাছ ও গনগনে মাছ বেশি কেত্তন করে বেড়ায়। পারশ্যে মাছও গান করে। এই মাছগুলো প্রথম নিজেরা কোনো

এলাকায় যায়। কোনো খাবারের উৎস পেলে বা কোনো বিপদ ঘটলে তারা গানে গানে একটা সংকেত পাঠায়। তখন অন্য মাছেরাও ছুটে চলে আসে। খরগুল্লো মাছ সব সময় এক জায়গায় দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এরা এক খাল ছেড়ে অন্য খালে সবাই মিলে চলে যায়। একটি চাকে মাইয়ে মাছ ও ছাওয়াল মাছ থাকে। মাইয়ে মাছের সংখ্যা বেশি থাকে। মাইয়ে মাছ খেতে ভালো না। পেটে ডিমঅলা মাইয়ে মাছকে পবিত্র হিসেবে দেখা হয়। জালে ধরা পড়লেও এদের ছেড়ে দেওয়া হলো নিয়ম। কারণ মা মাছ ধরে খেলে সেই মাছের আত্মা বনে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষের ক্ষতি করে।

৫২. ডুবি চাক

সুন্দরবনের বেশির ভাগ চাকই হাওয়ায় ভাসে। তবে জলের তলায় ডুবে যাওয়া চাকও তৈরি করে মৌপুকেরা। জোয়ারের পানিতে এসব চাক ডুবে যায়, আবার ভাটায় ভেসে ওঠে। সাধারণত গেওয়াগাছের হেলানো নিচের দিকের কাণ্ডে এবং হুদোবনের ঝোপে এসব চাক বেশি হয়। জলে ডুবে যাওয়া চাককেই ডুবি চাক বলে। এসব চাকের মৌমাছিদেরও খুব রাগ। জোয়ারের জলে ডুবে থাকা চাক থেকে কাঁকড়া কামড়ে কামড়ে রস খেয়ে ফেলে।

৫৩. বনের কোন দিকে মধু পাওয়া যাবে

মধু মৌসুমের শুরুতেই বনজীবীরা এই পরীক্ষা করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন ঘরের কোণে মাটির প্রদীপ সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সারা রাত ধরে জ্বলা প্রদীপের শিখা যেদিকে যায় ওই বছর বেশি মধু মিলে তার উল্টো দিকে। পূর্ব হলে পশ্চিমে আর উত্তরে হলে দক্ষিণে।

আসুন নতজানু হই

এভাবেই নানাভাবে নানা ব্যঞ্জনায় বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনের বনজীবীরা বিকশিত করে চলেছেন এক জীবনদায়িনী বিজ্ঞানভাষ্য। বিস্ময়কর ও নির্দয়ভাবে বাদাবনের বনজীবীদের এই অরণ্যভাষ্য কখনোই কোনো দিন তথাকথিত মূলধারায় স্বীকৃতি বা গুরুত্ব পেল না। অথচ এখানেই আছে টিকে থাকার কারিগরি এবং বেঁচে থাকার দর্শন। চলতি আলাপখানি ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর কোনো বিস্তর ব্যাখা-বিশ্লেষণে যাচ্ছে না। কারণ এসব নিয়ে বিস্তর বহুমাত্রিক বহুপক্ষীয় তর্ক ও তালাশ সম্ভব। কিন্তু এটি তো মানতেই হবে হাজার হাজার বছর ধরে বাদাবনে টিকে থাকার ভেতর দিয়েই বিকশিত হচ্ছে এখানকার লোকায়ত জ্ঞানকাণ্ড। বনজীবী নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের ময়দান থেকে আসুন একটিবার বিশ্বের বৃহত্তম

বাদাবনকে জানাবোঝার চেষ্টা করি। বাদাবনের করুণ রক্তদাগ আর আহাজারির পাশে শামিল হই। আসুন চুরমার করি সুন্দরবন নিয়ে প্রবল জ্ঞানকাণ্ডের বাহাদুরি। সুন্দরবন কোনো বিচ্ছিন্ন করে রাখার মতো উদ্ভিদ উদ্যান বা নয়াউদারবাদী উন্নয়ন প্রকল্পের ময়দান নয়। এটি বাঘ, বনজীবী, বনবিবিদের এক জটিল ঐতিহাসিক সংসার। এই সংসার যেমন দেশকে আগলে আছে, আগলে আছে দুনিয়াকেও। দেশ ও দুনিয়ার প্রতি আসুন নতজানু হই, কৃতজ্ঞ হই।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা ভাষায় রচিত এবং বিশেষত ভারত থেকে প্রকাশিত সুন্দরবন-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ও লেখালেখি জানতে পড়ুন : ধুর্জটি, নস্কর, ১৯৯৭, *সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ*, প্রথম খণ্ড, শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা। তুষার কান্তি কাঞ্জিলাল, ১৪০৬, *সুন্দরবনের প্রকৃতি, মানুষ ও উন্নয়ন*; পশ্চিববঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাসংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কমল চৌধুরী, ১৯৯৯, *চব্বিশ পরগনা উত্তর-দক্ষিণ সুন্দরবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ড. নির্মলেন্দু দাস, ১৯৯৬, *সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি*, জ্ঞানপ্রকাশ, কলকাতা। ড. দিলীপ কুমার নাহা, ২০০০, *প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা*, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা। ড. দেবব্রত নস্কর, ১৯৯৯, *চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। মনোজ বসু, *১৩৮৭*, পঞ্চম সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব, ১৪০১, *বোনবিবী জহুরানামা*, গাওসিয়া লাইব্রেরি, কলকাতা। রত্নাংশু বর্গী, ১৯৮৪, *সুন্দরবন*, কথাশিল্প, কলকাতা। শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৯৫, *সুন্দরবন সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা। দাস, মলয় দাস, ২০১১, *সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

২. বিস্তারিত দেখুন : Rist, Stephan and Dahdouh-Guebas, Farid. 2006, "Ethnosciences- a step towards the integration of scientific and traditional forms of knowledge in the management of natural resources for the future," *Environment, Development & Sustainability* 2006, 8 : 467-493

৩. দেখুন : Marschke, Melissa. 1999, "Using Local Environmental Knowledge: A case-study of mangrove resource management practices in PeamKrasaop Wildlife Sanctuary, Cambodia," Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Environmental Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Copyright by Melissa Manchke, 1999

৪. বাংলাদেশের সুন্দরবন নিয়ে খুব কম গবেষণা আছে, যা বননির্ভরতাকে গুরুত্ব দেয়। কালেভদ্রে যদিওবা কেউ দেয়, সেই গবেষণাগুলোও বনজীবীদের জ্ঞান ও চিন্তাপদ্ধতিকে কোনো উল্লেখই করে না। এমন একটি কাজ দেখতে পারেন : Islam, M.S. 2011. "Biodiversity and livelihoods: A case study in Sundarbans Reserve Forest, World Heritage and Ramsar Site (Bangladesh)," A Master thesis submitted of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) in Management of Protected Areas at the University of Klagenfurt, Austria

৫. এমন একটি গবেষণা দেখতে পারেন : Ghosh, Aditya; Susanne Schmidt; Thomas Fickert and Marcus Nüsser. 2015, "The Indian Sundarban Mangrove Forests: History, Utilization, Conservation Strategies and Local Perception," *Diversity* 2015, *7*, 149-169; doi:10.3390/d7020149

৬. ম্যানগ্রোভ বন নিয়ে এ রকম অজস্র গবেষণাকাজ দেখা যেতে পারে, যেখানে বিদ্যায়তনিক জ্ঞানকাঠামোর প্রবলতাগুলো স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। এ রকম কিছু গবেষণাকাজ দেখা যেতে পারে : a) Cornejo, Rubi Hernandez; NicoKoedam; Arturo Ruiz Luna; Max Troell and Farid Dahdouh-Guebas. 2005, "Remote sensing and ethnobotanical assessment of the mangrove forest changes in the Navachiste-San Ignacio-Macapule Lagoon complex, Sinaloa, Mexico," *Ecology and Society* 10 (1): 16. b) Islam, Md. Shahidul. 2003, "Perspectives of the coastal and marine fisheries of the bay of bengal, Bangladesh," *Ocean and Coastal Management* 46 (2003) 763-796. c) Gilman, Eric L; Joanna Ellison; Norman C. Duke and Colin Field. 2008, "Threats to mangroves from climate change and adaptation options: a review," *Aquatic Botany* 89 (2008) 237-250. d) Giri, Chandra; Bruce Pengra; Zhiliang Zhu; Ashbindu Singh and Larry L. Tieszen. 2007, "Monitoring mangrove forest dynamics of the Sundarbans in Bangladesh and India using multi-temporal satellite data from 1973 to 2000," *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 73 (2007) 91-100. e) Salam, M Abdus. 2000, "Eco-tourism to protect the reserve mangrove forest the Sundarbans and its flora and fauna," *Anatolia*, 2000 11:(1), 56-66. f) Baran E, Hambrey J. 1998, "Mangrove conservation and coastal management in Southeast Asia : what impact on fishery resources?," *Marine Bulletin* 1998, 37(8-12): 431-440

৭. এ সম্পর্কিত অনেক গবেষণা আছে। দেখুন : Blasco F. and Azipuru M. 1997, "Classification and evolution of the mangroves of India," *Tropical Ecology* 1997, 38(2):357-374 এবং Jayatissa LP, Dahdouh-Guebas F, Koedam N. 2002, "A review of floral composition and distribution of Mangroves in Sri Lanka," *Botanical Journal of the Linnean Society* 2002, 138:29-43

৮. দেখুন : Ray, Dr. Tapan. 2013, "Traditional Honey Collecting: Emerging Livelihood Problems and Socio-economic Uplift of

Mawallis Community in Sundarbans," *Pratidhwani the Echo, A Journal of Humanities & Social Science,* Published by: Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India, Website: www.thecho.in

৯. বিস্তারিত দেখুন : Miah, MD. Danesh; Romel Ahmed and Sheikh Jahidul Islam. 2003, "Indigenous Management Practices of *Golpata* (*Nypafruticans*) in Local Plantations in Southern Bangladesh," *Palms* 47(4): 185–190

১০. দেখুন : ঘোষাল, ইন্দ্রানী। ২০০৬, *সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য*, সলিল ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রথন, দক্ষিণগড়িয়া, কলকাতা, পৃ. ১১৩

১১. দেখুন : Mahmud, Imran; Md Khirul Islam; Sanjib Saha, Apurba Kumar Barman, Md Mustafizur Rahman, Md Anisuzzman, Taufiq Rahman, Abdullah Al-Nahain, Rownak Jahan and Mohammed Rahmatullah. 1998. "Pharmacological and Ethnomedicinal Overview of *Heritierafomes*: Future Prospects," *International Scholarly Research Notices*, Volume 2014, Article ID 938543, 12 pages

১২. Roy, Tapan. 2014, "Customary use of mangrove tree as a folk medicine among the Sundarban resource collectors," *Humanities, Arts and Literature* (IMPACT: IJRHAL), Vol. 2, Issue 4, April 2014, 43-48

১৩. দেখুন : Dahdouh-Guebas F, S Colil, D Lo Seen, P Ronnback, D Depommier, T Ravishankar and N Koedam. 2006, "Analysing ethnobotanical and fishery-related importance of mangrove of the East-Godavari delta (Andhra Pradesh, India) for conservation and management purposes," *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 2006, 2:24, p-14

১৪. দেখুন : Revathi P, T Jeyaseelan Senthinath, P Thirumalaikolundu Subramanian and N Prabhu. 2013, "Medicinal properties of mangrove plants – an overview," *Int. J. Bioassays*, 2013, 02 (12), 1597-1600

১৫. দেখুন : Mirera, David Oersted; Jacob Ochiewoa, Fridah Munyi, Tabitha Muriuki. 2013. "Heredity or traditional knowledge : Fishing tactics and dynamics of artisanal mangrove crab (Scylla serrata) fishery," *Ocean & Coastal Management* 84 (2013) 119e129

১৬. দেখুন : Masalu, D. C. P., Shalli, M. S. and Kitula, R. A. 2010, *Customs and Taboos : The role of indigenous knowledge in the management of fish stocks and coral reefs in Tanzania.* pp.64

১৭. দেখুন : Gardner, Charlie J.; ZoAndriamahenina; AudeCarro; Trevor G. Jones ; Louise D. Jasper. 2014, "Rapid assessments and local knowledge reveal high bird diversity in mangroves of north-west Madagascar," *Wetlands Ecol Manage*, DOI 10.1007/s11273-016-9501-3, and published online 14 July 2016

১৮. বিস্তারিত পড়ুন : Primavera JH. 2000, "The yellow mangrove: its ethnobotany, history of maritime collection and needed rehabilitation in the central and southern Philippines," *Philippine Quarterly of Culture and Society* 2000, 28(4): 464-475

১৯. দেখুন : Rosa IML, Alves RRN, Bonifacio KM, Mourao JS, Osorio FM, Oliveria TPR, Nottingham MC. 2005, "Fishers' knowledge and seahorse conservation in Brazil," *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 2005, 1:12

২০. দেখুন : Govindasamy, C and Kannan R. 2012, "Pharmacognosy of mangrove plants in the system of unani medicine," *Asian Pacific Journal of Tropical Disease* (2012)S38-S41

২১. দেখুন : Saranraj P. and D. Sujitha. 2015. "Mangrove Medicinal Plants: A Review," *American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences* 7 (3): 146-156, 2015

২২. দেখুন : Saranya, Arumugam; ThirugnanasambandamRamanathan; Krishnan SelvarajanKesavanarayanan and Aishah Adam. 2015, "Traditional Medicinal Uses, Chemical Constituents and Biological Activities of a Mangrove Plant, *Acanthus ilicifolius*Linn. : A Brief Review," *American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.*, 15 (2): 243-250, 2015

২৩. দেখুন : Bandaranayake WM, 1998, "Traditional and medicinal use of mangroves," *Mangroves and Salt Marshes* 1998, 2:133-148

২৪. দেখুন : Qasim, Muhammad ; Zainul Abideen; Muhammad Yousuf Adnan; Raziuddin Ansari; Bilquees Gul; Muhammad Ajmal Khan. 2014. "Traditional ethno-botanical uses of medicinal plants from coastal areas of Pakistan," *Journal of Coastal Life Medicine* 2014; 2(1): 22-30

২৫. দেখুন : Ravindran, KC; K Venkatesan; V Balakrishnan; KP Chellappan and T Balasubramanian. 2005, "Ethnomedicinal studies of Pichavaram mangroves of East Coast, Tamil Nadu," *Indian Journal of Traditional Knowledge*, Vol. 4(4), October 2005, pp 409-411

২৬. দেখুন : Pattanaik, Chiranjibi; CS Reddy; NK Dhal and Rashmita Das. 2008, "Utilisation of mangrove founds in Bhitarkanika

Wildlife sactuary, Orissa," *Indian Journal of Traditional Knowledge*, Vol. 7(4), October 2008, pp 598-603

২৭. বিস্তারিত দেখুন : Khan, Mohammad Monirul Hasan. 2004, "Ecology and conservation of the Bengal tiger in the Sundarbans mangrove forest of Bangladesh," A dissertation submitted to the University of Cambridge in partial fulfilment of the conditions of application for the degree of Doctor of Philosophy, Wildlife Research Group Selwyn College , Department of Anatomy Cambridge , University of Cambridge, p-184

২৮. দেখুন : Barlow, Adam C. D. 2009, "The Sundarbans Tiger Adaptation, Population Status, and Conflict Management," A Thesis Submitted to The Faculty of The Graduate School of The University of Minnesota, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy

২৯. দেখুন : Cormier-Salem MC. 1999, "The mangrove : an area to be cleared ...for social scientists," *Hydrobiologica* 1999, 413:135-142

৩০. বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে 'প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ' এবং সুন্দরবননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যেসব উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে সেসব উন্নয়ন প্রকল্পকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বনজীবীরা বলেন তারা 'বিপর্যস্ত' এবং যারা এসব প্রাণ ও প্রকৃতিবিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চালাচ্ছেন তারা সুন্দরবন ও মানুষের উন্নয়ন চিন্তায় 'কাহিল' মানে ক্লান্ত। কাহিল প্রত্যয়টি মূলতঃ সুন্দরবন নিয়ে চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে বনজীবীদের একটি স্যাটায়ার।

৩১. দেখুন : Haque, Mohammad Zahirul; Mohammad Imam Hasan Reza; Md. Mahmudul Alam; Zahir Uddin Ahmed; Md. Wasiul Islam. 2016, "Discovery of a potential site for community based sustainable ecotourism in the Sundarbans reserve forests, Bangladesh," *International Journal Conservation Science* **7**, 2, APR-JUN 2016: 553-566. সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে 'আধুনিকতার উপনিবেশিক তর্ক' জারি আছে, তা পর্যটন হোক বা সংরক্ষণ হোক।

৩২. লেখকগণ তাঁদের লেখায় 'আধুনিক পর্যটক' প্রত্যয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে রচনার কোথাও এই আধুনিক পর্যটক বলতে কাদের বোঝায় তারা কী ধরণের বস্তু বা বিষয় তার কোনো ব্যাখ্যা ও বিবরণ নেই। তবে রচনায় যেভাবে কোনো বন এলাকার মানুষদের ভেতর এই পর্যটনের আহবান জানানো হয়েছে সেখানে আধুনিক প্রত্যয়টি সেই ঐতিহাসিক উপনিবেশিকতাকেই টান দেয় এবং জনগোষ্ঠী এবং স্থান 'অপর' হয়ে দাঁড়ায়।

৩৩. দেখুন : Dahdouh-Guebas F, S Colil, D Lo Seen, P Ronnback, D Depommier, T Ravishankar and N Koedam. 2006, "Analysing ethnobotanical and fishery-related importance of mangrove of the East-Godavari delta (Andhra Pradesh, India) for conservation and management purposes," *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 2006, 2:24, p-9

৩৪. দেখুন : Bühnen, S.1992, "Place names as an historical source: an introduction with examples from southern Senegambia and Germany," *History in Africa* 19: 45–101

৩৫. দেখুন : দাস, মলয়। ২০১১, *সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ.৬৯

৩৬. দেখুন : সরকার, প্রদ্যুৎ। ২০০৫, সুন্দরবনের নৌ-নির্মাণশিল্প, *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র*, ষষ্ঠসংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ.৩

৩৭. দেখুন : দাস, মলয়। ২০১১, *সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ.৭০

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

৪৩. দেখুন : Rashid S., Harun; Reinhard Böcker; A. B. M. E. Hossain; Saleh A. Khan. 2008, "Undergrowth species diversity of Sundarban mangrove forest (Bangladesh) in relation to salinity," *Ber. Inst. Landschafts- Pflanzenökologie Univ. Hohenheim Heft* 17, 2007, S. 41-56, Stuttgart

৪৪. দেখুন : Uddin, Shaikh J.; Darren Grice and Evelin Tiralongo. 2011, "Cytotoxic Effects of Bangladeshi Medicinal Plant Extracts," *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, Volume 2011, Article ID 578092, 7 pages, Hindawi Publishing Corporation

আমার বাদাবন বিদ্যাঘর ও ঋণস্বীকার

সুন্দরবন ঘিরে আমার শিক্ষালয় বাদাবনের সমগ্র জীবনপ্রবাহ। এ ক্ষেত্রে সুন্দরবনের বনজীবীরাই আমার প্রধান শিক্ষাগুরু। চলতি আলাপখানি গড়ে ওঠার পেছনে যাদের হাজার বছরের জ্ঞান, দর্শন ও চিন্তাধারা কাজ করেছে তাদের সকলের ধারে আমি চির অশেষ ঋণী। এই ঋণস্বীকারের ফর্দে অসাবধানতায় কেউ বাদ থেকে গেলে আমায় ক্ষমা করবেন।

১. মার্জন আলী সরদার (৮০), লোহার কারিগর, সুন্দরবনের জেলেদের জাল ও নৌকার লোহার উপকরণ ও মৌয়ালদের চাক কাটার দা বানান, মা ফুটি বিবি ও বাবা ফকির সরকার, আমাদি, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১১

২. মোকসেদ আলী (৫৭), সাজুনী, মা সলুক বিবি ও বাবা দুর্লভ গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১১

৩. আবদুর রহিম (৫০), মৌয়াল, মা আছিয়া বেগম ও বাবা মুন্সী চাঁদ আলী সর্দার, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১১

৪. আরশাদ আলী গাজী (৭০), মৌয়াল, মা উমেলা খাতুন ও বাবা সুলতান গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১১

৫. পীরালি গাজী (৭৫), সাজুনী, মা ছবিজান বিবি ও বাবা নেসের গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২ এপ্রিল ২০১১

৬. আন্না বালা সর্দার (৫০), মেলে মাদুর কারিগর, মা লক্ষ্মী দাসী ও বাবা হাজেরা সর্দার, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২ এপ্রিল ২০১১

৭. সুবল চন্দ্র দাস (৬৫), মৃৎশিল্পী, মা প্রিয়বালা দাসী ও বাবা নরেন চন্দ্র দাস, আনুলী পালপাড়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২ এপ্রিল ২০১১। খুলনার কয়রার আমাদী বাজারে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মেলায় আলাপ হয়।

৮. গণেশ সরকার (৬৮), মৌয়াল, মা মধু দাসী ও বাবা বিজয় সরকার, চণ্ডীপুর, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ এপ্রিল ২০১১

৯. আজিজুল হক গাজী (৫৫), কৃষক ও মৌয়াল দলের সঙ্গেও মাঝেমধ্যে বনে যান, মা লাইলা খাতুন ও বাবা রহমান গাজী, নারানপুর, বাগালী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ এপ্রিল ২০১১

১০. আশরাফুল শিকারি (৫০), বাওয়ালি, মা সোনাভানু ও বাবা শহিদুল শিকারি, নারানপুর, বাগালী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তার দাদা অজেত শিকারি সুন্দরবনের 'বিখ্যাত শিকারি'। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ এপ্রিল ২০১১

১১. দৌলত আলী সর্দার (৭০), মৌয়াল, মা খোদেজা বিবি ও বাবা ছরু সর্দার, নারানপুর, বাগালী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ এপ্রিল ২০১১

১২. সুপদ মণ্ডল (৬৫), জেলে, মা সুন্দরী মণ্ডল ও বাবা লক্ষণ মণ্ডল, বানিয়াখালী, ৩ নম্বর মহেশ্বরীপুর ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ এপ্রিল ২০১১

১৩. হরিপদ মণ্ডল (৪৮), সাজুনী, মা বৃন্দেবালা মণ্ডল ও বাবা অনন্ত মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মে ২০১১

১৪. নটবর মণ্ডল (৭৪), মৌয়াল ও মুক্তিযোদ্ধা, মা পঞ্চমী বালা মণ্ডল ও বাবা সতীশ চন্দ্র মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মে ২০১১

১৫. ফরমান গাজী (৯০), সুন্দরবনের নৌকার কারিগর, মা হেলি বিবি ও বাবা মান্দার গাজী, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মে ২০১১

১৬. বদরুল দেওয়ান গাজী (৪৫), মৌয়াল, মা পারভীন ও বাবা হবি গাজী, পানখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০১০। ২২ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তিনি বাঘের কামড়ে মারা যান।

১৭. আজগর আলী শেখ (৪৫), বাওয়ালি, মা কাঞ্চন বিবি ও বাবা মোসলেম শেখ, টেকেরমাথা, গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৯ জানুয়ারি ২০১০। সুন্দরবনের বিখ্যাত শিকারি মেজ শেখের নাতি।

১৮. বাসন্তী দাসী (৫৭), জেলে, মা দীন দাসী ও বাবা পাগলা সানা, মুন্সিগঞ্জ জেলেপাড়া, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১০

১৯. নূরুল ইসলাম (৫০), জেলে, মা সায়রা খাতুন ও বাবা কাদের বক্স মোল্লা, মালঞ্চ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ওপর থাকেন, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১০

২০. আজিবর মোল্লা (২৫), জেলে, মা সায়রা খাতুন ও বাবা কাদের বক্স মোল্লা, মালঞ্চ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ওপর থাকেন, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১০

২১. মিজানুর রহমান (৩০), জেলে, মা নূরজাহান ও বাবা আবদুর রব, খেওড়াঘাট, ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১০

২২. শহীদুল মোড়ল (৪০), জেলে, মা আমেনা বেগম ও বাবা মন্তাজ মোড়ল, মালঞ্চ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ওপর থাকেন, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১০

২৩. হরিপদ মণ্ডল (৬০), কৃষক ও জেলে, মা সুভদ্র মণ্ডল ও বাবা ফকির চান মণ্ডল, ঠাকুরঘেরি, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০১০

২৪. আবদুল জব্বার (৭০), জেলে, মা অমেত্ত বিবি ও বাবা সুখচাঁদ কয়ার, টেংরাখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০১০

২৫. রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (৫০), মৌয়াল ও জেলে, মা বামনী বালা মণ্ডল ও বাবা হারান চন্দ্র মণ্ডল, গোলাখালী, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

২৬. প্রণব কুমার বিশ্বাস (৪০), চিংড়িঘের মালিক, মা পার্বতী বিশ্বাস ও বাবা দেবীরঞ্জন বিশ্বাস, গোলাখালী, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

২৭. বসুদেব গায়েন (৪০), মৌয়াল ও বাওয়ালি, মা লক্ষবালা দাস ও বাবা কেদার গায়েন, গোলাখালী, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

২৮. তুলসী রানী মণ্ডল (৪৫), জেলে, মা সুধানী বালা ও বাবা মহিন্দ্র রপ্তান, কালিঞ্চি, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

২৯. বিমলা গায়েন (৪০), কৃষক ও জেলে, মা লক্ষ্মী গায়েন ও বাবা দীননাথ গায়েন, ভেটখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

৩০. অনন্ত মণ্ডল (৭৬), গুনিন, মা পাচী বালা ও বাবা মানিকচান মণ্ডল, ভেটখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

৩১. অনিল কুমার মণ্ডল (৬৭), বনবিবির পুঁথি পাঠক, মা ভবানী বালা দাসী ও বাবা অশোক কুমার মণ্ডল, ভেটখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

৩২. মোহর আলী (৪৫), জেলে, মা মোমেনা খাতুন ও বাবা নঈমুদ্দিন গাজী, প্রতাপনগর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহে তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

৩৩. লক্ষ্মী রানী মণ্ডল (৬৬), জেলে, মা দামনী বালা ও বাবা হলধর মোড়ল, ধুমঘাট, ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১০

৩৪. পঞ্চানন পাইক (৭৩), বনবিবির প্রতিমা কারিগর, মা আরতী পাইক ও বাবা বলরাম পাইক, আড়পাঙ্গাশিয়া, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১০

৩৫. নূরুল ইসলাম মোল্লা (৭২), মৌয়াল ও ঠেংনা করতে জানেন, মা রূপভান বিবি ও বাবা জয়নাল মোল্লা, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৪ মার্চ ২০১০

৩৬. নেপাল চন্দ্র মণ্ডল (৪৫), বনবিবি পূজা আয়োজক, মা আমোদী দাসী ও বাবা সন্যাসী মণ্ডল, কলুখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৬ মার্চ ২০১০

৩৭. উর্মিলা সর্দার (৫৮), জেলে, মা ফেলী মণ্ডল ও বাবা অধর মণ্ডল, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭ মার্চ ২০১০

৩৮. অধীর চন্দ্র মুন্ডা (৭০), জেলে ও দিনমজুর, মা সহচরী দাসী ও বাবা নয়ন মুন্ডা, চুনো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১০

৩৯. খগেন্দ্রনাথ মুন্ডা (৭০), গুনিন ও কবিরাজ, মা ইচ্ছামতী মুন্ডা ও বাবা হরিপদ মুন্ডা, চুনো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১০

৪০. ধর্মদাস মুন্ডা (৭০), দিনমজুর ও জেলে, মা দুগ্গো দাসী মুন্ডা ও বাবা অখিল মুন্ডা, চুনো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১০

৪১. অবিনাশ মুন্ডা (৮০), দিনমজুর ও কৃষক, মা ক্ষ্যান্তদাসী মুন্ডা ও বাবা ভৃগুরাম মুন্ডা, চুনো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১০

৪২. রবীন্দ্র মুন্ডা (৫০), দিনমজুর ও জেলে, মা বাহামনি মুন্ডা ও বাবা নিতাই মুন্ডা, দাঁতিনাখালী হুলো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১০

৪৪. সুশীল মণ্ডল (৮২), কবিরাজ ও বাঘে ধরা মানুষের চিকিৎসক, মা লক্ষ্মীবালা মণ্ডল ও বাবা মণীন্দ্র মণ্ডল, পূর্ব কালিনগর (গাভা), মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১০

৪৪. রুহুল আমিন (৭৬), সাজুনী, মা মুর্শিদা বিবি ও বাবা মান্নান মোল্লা, দক্ষিণ কদমতলা, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১০

৪৫. অজেদ আলী খান (৭৭), মৌয়াল, মা নবীজান বিবি ও বাবা মুখা খান, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৪৬. সাখাত শেখ (৭০), মৌয়াল, মা আদরি বিবি ও বাবা মোলাম শেখ, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৪৭. নূর আহম্মদ ঢালী (৪০), মৌয়াল, মা আলেয়া বেগম ও বাবা নূরহুদ ঢালী, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৪৮. শহীদুল গাজী (৩৭), মৌয়াল, মা সফরুন নেছা ও বাবা রাশেদ গাজী, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৪৯. মোনাজাত ঢালী (৬৫), মাঝি, মা রূপভান ও বাবা কালাচান ঢালী, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৫০. ঈমান আলী শেখ (৬০), মৌয়াল, মা কাঞ্চন বিবি ও বাবা মালেক শেখ, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৫১. মহব্বত আলী মোড়ল (৬৫), সাজুনী, মা রূপজান বিবি ও বাবা এন্তাজ মোড়ল, চাঁদনীমুখা, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৫২. মোনাজাত ঢালী (৭৫), মৌয়াল, মা ফুলন বিবি ও বাবা মছলেম ঢালী, চকবারা-খলসেবুনিয়া, ১২ নম্বর গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ এপ্রিল ২০১০

৫৩. আবদুর রশীদ (৫০), মৌয়াল, মা জহুরা খাতুন ও বাবা দবিরুদ্দীন গাজী, বিড়ালাক্ষী, আঁটুলিয়া ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২ এপ্রিল ২০১০

৫৪. কেরামত সরদার (৭৫), মৌয়াল, মা আলেকজান বিবি ও বাবা কওছার সরদার, ধূমঘাট, ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২ এপ্রিল ২০১০

৫৫. নাছিমা বেগম (৩০), দিনমজুর ও জেলে, মা নবিছা বিবি ও বাবা জিয়াদ গাজী, ছোট ভেটখালী (যতীন্দ্রনগর), মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মে ২০১০। পরের দিন তিনি বাঘের কামড়ে মারা যান।

৫৬. শ্রী হরিপদ মণ্ডল (৪৫), জেলে, মা রাধারানী মন্ডল ও বাবা কালীপদ মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মে ২০১০। ১৭ মে ২০১০ তিনি বাঘের কামড়ে মারা যান।

৫৭. মো. মজিবর গাজী (৩৭), জেলে, মা সায়রা বিবি ও বাবা ওমর আলী, কলবাড়ি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫ মে ২০১০। বাঘের কামড়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়।

৫৮. আমেনা বিবি (৫০), জেলে, মা সারা বিবি ও বাবা ছবেদ সর্দার, পানখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ জুন ২০১০।

৫৯. জের মোড়ল (৬০), নৌকার কারিগর, মা লাইলা বিবি ও বাবা জের আলী মোড়ল, ভামিয়া, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ জুন ২০১০।

৬০. ইয়াসীন সর্দার (৪০), মৌয়াল, মা সোনাভানু সর্দার ও বাবা নূরআলী সর্দার, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ জুন ২০১০।

৬১. আবু সামা (৪০), মৌয়াল, মা ইসলাম বিবি ও বাবা আবদুল গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ জুন ২০১০।

৬২. ছাবিরুন নেছা (৪৫), জেলে, মা আদারি বিবি ও বাবা রহমান সর্দার, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ জুন ২০১০।

৬৩. আরশাদ সর্দার (৬০), মৌয়াল, মা মান্দারী বিবি ও বাবা দিদার বক্স সর্দার, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ জুন ২০১০।

৬৪. আসাদুজ্জামান (২৫), জেলে, মা নূরজাহান বিবি ও বাবা আনার গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ জুন ২০১০।

৬৫. সোনাভানু বিবি (৭০), জেলে, মা ফুলমতী গায়েন ও বাবা মালেক গায়েন, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৫ জুন ২০১০।

৬৬. খদিজা বিবি (৫০), কবিরাজ, মা লাইলা খাতুন ও বাবা মান্দার গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৫ জুন ২০১০।

৬৭. কেনা মোড়াল (৬০), জেলে, মা বৃন্দে দাসী ও বাবা যাদব মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৬ মে ২০১০। ২৬ মে ২০১০ তারিখে বাঘের কামড়ে মারা যান।

৬৮. পরিতোষ মুন্ডা (৩৪), জেলে, মা শুকরি রানী মুন্ডা ও বাবা রামচরণ মুন্ডা, কালিঞ্চি, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ জানুয়ারি ২০১১।

৬৯. মায়ারানী কাহার (৪৬), কাঁকড়াশিকারি এবং বংশগতভাবে পালকিবাহক, মা বিজলী কাহার ও বাবা কৃষ্ণপদ কাহার, বুড়িগোয়ালিনী আশ্রয়ণ প্রকল্প, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৬ অক্টোবর ২০১১

৭০. মজিদ পাঁড় (৫০), জেলে, মা রুপি পাঁড় ও বাবা আজগর পাঁড়, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১১

৭১. নীলকান্ত মুন্ডা (৫০), জেলে ও দিনমজুর, মা গৌরী দাসী মুন্ডা ও বাবা ভুটুক মুন্ডা, মহসিন সাহেবের হুলো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১১

৭২. সীতা রানী সর্দার (৪৫), জেলে, মা বালা চৌকিদার ও বাবা অমূল্য চৌকিদার, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ জুলাই ২০০৯

৭৩. সন্তোষ গাইন (৫০), জেলে, মা জংগুরী গাইন ও বাবা গৌরপদ গাইন, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ জুলাই ২০০৯

৭৪. রফিকুল গাজী (৪৮), জেলে, মা জামিরুন নেছা ও বাবা মানিকচান গাজী, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ জুলাই ২০০৯

৭৫. রিয়াজুল মোড়ল (৫০), সাজুনী, মা নূরনেছা ও বাবা আক্কাস মোড়ল, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ জুলাই ২০০৯

৭৬. সখিচরণ মুন্ডা (৫০), জেলে, মা ফুটকী মুন্ডা ও বাবা সমরা মুন্ডা, তারানীপুর, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৮ জুলাই ২০০৯।

৭৭. আবদুল মজিদ (৫৬), মৌয়াল, মা সূর্যভান বিবি ও বাবা মুনসুর আলী গাজী, ডুমুরিয়া, গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৯ জুলাই ২০০৯।

৭৮. মোসলেম গাজী (৭০), মৌয়াল, মা ভেজালী বিবি ও বাবা গোলাপদী গাজী, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৯ জুলাই ২০০৯।

৭৯. রেণু মণ্ডল (৫৫), জেলে, মা বাতাসী মণ্ডল ও বাবা বিরেন মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ আগস্ট ২০০৯

৮০. শ্রীপদ মণ্ডল (৬০), মৌয়াল, মা আলী বালা ও বাবা বিহারী মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩ আগস্ট ২০০৯

৮১. শরবানু (৪০), জেলে ও দিনমজুর, মা করিমন নেছা ও বাবা নওশের কয়ার, সোরা, গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৪ আগস্ট ২০০৯।

৮২. আবদুল মজিদ (৫৬), মৌয়াল, মা সূর্যভান বিবি ও বাবা মুনসুর আলী গাজী, ডুমুরিয়া, গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৯ জুলাই ২০০৯

৮৩. মুকছুস আলী (৭৬), মৌয়াল, মা সলক বিবি ও বাবা দুর্লভ গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৭ আগস্ট ২০০৯

৮৪. মো. ইউনুস আলী গাজী (৬০), মৌয়াল, মা ফিরোজা বিবি ও বাবা বেলায়েত হোসেন গাজী, ফতেকাঠি, বাগালি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৬ আগস্ট ২০০৯

৮৫. আলম সরদার (৭০), সাজুনী, মা চান্দ বিবি ও বাবা আবদুল কাদের সরদার, বালিয়াডাঙ্গা, আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৭ আগস্ট ২০০৯

৮৬. সৃষ্টিধর সানা (৭০), মৌয়াল, মা ভাদরী সানা ও বাবা তাঁতীরাম সানা, কাঁটাখালী, আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৭ আগস্ট ২০০৯

৮৭. জয়দেব মণ্ডল (৭৫), জেলে ও মৌয়াল, মা অম্বিকা মণ্ডল ও বাবা ত্রৈলক্য মণ্ডল, পশুরতলা, বেদকাশী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৮ আগস্ট ২০০৯

৮৮. লিটু খাঁ (৪৬), গরানের ছিটে বাওয়ালি, মা বেগম বিবি ও বাবা আবদুল আজিজ খান, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০০৯

৮৯. কেলে সাহেব/মোহাব্বত শেখ (৬৫), জেলে, মা সবুরজান ও বাবা কাশেম শেখ, মূল বাড়ি রামপাল, বাগেরহাট। দুবলারচরের আলোরকোলে রাসমেলায় আলাপ হয়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৯

৯০. পরিতোষ মণ্ডল (৬৫), বনবিবির পূজারি ও জেলে, মা পাচিবালা মণ্ডল ও বাবা চারু মণ্ডল, ওলা, বাগালী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। দুবলারচরের আলোরকোলে রাসমেলায় আলাপ হয়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৯

৯১. প্রভাষ ঢালী (৪০), জেলে, মা করুণা রানী ঢালী ও বাবা তারপদ ঢালী, দুর্গাপুর, খাজুরা ইউনিয়ন, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। দুবলারচরের আলোরকোলে রাসমেলায় আলাপ হয়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৯

৯২. কৃষ্ণপদ মণ্ডল (৭৮), কৃষক, মা সাবিত্রী বালা মণ্ডল ও বাবা গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, বড়কুপট, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৪ আগস্ট ২০০৯।

৯৩. ওমর সর্দার (৫০), বাওয়ালি ও ঘটক, মা নেদি ও বাবা ওমর সর্দার, ডুমুরিয়া, গাবুরা ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০০৯

৯৪. লুৎফর রহমান গাজী (৫৭), মৌয়াল, মা কিনে বিবি ও বাবা আবদুল কাদের গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৬ জুলাই ২০০৯

৯৫. মো. শাহাবুদ্দিন মোড়ল (৬০), সাজুনী, মা ভানু বিবি ও বাবা পচাঙ্গী মোড়ল, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৬ জুলাই ২০০৯

৯৬. মো. মুজিবর রহমান গাজী (৪৭), মধুকাটা মৌয়াল, মা কিনে বিবি ও বাবা আবদুল কাদের গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৬ জুলাই ২০০৯

৯৭. মো. শামসুর রহমান গাজী (৪৬), আড়িটানা মৌয়াল, মা কিনে বিবি ও বাবা আবদুল কাদের গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৬ জুলাই ২০০৯

৯৮. আব্বাস উদ্দীন গাজী (৪৫), সাজুনীর সহকারী, মা সুফিয়া বেগম ও বাবা ইসলাম গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৯

৯৯. আবিয়ার গাজী (৫৭), কড় বাওলে, মা সুন্দরী বিবি ও বাবা ওমর গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৯

১০০. ইব্রাহীম শেখ (৬০), কাটনি বাউলে, মা এলেমান খাতুন ও বাবা এলাহী বকস শেখ, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৯

১০১. আ. সালাম গাজী (৫৫), মৌয়াল, মা চন্দ্রভান বিবি ও বাবা বকস গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৯

১০২. ওমর ফারুক সরকার (৪৫), আড়িটানা মৌয়াল, মা নূরজাহান বিবি ও বাবা আমজাদ সরকার, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭ জুলাই ২০০৯

১০৩. নিমাই বিশ্বাস (৪৭), কাটনি বাউলে, মা তারাপদ বিশ্বাস ও বাবা উষা রানী বিশ্বাস, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১০

১০৪. মহেন্দ্র মণ্ডল (৫৫), ছাটা দেওয়া, মা বিনোদিনী মণ্ডল ও বাবা সুধীর মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১০

১০৫. রামচন্দ্র মণ্ডল (৫০), বারছাটা মৌয়াল, মা সন্ধ্যা রানী মণ্ডল ও বাবা মদন মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১০

১০৬. আবদুর রাজ্জাক মোড়ল (৫১), ছাটা বাউলে, মা ছরিমন বিবি ও বাবা আবদুল জব্বার, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১০

১০৭. ইদ্রিস আলী মোড়ল (৫৩), বারছাটা বাউলে, মা ছরিমন বিবি ও বাবা উষা রানী বিশ্বাস, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৩ মার্চ ২০১০

১০৮. অজিয়ার মোড়ল (৫০), ছাটা দেয়া বাউলে, মা মনোয়ারা বিবি ও বাবা আবদুল বারী মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১০

১০৯. রহিম বক্স গাইন (৭৫), মাঝি, মা জয়গুন বিবি ও বাবা জাবক্স গাইন, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১০

১১০. সন্যাসী বিশ্বাস (৪১), আড়িঅলা, মা উষা রানী ও বাবা তারাপদ বিশ্বাস, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১০

১১১. শফিকুল ইসলাম শেখ (৪৫), কড় ছাটা বাউলে, মা ছফুরা বিবি ও বাবা আবু তালেব শেখ, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১০

১১২. ছবেদ আলী গাজী (৫০), আড়িঅলা মৌয়াল, মা রহিমা খাতুন ও বাবা জিয়াত আলী গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৩. গোলাম মোস্তফা সরদার (৪৫), মধুকাটা বাউলে, মা দুলজাহান বিবি ও বাবা আহম্মদ সরদার, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৪. আনোয়ার গাজী (৬০), মাঝি, মা রওশনআরা ও বাবা নূর ইসলাম গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৫. মো. লুৎফর রহমান মোড়ল (৫৭), সাজুনী, মা ভানু বিবি ও বাবা পচাব্দী মোড়ল, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৬. আনার গাজী (৬০), মাঝি, মা আলকি বিবি ও বাবা নূরানী গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৭. কওছার আলী গাজী (৪৫), কাটনি বাউলে, মা রহিমা খাতুন ও বাবা জিয়াত আলী গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৮. ইয়াসিন বিল্লাল সর্দার (৫০), আড়িঅলা মৌয়াল, মা রহিমা খাতুন ও বাবা জিয়াত আলী গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১১৯. খালেক সর্দার (৩৫), কাটনি বাউলে, মা আমেনা খাতুন ও বাবা সুরাত সর্দার, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০০৯

১২০. মো. আকির হামজা (৩৫), মৌয়াল, মা আনোয়ারা বিবি ও বাবা শামসুর রহমান মোল্লা, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২১. আবদুর রহমান সর্দার (৪৫), মৌয়াল, মা মরিয়ম বেগম ও বাবা কেরামত সর্দার, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২২. কেরামত সর্দার (৮০), কাটনি বাউলে, মা আলেকজান বিবি ও বাবা বক্স সর্দার, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২৩. আনোয়ার হোসেন (৫৫), আড়িটানা মৌয়াল, মা আনোয়ারা খাতুন ও বাবা সামপুর মোল্লা, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২৪. এবাদুল গাজী (৭৫), ছাটা দেয়া, মা ফুলি বেগম ও বাবা ঝয়নুদ্দিন, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২৫. তরিকুল ইসলাম (৪৭), ডিঙে লায়ে/মাঝি, মা জবেদা বিবি ও বাবা ফয়েজ উদ্দীন গাজী, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২৬. মজিদ গাজী (৫০), আড়িঅলা, মা জবেদা বিবি ও বাবা ফয়েজ উদ্দীন গাজী, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২৭. সামসুর মোল্লা (৬৭), বারছাটা মৌয়াল, মা মুক্ত বিবি ও বাবা মোলাম্বী মোল্লা, হরিনগর মোল্লাপাড়া, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ জানুয়ারি ২০১১

১২৮. আজগর আলী শেখ (৫০), কাটনি বাউলে, মা ভানু বিবি ও বাবা মসলেম শেখ, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১২৯. মহসিন গাজী (৪৫০), মৌয়াল, মা মর্জিনা বেগম ও বাবা জহর আলী গাজী, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩০. নজু জমাদ্দার (৬৫), মৌয়াল, মা বেলো বিবি ও বাবা আজিরুদ্দিন সমাদ্দার, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩১. লুৎফর আলী জমাদ্দার (৬৩), মৌয়াল, মা বেলো বিবি ও বাবা আজিরুদ্দিন সমাদ্দার, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩২. সাইদুল গাজী (৫২), মৌয়াল, মা তারা বিবি ও বাবা নভেল গাজী, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩৩. মোকসেদ গাজী (৪৭), মৌয়াল, মা জয়গুন বিবি ও বাবা মুনসুর গাজী, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩৪. সাবুদ গাইন (৫০), কাটনি, মা ফুলজান বিবি ও বাবা হযরত আলী গাইন, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩৫. আবদুল বারিক গাজী (৭৫), মৌয়াল, মা তারামন বিবি ও বাবা মোহর আলী গাজী, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩৬. মজিদ সর্দার (৫২), মৌয়াল, মা গুনা বিবি ও বাবা মান্দার সর্দার, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩৭. শহীদুল ইসলাম মোড়ল (৩৬), কাটনি বাউলে, মা আমেনা বিবি ও বাবা মুনসুর মোড়ল, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৩ জানুয়ারি ২০১১

১৩৮. অজিত সর্দার (৭৫), ডিঙি লায়ে মৌয়াল, মা দুর্গা রানী ও বাবা যতীন্দ্রনাথ সর্দার, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৩৯. মন্টুরঞ্জন জোয়ারদার (৪০), কাটনি বাউলে, মা রেণুকাবালা জোয়ারদার ও বাবা গীরেন্দ্রনাথ জোয়ারদার, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪০. সুভাষ মণ্ডল (৫০), মৌয়াল, মা ভারতী রানী ও বাবা সুধন্য মণ্ডল, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪১. আবদুল আলিম মোল্লা (৩৫), মৌয়াল, মা মমেনা বেগম ও বাবা ছবেদ আলী, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪২. পাতিরাম মণ্ডল (৬০), আড়িঅলা, মা বৃন্দেরানী মণ্ডল ও বাবা অনন্ত মণ্ডল, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪৩. হরিপদ মণ্ডল (৫৬), আড়িঅলা, মা বৃন্দেরানী মণ্ডল ও বাবা অনন্ত মণ্ডল, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪৪. সুবল চন্দ্র মণ্ডল (৭০), বাউলে, মা ময়না রানী মণ্ডল ও বাবা উপেন মণ্ডল, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪৫. শাহাবাজ গাজী (৫৫), বারছাটা বাউলে, মা মতি বেগম ও বাবা হামে গাজী, চুনকুড়ি, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই ২০০৯

১৪৬. কওছার মোড়ল (৬৭), কাটনি বাউলে, মা সোনাভান বিবি ও বাবা মোহাম্মদ আলী মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১০

১৪৭. মাকফুর রহমান মোড়ল (৬৬), কাটনি বাউলে, মা সোনাভান বিবি ও বাবা মোহাম্মদ আলী মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১০

১৪৮. নওশের মোড়ল (৬৫), মাঝি, মা সোনাভান বিবি ও বাবা মোহাম্মদ আলী মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১০

১৪৯. মো. আনছার মোড়ল (৬৪), বারছাটা, মা সোনাভান বিবি ও বাবা মোহাম্মদ আলী মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১০

১৫০. সিরাজুল ইসলাম মোড়ল (৩৫), আড়িঅলা, মা মিনা বেগম ও বাবা কওছার মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১০

১৫১. রজব আলী মোড়ল (৬০), আড়িঅলা, মা সোনাভান বিবি ও বাবা মোহাম্মদ আলী মোড়ল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১০

১৫২. মহব্বত আলী (৫০), ছাটা দেওয়া বাউলে, মা খদেজা বিবি ও বাবা আরিফ গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৩. আমিরুল ইসলাম (৪৬), আড়িঅলা, মা আমেনা খাতুন ও বাবা জিয়াদ আলী গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৪. মো. ইব্রাহীম গাজী (৪০), ছাটা দেওয়া বাউলে, মা ফতেমা বিবি ও বাবা এলাহী বক্স গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৫. জামাল গাজী (৩৫), কাটনি বাউলে, মা শামসুন্নাহার বেগম ও বাবা রুহুল আমিন গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৬. মোসলেম আলী গাজী (৬৫), আড়িঅলা, মা পচি বিবি ও বাবা করিম বক্স, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৭. মজিবর রহমান (৫০), আড়িঅলা, মা টরি বিবি ও বাবা আবুল কাসেম গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৮. শুকুর আলী গাজী (৪৬), কড় ছাটা বাউলে, মা সুখমনি খাতুন ও বাবা আরশাদ আলী গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৫৯. আফসার আলী গাজী (৫৪), মৌয়াল, মা হামিদা বেগম ও বাবা মোহাম্মদ আলী গাজী, দক্ষিণ কদমতলা হরিনগর, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

১৬০. ননী দাসী (৬০), জেলে, মা ময়না দাসী ও বাবা মনু সর্দার, কলবাড়ি জেলেপাড়া, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০১১

চলতি আলাপে উপস্থাপিত সব তথ্য, উদাহরণ ও বিবরণের মালিক সুন্দরবনের বনজীবী জনগণ। এসব জ্ঞান ও তথ্যের কোনো একতরফা বাণিজ্যিক ব্যবহার মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘের কোনো ঘটনা ঘটে, তবে উপরিউক্ত প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাগণ আইনগতভাবে সুন্দরবন-সম্পর্কিত লোকায়ত জ্ঞানের অধিকার সুরক্ষায় আইনি লড়াই সংগঠনের অধিকার রাখেন।

বই আলোচনা

পুঁজিবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তন

খলিলউল্লাহ্

দিস চেঞ্জেস এভরিথিং : ক্যাপিটালিজম ভার্সেস দ্য ক্লাইমেট—নাওমি ক্লাইন, সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, নিউইয়র্ক, ২০১৪। পৃ. ৫৬৪। আইএসবিএন : ৯৭৮-১-৪৫১৬-৯৭৩৯-১

'Our economic system and our planetary system are now at war.'
Naomi Klein, *This Changes Everything*, p. 21.

ভূমিকা

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রতিবছর তার আগের বছরের রেকর্ড ভেঙে বেড়েই চলেছে। ২০১৬ সালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৮০ সালে তাপমাত্রা সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ২০১৬ সালই সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।[১] অবশ্য ২০০০ সালের পর থেকে প্রতিবছরই তার আগের বছরের রেকর্ড ভেঙে উষ্ণতম বছর হিসেবে হাজির হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বেড়েছে।[২] কিন্তু গত বছরের গবেষণার ফলাফল ধরে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অ্যান্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডের বরফ আগের ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে বেশি দ্রুততায় গলবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও আগের প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাবে।[৩] শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ধরা হয় শীর্ষ বিন্দু। তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে তার প্রভাব মোকাবিলা করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা যে তার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, সেটা শুধু বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদীরাই বলছিলেন না, বিশ্বব্যাংকই বলছিল, বৈশ্বিক তাপমাত্রা একুশ শতকের শেষ নাগাদ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাবে, ফলে চরম দাবদাহ

হবে, বৈশ্বিক খাদ্য মজুত কমে যাবে, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল, পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেলে জলবায়ু অভিযোজন সম্ভব নয়।[৪] ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে সম্পাদিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে, কিন্তু কোনোভাবেই যেন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রান্ত না হয়। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না এর ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে। কারণ, তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার যে লক্ষ্য, তা বরাবরই রাজনৈতিক পছন্দের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল থেকে শুরু করে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অব্দি পৃথিবীর সব দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানুষ ও পৃথিবীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এবং যথারীতি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার লক্ষ্যকে রাজনৈতিক হাস্যরসের অংশে পরিণত করেছে।

৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পৃথিবী কেমন হবে, তা নিশ্চিত করে এখনো বিজ্ঞানীরা কিছু বলতে পারছেন না। তবে সবচেয়ে 'সুখকর' চিত্রটাও হবে ধ্বংসাত্মক। জাতিসংঘের আন্তসরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের (আইপিসিসি) চতুর্থ ও পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, একুশ শতকের শেষভাগ নাগাদ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার কিংবা ২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং সামনের শতাব্দীগুলোতে আরও কয়েক মিটার বাড়ার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এ রকম অবস্থায় কিছু দ্বীপরাষ্ট্র পুরোপুরি ডুবে যাবে। যেমন মালদ্বীপ ও টুভ্যালু এবং অসংখ্য দেশ যেমন ইকুয়েডর, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ও উত্তরাঞ্চলের অনেকাংশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হবে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটবে।[৫] জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আসন্ন বিপদের অন্যতম ভুক্তভোগী বাংলাদেশ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। নাওমি ক্লাইন *দিস চেঞ্জেস এভরিথিং* বইয়ে সেই চ্যালেঞ্জটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এমন সব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেননি। মানবসভ্যতার অন্যতম বড় এই সংকট বিদ্যমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা খুব জরুরি। কারণ, এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করছে আমরা এই সংকট মোকাবিলা করে কোন পর্যন্ত যেতে পারব। এ বাস্তবতাই ক্লাইনের এই বইয়ের পাঠকে আবশ্যক করে তুলেছে।

কে এই নাওমি ক্লাইন?

নাওমি ক্লাইন একজন পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক, কলামিস্ট ও লেখক। তিনি বিখ্যাত মার্কিন *হারপার'স* ম্যাগাজিনের প্রদায়ক সম্পাদক এবং দ্বিসাপ্তাহিক *রোলিং স্টোন* ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক। তিনি *দ্য নেশন* পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখক, যেটা *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সিন্ডিকেট। উল্লেখযোগ্য আরও যেসব প্রকাশনায় তিনি লেখেন, তা হলো *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস, দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল, এল পাস, লাস্প্রেসো* এবং *দ্য নিউ স্টেটসম্যান*। জলবায়ু-সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক তৃণমূল আন্দোলন 350.org-এর তিনি পরিচালক সভার সদস্য। তিনি দ্য নেশন ইনস্টিটিউটের পুফিন ফাউন্ডেশন রাইটিং ফেলো এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের সাবেক মিলিব্যান্ড ফেলো। সাংবাদিকতায় অনেক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। কানাডার নভো স্কশিয়ায় অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব কিংস কলেজ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সিভিল ল প্রদান করেছে।

তাঁর আলোচিত বই *দিস চেঞ্জেস এভরিথিং* ২০১৪ সালে নন-ফিকশন ক্যাটাগরিতে হিলারি ওয়েস্টন রাইটার্স ট্রাস্ট পুরস্কার লাভ করে। ২০১৪ সালে সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় স্থান পাওয়া বইটি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ২০১৪ সালের উল্লেখযোগ্য ১০০টি বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া একই বছর প্রকাশিত বহু তালিকায় সর্বোত্তম বই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০টির বেশি ভাষায় অনূদিত এই বই পেন লিটেরারি অ্যাওয়ার্ডসের স্বল্প তালিকায় মনোনীত হয়েছে।

নাওমি ক্লাইনের প্রথম বই *নো লোগো: টেকিং অ্যাইম অ্যাট ব্র্যান্ড বুলিজ* আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার নির্বাচিত হয়েছিল। ২৫টির বেশি ভাষায় অনূদিত এই বইয়ের ১০ লাখের বেশি মুদ্রিত কপি বিক্রি হয়েছিল। *নিউইয়র্ক টাইমস* এই বইকে 'আন্দোলনের বাইবেল' বলে আখ্যায়িত করেছিল। ২০১১ সালে *টাইম ম্যাগাজিন* ১৯২৩ সাল থেকে প্রকাশিত ১০০টি সেরা বইয়ের তালিকায় এটিকে স্থান দিয়েছিল।

ক্লাইনের অন্যতম বিখ্যাত বই *শক ডকট্রিন: দ্য রাইজ অব ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম* বইটি ২০০৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের স্বীকৃতি পায়। ৩০টির বেশি ভাষায় প্রকাশিত বইটির ১০ লক্ষাধিক মুদ্রিত কপি বিক্রি হয়েছিল।

বই সম্পর্কে মন্তব্য

তিনটি অধ্যায় ও তেরোটি উপ-অধ্যায়ের বইটির সর্বমোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬৪। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার, তথ্যসূত্র ও নির্ঘণ্ট বাদে মূল বই ৪৬৬ পৃষ্ঠার। আলোচিত বইটি

সম্পর্কে প্রখ্যাত কয়েকজনের উক্তি তুলে ধরলে পাঠকদের কাছে এর গুরুত্ব বোঝা সহজ হবে।

অধ্যাপক রব নিক্সন *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর বই আলোচনায় বলেছেন, '*দিস চেঞ্জেস এভরিথিং* এমন এক প্রয়াস ও প্রভাবের বই, যা রিভিউ করা প্রায় অসম্ভব।...এটা নিঃসন্দেহে ক্লাইনের সবচেয়ে আশাবাদী বই। বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যা নিয়ে জলবায়ু প্রশ্ন গঠিত তার সব কটিকে তিনি একই সুতায় গেঁথেছেন। যার ফলাফল জন্ম দিয়েছে *সাইলেন্ট স্প্রিং*-এর পর সবচেয়ে আবশ্যক ও বিবাদপূর্ণ এই বইয়ের।'

গড অব স্মল থিংস-এর লেখক অরুন্ধতী রায় বলেছেন, 'নাওমি ক্লাইন তাঁর সূক্ষ্ম, ক্রুদ্ধ ও নির্ভুল চিত্তকে আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ও আশু প্রয়োজনীয় প্রশ্নে প্রয়োগ করেছেন।...আমি তাঁকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক রাজনৈতিক চিন্তকদের মধ্যে একজন মনে করি।'

ক্রিস বেন্টলি *শিকাগো ট্রিবিউন*-এ লিখেছেন, 'যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা একটা বিশ্বব্যাপী জাগরণের ডাক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সবাই বেশ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ক্লাইন বলেছেন, আমরা কোনো অগ্রগতি করতে পারিনি। কারণ, আমরা এমন সব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সমাধান আশা করছি, যারা আসলে এই সমস্যা সৃষ্টির পেছনে কলকাঠি নেড়েছে। ক্লাইনের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছে যে একটা গণজাগরণ এই উত্তরেরই অংশ।'

রয় স্ক্র্যান্টন *রোলিং স্টোন*-এ লিখেছেন, 'প্রভাবনীয় ও চমকপ্রদ...ক্লাইন পৃথিবীর ভাগ্যের ব্যাপারে এমন এক চূড়ান্ত যুদ্ধের কথা লিখেছেন যে হয় আমরা পৃথিবী ধ্বংসকারী পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে এর নিয়ন্ত্রণ পুনরায় ফিরিয়ে নেব, অথবা চেয়ে চেয়ে এর ভস্ম হয়ে যাওয়া দেখব।'

ওয়াশিংটন মান্থলি-তে ডি আর টাকার লিখেছেন, '*দিস চেঞ্জেস এভরিথিং* শুধু একটা বই নয়, শুধু একটা মুহূর্ত নয়, শুধু একটা আন্দোলন নয়, এটি একটি ন্যায়বিচারের অস্ত্র। এটি একটি বেঁচে থাকার পন্থা।'

পুঁজিবাদ বনাম জলবায়ু

নাওমি ক্লাইন এই বইয়ের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কেন জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করতে হলে মুক্তবাজার অর্থনীতির আদর্শকে পরিত্যাগ করতে হবে, বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। মূল কথাটা হলো, আমরা যদি মৌলিক পরিবর্তন নিজেরা না আনি, তাহলে মৌলিক পরিবর্তন আপনা থেকেই

আসবে। কিন্তু সেটা হবে ধ্বংসাত্মক। *দিস চেঞ্জেস এভরিথিং*-এ ক্লাইন বলতে চেয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্যাক্স বা স্বাস্থ্যসেবার মতো কোনো ব্যাপার না, যেটা আমরা ফাইলে গুছিয়ে রেখে দিয়ে দায় সেরে ফেলতে পারব; বরং এটি একটি বিপৎসংকেতের ডাক, যা নব্য উদারনীতিবাদের মতো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংশোধন করার কথা বলছে, যেটা অনেক দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছে।

খুবই নিপুণভাবে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ব্যাপক হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনাটা ক্রমবর্ধমান অসমতা কমানো, আমাদের ভঙ্গুর গণতন্ত্রকে নতুন করে সাজানো এবং আমাদের লুণ্ঠিত স্থানীয় অর্থনীতিগুলোর পুনর্গঠনের সবচেয়ে বড় সুযোগ। অসমতার প্রেক্ষাপটে ১৯৬১ সালে ফ্রাঞ্জ ফ্যানন তাঁর অনবদ্য অবদান *রেচেড্ অব দ্য আর্থ*-এ যেমনটা বলেছিলেন, 'দিগন্তজোড়া যে বিষয়টি এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সম্পদের পুনর্বণ্টন। এই বিষয়ের সমাধান মানুষকে করতেই হবে, ফলাফল যত ভয়ংকরই হোক না কেন।'[৬] বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম ২০১৭ সালের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে বৈশ্বিক অসমতাকে চিহ্নিত করেছে এবং ধনী-গরিবের মধ্যে আয় বৈষম্যকে ব্রেক্সিট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি করেছে[৭], যদিও বিশ্বের শক্তিশালী পুঁজিবাদী অর্থনীতির দেশগুলোই এই ফোরামের সদস্য। বৈশ্বিক অসমতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, আগে শুধু সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলো এই দাবি জানিয়ে এলেও, এখন পুঁজিবাদীরাও ক্রমবর্ধমান অসমতার ফলে আসন্ন বিপদকে অন্তত স্বীকার করে নিচ্ছে। ক্লাইন এই বইয়ে বলেছেন, এসব আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা পুরোনো ভুলগুলোকে শুধরে নিতে পারি। এটাকে ক্লাইন বলছেন 'দ্য আনফিনিশড বিজনেস অব লিবারেশন' (পৃ. ৪৫৯)।

এই বইয়ে ক্লাইন অনেক কিছুর মুখোশ খুলে দিয়েছেন, যেমন জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকারকারী গোষ্ঠীগুলোর আদর্শিক বেপরোয়া ভাব, ভবিষ্যৎ জিও ইঞ্জিনিয়ারদের রক্ষাকর্তাসুলভ বিভ্রম এবং বহুসংখ্যক পরিবেশবাদী সংগঠনের মর্মান্তিক পরাজয়। স্পষ্টভাবে তিনি দেখিয়েছেন, কেন বাজারব্যবস্থা জলবায়ু-সংকটের সমাধান করতে পারেনি এবং পারবে না; বরং আরও খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। চরমপন্থী এবং প্রতিবেশগত ধ্বংসাত্মক নিষ্কাশনবাদী পদ্ধতি এবং উন্মত্ত দুর্যোগ পুঁজিবাদের মাধ্যমে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশ ও জলবায়ুর ধ্বংসসাধন করতে থাকবে। গত সিকি শতাব্দীব্যাপী আমরা প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার শর্তসাপেক্ষে জলবায়ু ও পরিবেশ-সংকটের সমাধান করতে চেয়েছি এবং সেটা বিদ্যমান ব্যবস্থার ছাঁচে পৃথিবীকে ফেলে করতে চেয়েছি। কিন্তু কোনো

সমাধান আসেনি। ক্লাইন যেমনটা বলেছেন, 'The Results have been disastrous, leaving us all in a great deal more danger than when the experiment began.'(পৃ. ২৬)।

ক্লাইন বলতে চেয়েছেন, মানবিকভাবে জলবায়ু-সংকটের মোকাবিলা করার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন মানে চরম প্রায়শ্চিত্ত নয়; বরং একধরনের উপহার। এই উপহার ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকারগুলো রূপান্তরে এবং দীর্ঘদিনের পচে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘাকে সারাতে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেছেন, অনুপ্রেরণামূলক বিভিন্ন আন্দোলন এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় শুধু যে জীবাশ্ম জ্বালানি নিষ্কাশনের জমিন হিসেবে ব্যবহৃত হতে অস্বীকার করছে তা নয়, তারা পুনঃ উৎপাদনশীল অর্থনীতিও গঠন করছে।

তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে বইয়ের প্রথম অংশে ক্লাইন জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যারা জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করছে, তারা কীভাবে এই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিনিয়োগ করছে। তিনি দেখিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টির করপোরেট-সমর্থিত অস্বীকার এবং আর্থিক সংকট ও কৃচ্ছ্রসাধন নীতির সংমিশ্রণে পরিবেশ আন্দোলনকে লক্ষ্যচ্যুত করা হয়েছে। এই অস্বীকারের ইতিহাস এবং মুক্ত বাজার বাণিজ্যের আইন কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখছে, তার বর্ণনা রয়েছে। কীভাবে নিষ্কাশনবাদী মানসিকতা বড় বড় পরিবেশবাদী সংগঠন বা গ্রিন গ্রুপকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলেছে, যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ন্যাচার কনসারভেন্সি তার নিজের সংরক্ষিত জমিতে তেল উত্তোলন করছে। এসব সংরক্ষণবাদী সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদে রয়েছে বড় বড় কার্বন নির্গমনকারী বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির পরিচালকেরা। তাঁরাই এসব পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের জন্য অর্থ প্রদান করছেন। সুতরাং এসব সংগঠন এই ব্যবস্থা পরিবর্তনে অবদান রাখবে এমনটা আশা করা যায় না।

বেশির ভাগ মানুষ যে সমাধানের ওপর আস্থা রাখছে, যাকে ক্লাইন 'জাদুকরি চিন্তা' বা 'ম্যাজিক্যাল থিংকিং' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার বর্ণনা রয়েছে বইয়ের দ্বিতীয় অংশে। এর মূল কথা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রযুক্তিগত সমাধান। এই অংশে জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিতর্কিত বিষয়সহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রযুক্তিগত সমাধান সামনে নিয়ে আসার করপোরেট পরিকল্পনার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। ধনবান বিজ্ঞানী এবং তথাকথিত বিজ্ঞান পল্লবগ্রাহীরা (বিল গেটসসহ) জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে

এবং বায়ুমণ্ডলীয় সালফার ইনজেকশনের মাধ্যমে পৃথিবীকে শীতল করার পরিকল্পনা করছে। সহজতর ও কম ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি যেমন নতুন নতুন চরমপন্থী জ্বালানি উন্নয়নের রাশ টেনে না ধরে, 'সোলার রেডিয়েশন ম্যানেজমেন্ট'কে করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্ল্যান 'এ'। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর ব্যাপারে এই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো সমাধান দেবে না। এটা হয়তো তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে হিমবাহ গলে যাওয়ার সমাধান দিতে পারবে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান কার্বন নির্গমন রোধ করবে না, ফলে মহাসাগরগুলোর শোষণ বাড়তেই থাকবে এবং দ্রুত অম্লীকরণ ঘটতে থাকবে। সামুদ্রিক অম্লীকরণের ফলে ইতিমধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর মৃত দশা। এ ছাড়া সূর্যকে ঢেকে দিতে একবার বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন পদার্থ স্প্রে করা শুরু করলে আর থামা সম্ভব না। কারণ, তা থামিয়ে দিলে জমানো সব তাপ এক ধাক্কায় পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে।

ক্লাইন লিখেছেন, 'Once you start spraying material into the stratosphere to block the sun, it would basically be impossible to stop because if you did, all the warming that you had artificially suppressed by putting up that virtual sunshade would hit the planet's surface in one single tidal wave of heat, with no time for gradual adaptation.'(পৃ. ২৬০)।

জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফলে হয়তো ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রিসিপিটেশন অল্প পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আফ্রিকার নিরক্ষীয় এলাকায় মারাত্মক খরা দেখা দেবে। এ ছাড়া সূর্য ঢেকে দিলে ভূমির তাপমাত্রা কমে যাবে, ফলে দক্ষিণ এশিয়াসহ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে পড়বে। এই মৌসুমি বায়ু এসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের উৎস, যা এখানকার জীবিকার প্রধান উপায় কৃষিকে ধ্বংস করবে (পৃ. ২৬০)।

বইয়ের শেষ অংশটি অনেক বেশি আশাব্যঞ্জক এই কারণে যে এখানে ক্লাইন তৃণমূল পর্যায়ের পরিবেশ আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন। নব্য উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সংঘটিত আন্দোলনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসব আন্দোলনকে তিনি 'ব্লক্যাডিয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জীবাশ্ম জ্বালানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে হুমকিগ্রস্ত এসব প্রাকৃতিক এলাকায় আদিবাসীসহ সবাই নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে গিয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিবাদ করছে। মানুষ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ করছে, বুলডোজারের সামনে অকুতোভয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং তেল পাইপলাইনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে উঠছে প্রতিবাদ জানাতে। এর ফলে নিষ্কাশকেরা এ পর্যন্ত যা ইচ্ছা তা করতে পারলেও, এখন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। এসব

আন্দোলন সম্পর্কে ক্লাইন বলেছেন,

'The climate movement has yet to find its full moral voice on the world stage, but it is most certainly clearing its throat – beginning to put the very real thefts and torments that ineluctably flow from the decision to mock international climate commitments alongside history's most damned crimes.' (পৃ. ৪৬৪)।

অস্বীকারের পুঁজিবাদ

দিস চেঞ্জেস এভরিথিং জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়ে অস্বীকারের মনস্তত্ত্বে বেশি জোর দিয়েছে। বইয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে দক্ষিণপন্থী ধনবান থিংক ট্যাংক এবং লবি গ্রুপগুলো জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে কীভাবে প্রচুর অর্থ ঢালছে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন প্রভাবশালী মার্কিন থিংক ট্যাংক হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউটকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে করপোরেট কোম্পানিগুলোর পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেছে, এক্সনমোবিল, প্রভাবশালী মার্কিন ব্যবসায়ী গ্রুপ কোচ ব্রাদারস ও রক্ষণশীল প্রয়াত অর্থদাতা রিচার্ড মেলন স্কেইফের কাছ থেকে হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউট ১০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ গ্রহণ করেছে। এসব অর্থদাতাই বৃহদাকারে কার্বন নির্গমন করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কে আক্রমণ করার জন্য এক ব্যক্তি ৮০ লাখ ৬০ হাজার ডলার দিয়েছে বলে হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউটের একটি ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিতে তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি সেই নথিতে (পৃ. ৪৫)। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রভাবশালী ব্রিটিশ পত্রিকা *দ্য গার্ডিয়ান* একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, যেসব গোষ্ঠী জলবায়ু বিজ্ঞান নিয়ে সন্দেহ ছড়াচ্ছে, তাদের মার্কিন ধনকুবেরদের একটি নেটওয়ার্ক প্রায় ১০ কোটি ২০ লাখ ডলার অর্থ প্রদান করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞান নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং যদি এটা নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে মানুষের বসবাসের এই পৃথিবী বদলে যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সব সময়ই দ্ব্যর্থবোধক থেকেছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির মতো ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির যে অর্জন, সেটুকুও এত দিন পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

ক্লাইন এই বইয়ে বলেছেন, তিনি ২০০৭ সালে *শক ডকট্রিন* নামের বইয়ে করপোরেট এলিটরা কীভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রান্তিক অবস্থানে *ঠেলে* দিয়েছে, তা তুলে ধরেছিলেন। সেখানে পরিবেশ ও সামাজিক ধ্বংসসাধন করে চলা নব্য উদারনীতিবাদের নীতির সমালোচনা করেছেন তিনি।

শক থেরাপির মাধ্যমে নব্য উদারনীতিবাদ তার নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে, যা স্বাভাবিক সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই দুর্যোগের মাধ্যমে এমন একটা অবস্থা সমাজে তৈরি হতে হয়, যখন মানুষের সামনে সেসব নীতি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। এটাকেই ক্লাইন দুর্যোগ পুঁজিবাদের উত্থান (দ্য রাইজ অব ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জলবায়ুসহিষ্ণু ফসলের বীজে ২৬১টি স্বত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ৮০ শতাংশই পেয়েছে বিতর্কিত মনসান্টো, সিনজেনটাসহ মাত্র ছয়টি বড় কৃষি ব্যবসায়ী কোম্পানি। সুপারসাইক্লোন স্যান্ডির ফলে হালকা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আবাসন নির্মাণের জন্য নিউজার্সির রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো লাখ লাখ ডলার পেয়েছে, যদিও হারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানার পর যেসব আবাসন এসব কোম্পানি তৈরি করেছে, তা সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এখনো এক দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে। ক্লাইনের মতে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে বেসরকারীকরণ করা এবং দুর্যোগ থেকে মুনাফা বের করার এই বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থা তৈরিই হয়েছে এই কাজ করার জন্য (পৃ. ৯)।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নেওয়া বেশির ভাগ প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সাধারণত বলা হয়, এগুলো পরিবেশের ক্ষতি করবে না বা খুব কম ক্ষতি করবে। প্রকৃতির রেজিলিয়েন্স বা সহিষ্ণুতা অনেক বেশি এবং একটু-আধটু ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে বলে প্রশংসা করা হয়। কিন্তু সহ্য ক্ষমতা থাকলেই কাউকে অত্যাচার করতে হবে? কোনো প্রাণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আর সংগ্রাম করে টিকে থাকা কি এক? স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেখানে তার পুনঃ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সংগ্রাম করে টিকে থাকা খুব বেশি হলে শুধু তার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে। ক্লাইন একটি পরিচ্ছেদে লিখেছেন, রাইট টু রিজেনারেট বা পুনর্জন্মের অধিকার নিয়ে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'Just because biology is full of generosity does not mean its forgiveness is limitless. With proper care, we stretch and bend amazingly well. But we break too- our individual bodies, as well as the communities and ecosystems that support us.' (পৃ. ৪৪২)।

বইয়ের সীমাবদ্ধতা

জন গ্রে *দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় ক্লাইনের প্রশংসা করেছেন সময়ের সেরা বইটি উপহার দেওয়ার জন্য। তবে কয়েকটা জায়গায় ক্লাইনের বইয়ের সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সব দোষ করপোরেট এলিটদের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নয়, কারণ পুঁজিবাদের উত্থানের আগেও

পরিবেশের ধ্বংসসাধন করা হয়েছে। ক্লাইন নিজেই তাঁর বইয়ে বিয়ন্ড এক্সট্রাকটিভিজম পরিচ্ছেদে বলেছেন, মানুষের ক্রিয়াকর্ম কয়েক শতক আগে থেকেই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটিয়ে চলছিল। 'We started treating the atmosphere as a waste dump when we began using coal on a commercial scale in the late 1700s and engaged in similarly reckless ecological practices well before that.' এ ছাড়া কেন্দ্রীয়-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাও সে তুংয়ের চীনেও নিষ্কাশনবাদী মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে বিংশ শতকের সবচেয়ে বড় ও জঘন্যতম পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছিল।

পরিবেশ-সংকটে অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভূমিকাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত না করার সমালোচনা করেছেন জন গ্রে। তিনি মনে করেন, নিষ্কাশনবাদী মডেল শুরুই হয়েছিল কৃষি আবিষ্কারের ফলে। আর এর উদ্দেশ্য ছিল বাড়তি জনসংখ্যার চাপকে মোকাবিলা করা। কিন্তু জন গ্রের এই সমালোচনা বইয়ের মূল আবেদনের সঙ্গে মানানসই নয় বলে মনে হয়েছে। ক্লাইনের এই বই জোর দিয়েছে পরিবেশ আন্দোলনের ওপর। আর এই আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যত সম্ভব নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির থাকার ওপর আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়ে গণজাগরণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে নির্দিষ্ট বিষয়ে স্থির থাকাটাই কাম্য।

জন গ্রে আরও বলেছেন, ক্লাইন বিদ্যমান পুঁজিবাদের সমালোচনা করলেও বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী হতে পারে, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। শুধু তৃণমূল পর্যায়ে কীভাবে এসব পরিবেশ ধ্বংস ও শোষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছে, তার কথা বলেছেন। এখানেও বলা যায়, বিদ্যমান সমস্যাকে চিহ্নিত না করে তার বিকল্প বের করা সম্ভব নয়। নিষ্কাশনবাদী এই ব্যবস্থার শোষণবাদী আচরণে শুধু মানুষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও যে বিপর্যস্ত, তার একটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ ক্লেইনের এই বই। সেখান থেকে এর সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থার আলোচনা আসতে পারে।

জন গ্রের এসব সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল ক্লাইনের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করা। তবে ক্লাইন যেসব বিষয় তুলে এনেছেন, সেগুলোর সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করেননি।

শেষ কথা

পুঁজিবাদ ও পৃথিবীর মধ্যে চলমান যুদ্ধ জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। যুদ্ধ চলছে এবং পুঁজিবাদ বিজয়ী হচ্ছে প্রতিবার। জাতিসংঘের জলবায়ু

সম্মেলনগুলোয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য রাষ্ট্রগুলো কার্বন নির্গমন কমাতে আগ্রহী হয় না। উন্নত রাষ্ট্রগুলো বিশ্বব্যবস্থায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে যেমন প্রবৃদ্ধি কমাতে চায় না, তুলনামূলক গরিব রাষ্ট্রগুলো যারা আবার জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী, তারা ধনী দেশগুলোর সমান পরিবেশদূষণ না করে থামবে না বলে গোঁ ধরে আছে। কারণ, প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে পরিবেশদূষণ করতে হবে বলেই তারা বিশ্বাস করে। এর ফলে মূল সমাধানে জোর দেওয়া সম্ভব হয় না। আসল সমাধান হলো জলবায়ু ন্যায়বিচার, যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দোহাই দিয়ে কার্বন নির্গমন করে চলা উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও প্রযুক্তি ধনী দেশগুলো থেকে স্থানান্তর নিশ্চিত হবে। যে জন্য বলিভিয়ার জলবায়ু আলোচনাকারী এঞ্জেলিকা নাভারো ল্যানোস বলেছেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে একটা মার্শাল প্ল্যান দরকার[৮] এবং এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের বিশ্ববীক্ষার মৌলিক পরিবর্তন দরকার, যেটাকে ক্লাইন বলছেন, '…a worldview will need to rise to the fore that sees nature, other nations, and our own neighbors not as adversaries, but rather as partners in a grand project of mutual reinvention.' (পৃ. ২৩)। পৃথিবীর অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহলে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কীভাবে, সে ব্যাপারে কারও কোনো মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা আর কবে স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাব, যেখানে পারস্পরিক দোষারোপ নয়, প্রাধান্য পাবে অসংখ্য প্রাণের আধার এই পৃথিবী? আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা দুই বছর আগে বলেছিল, আমরা যদি কার্বন নির্গমনের লাগাম টেনে ধরতে না পারি, তাহলে ২০১৭ সালেই শেষ বছর, যার পরে আর কোনো কার্বন নির্গমন করা সম্ভব নয়। জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর অর্থনীতির এটাই হবে শেষ বছর। কারণ, কার্বন বাজেটিংয়ের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কার্বন নির্গমনের সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা ২০১৭ সালেই শেষ হয়ে যাবে। যার মানে হলো, পৃথিবীর ধ্বংসসাধন বন্ধ করতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর সব কলকারখানা বন্ধ করে দিতে হবে, যা অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।[৯] কিন্তু বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৃথিবীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেই বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

২০১৫ সালে সম্পাদিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তিকে বিশ্বের প্রথম সফল জলবায়ু চুক্তি বলা হচ্ছে। তবে প্যারিস চুক্তির সাফল্য নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। রাষ্ট্রগুলো কতটুকু তাদের প্রতিশ্রুতি রাখবে, তা সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছি আমরা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের বিজয় সে অর্জনকে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ। বিদ্যমান অর্থনৈতিক

ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান যে কত বেশি বিপন্ন, তার উদাহরণ হলো প্যারিস চুক্তিকে ছুড়ে ফেলার হুংকার। ট্রাম্প শুধু এই হুংকার দিয়েই থেমে নেই, তিনি ইতিমধ্যে মার্কিন পরিবেশ প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ বা ইপিএর নীতি পরিবর্তন করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ইপিএর ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছেন।[১০] এর প্রধান করা হয়েছে তাঁর নীতির সমর্থক রক্ষণশীল স্কট প্রুইটকে, যিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে সন্দিহান। শুধু তা-ই নয়, প্রুইট কার্বন নির্গমনকারী তেল-গ্যাস উৎপাদকদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। যার ফলে, পরিবেশ দূষণকারী এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে তিনি কতটুকু ব্যবস্থা নেবেন সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ রয়েছে।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে, বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার না হলে জলবায়ু প্রশ্নে আমরা কোনো স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে পারব না। মাঝেমধ্যে কিছু আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ নেওয়া হবে, কিন্তু তারপরেই ট্রাম্পের মতো কোনো ঝড় এসে সেসব পদক্ষেপকে চূর্ণ করবে নিমেষেই। এর ফলে ফ্রেডরিক জেমসন যে প্রচলিত বিশ্ববীক্ষার কথা বলেছিলেন যে 'পুঁজিবাদের সমাপ্তি কল্পনা করার চেয়ে পৃথিবীর সমাপ্তি কল্পনা করা সহজ', তা আরও দৃঢ় হতে থাকবে।

তথ্যসূত্র

১. 'NASA, NOAA Data Show 2016 Warmest Year on Record Globally,' *National Aeronautics and Space Administration*, January 18, 2017. Can be accessed at https://www.giss.nasa.gov/research/news/20170118/

২. Tim Folger, 'Oceans Will Rise Much More Than Predicted, NASA Says,' *National Geographic*, August 27, 2015. Can be accessed at http://news.nationalgeographic.com/2015/08/150827-NASA-climate-oceans-seas-greenland/

৩. Chris Mooney, 'The alarming science driving much higher sea level projections for this century,' *The Washington Post*, March 30, 2016. Can be accessed at https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/03/30/the-alarming-science-behind-projections-of-much-higher-seas-in-this-century/?utm_term=.1c59209575ac

৪. Hans J. Schellnhuber et al., 'Turn Down the Heat: Why a 4^0C Warmer World Must Be Avoided,' A Report for the World Bank, November 2012, p. xviii.

৫. Working Group II contributions to the 4th and 5th Assessment Reports of the IPCC, both available at http://www.ipcc.ch/

৬. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, Translation from French by Richard Philcox, New York: Grove, 2004, p. 55.

৭. 'The Global Risks Report 2017,' World Economic Forum, can be accessed at https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017

৮. Angelica Navarro Llanos, 'Climate Debt: The Basis of a Fair and Effective Solution to Climate Change,' presentation to Technical Briefiing on Histotrical Responsibility, UNFCCC, Bonn, Germany, June 4, 2009.

৯. 'World Energy Outlook 2011,' *International Energy Agency*, p. 40.

১০. Valerie Volcovici**,** **'**Trump administration tells EPA to cut climate page from website: sources,' *Reuters*, January 25, 2017. Can be accessed at http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-epa-climatechange-idUSKBN15906G



প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনার তালিকা

১ম সংখা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১)

- কেন 'প্রতিচিন্তা'—**মতিউর রহমান ও বিনায়ক সেন**
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ও গণতন্ত্র— **নুরুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব—**নজরুল ইসলাম**
- ব্যাংক-ব্যবস্থা ও নৈতিকতাবোধ—**আকবর আলি খান**
- দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা ও জাতীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা—**আহমেদ কামাল**
- রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা—**আবুল মোমেন**
- কীভাবে আরম্ভ থেকে (ফের) শুরু করতে হয়—**স্লাভো জিজেক**
- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : আখ্যান ও বাস্তবতা (বই আলোচনা)—**সোহরাব হাসান**
- বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিবেক (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**

২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১)

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দুই ব্যক্তির ছায়া—**মিজানুর রহমান খান**
- একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ—**এম এম আকাশ**
- বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—**এম হুমায়ুন কবির**
- ছিটমহলের মানুষ : রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত—**মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী**
- সামাজিক ইতিহাসের আকর : 'বেগম' পত্রিকা—**মালেকা বেগম**
- বালুচদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিজেঞ্জোর আত্মানুসন্ধান (বই আলোচনা) —**সোহরাব হাসান**
- বাংলাদেশের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট (বই আলোচনা)—**ইফতেখার ইকবাল**

৩য় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২)

- আমাদের কালে বৈষম্য—**আজিজুর রহমান খান**
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ—**আলী রীয়াজ**
- নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের চাবিকাঠি—**নজরুল ইসলাম**
- দেশভাগের আগে—**আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার**
- চল্লিশ বছর ধরে : স্মৃতি ও ন্যায়বিচার—**ইয়ান মার্টিন**
- পাকিস্তান ও জিন্নাহ : গোড়ায় গলদ (বই আলোচনা)—**হাসান ফেরদৌস**
- আবেগ ও বিশ্বরাজনীতি (বই আলোচনা)—**বদরুল আলম খান**

৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩)

- মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান (১৭৮৪-১৮৩০)—**সিরাজুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?—**মির্জা হাসান**
- খনার বিজ্ঞান-দর্শন—**পাভেল পার্থ**
- প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শূদ্র সম্প্রদায়—**রাহমান চৌধুরী**
- 'সওগাত' ও আমার জীবনকথা—**মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাক্ষাৎকার**
- কর্মী থেকে নেতা : উত্তরণের অসমাপ্ত কাহিনি (বই আলোচনা)—**আবুল মোমেন**

৫ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩)

- গণতন্ত্র, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট —**হোসেন জিল্লুর রহমান**
- রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত—**আল মাসুদ হাসানউজ্জামান**
- গণজাগরণ মঞ্চ : আত্মপরিচয়ের পুনঃ অনুসন্ধান—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
- বাঙালি পল্টন ও তৎকালীন নারীসমাজ—**মুহাম্মদ লুৎফুল হক**
- ফুটপাতের চটি বই ও 'মাঝারি' গরিবের আত্মপরিচয়—**সুমন রহমান**
- আমার সাংবাদিকতা জীবন, দেশভাগ ও তৎকালীন সমাজ —**আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাক্ষাৎকার**
- মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন (বই আলোচনা)—**মুনির-উজ-জামান**
- পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা বদ্বীপের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস (বই আলোচনা)—**আজিজুল রাসেল**

৬ষ্ঠ সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪)

- বাঙালি জাতীয়তাবাদ : চার দশক পর—**বদরুল আলম খান**
- ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা (১৭৮৫-১৮৩০)—**সিরাজুল ইসলাম**
- বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো —**বার্ট সুইকেন্স ও আইনুল ইসলাম**
- তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা—**সাজেদুল আউয়াল**
- উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা : প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা—**মিজানুর রহমান খান**
- কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনী বা ইতিহাসের পুনরুল্লেখ (বই আলোচনা) —**সোহরাব হাসান**
- বাঙালি এক ইতিহাসবিদের আত্মকথনে সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতি (বই আলোচনা)—**মোশারফ হোসেন**

৭ম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৪)

- বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে—**বদরুল আলম খান**
- নবধারার নাগরিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ—**মহিউদ্দিন আহমদ**
- গণমুখী জাতীয় আর্থরাজনৈতিক কৌশলপত্রের সন্ধানে একটি দলনিরপেক্ষ অনুসন্ধান—**হায়দার আলী খান**

- বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি বিশ্লেষণ—**খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও ফারজানা সেহরীন**
- আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক : একটি মূল্যায়ন **—রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস**
- মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান (বই আলোচনা)—**এ এস এম আলী আশরাফ**
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভূরাজনীতি ও বিস্মৃত গণহত্যা (বই আলোচনা) **খলিলউল্লাহ্**

৮ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪)

- সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা—**আকবর আলি খান**
- বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও 'অন্যের' ভাবমূর্তির ধারণা—**ইমতিয়াজ আহমেদ**
- গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
- বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ **—পাভেল পার্থ**
- মওদুদ আহমদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি মূল্যায়ন (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**
- 'যদি ইসলাম পৃথিবীতে না থাকত?' (বই আলোচনা)—**আসজাদুল কিবরিয়া**

৯ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪)

- প্রপাগান্ডা ও গণমাধ্যম : যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ **—সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হক**
- পলাশীর যুদ্ধ ও সম্পদ পাচারের সূত্রপাত—**এম মোফাখখারুল ইসলাম**
- মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ও গ্যাসপ্রবাহ **—ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল**
- মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা 'আমার জীবন-কথা ও সময়'—**সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম**
- রাজনীতিতে দায়িত্বশীলতা ও গণতন্ত্রের শর্ত (বই আলোচনা)—**হাসান শফি**
- বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট (বই আলোচনা)—**আজিজুল রাসেল**

১০ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫)

- বাংলাদেশে নতুন ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল—**আলী রীয়াজ**
- নজরদারির পুঁজিবাদ : একচেটিয়া-ফিন্যান্স পুঁজি, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স ও ডিজিটাল যুগ—**জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি**
- স্বামীর প্রবাসকালে গ্রামীণ বাংলার নারী : ক্ষমতা, শক্তি ও অধীনতার ধারণার পুনর্ব্যাখ্যা—**সৈয়দা রোযানা রশীদ**
- লিসবনে শহীদ মিনার : পর্তুগালপ্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্মৃতি ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ—**হোস ম্যাপ্রিল**
- মার্কিন দলিলপত্রের সাক্ষ্য : কেন বুদ্ধিজীবী হত্যা? কীভাবে জামায়াত জড়িত? **—মিজানুর রহমান খান**
- 'অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন' (বই আলোচনা)—**আসজাদুল কিবরিয়া**

- কিসিঞ্জারের বয়ানে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প (বই আলোচনা) **—রেজওয়ান মাসুদ**

১১তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৫)

- বাংলাদেশ : যেখানে গণতন্ত্রের রং ধূসর—**বদরুল আলম খান**
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য—**লাইলুফার ইয়াসমিন**
- গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের প্রতিক্রিয়া **—সাবেকুন নাজমুন**
- ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন—**আবদুর রাজ্জাক**
- ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ **—আনোয়ারা বাহার চৌধুরী**
- জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা—**ইফতেখার ইকবাল**
- বাগান থেকে মহাকাশ—**মীজান রহমান**

১২তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫)

- একবিংশ শতকে পুঁজি : মার্ক্স থেকে পিকেটি—**এম এম আকাশ**
- ছিটমহল বিনিময় : পেছনের কাহিনি ও সামনের চ্যালেঞ্জ **—মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী**
- ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতভাগ : জিন্নাহ ও গান্ধীর ভূমিকা—**রাহমান চৌধুরী**
- নেপালের 'মাধেস আন্দোলন' : পূর্বাপর—**আলতাফ পারভেজ**
- অপ্রত্যাশিত কিউবা—**এমিলি মরিস**
- ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ও উত্থান (বই আলোচনা)—**আইরিন খান**

১৩তম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫)

- ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি—**নুরুল ইসলাম**
- পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা সম্পদ : প্রামাণ্য মূল্যায়ন **—আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন**
- একাত্তরের সত্তা : যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ টাওয়ার হ্যামলেটকে তাড়িয়ে বেড়ায়—**সারাহ গ্লিন**
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রেকর্ড করা হয় ১৯৭০ সালের আগেই **—আবদুল আহাদ**
- ১৮৭৪-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলা-আসামের সীমান্তে অদলবদল এবং সিলেটের গণভোটের ইতিহাস—**আশফাক হোসেন**
- বাংলাদেশে কিশোরীদের যৌন হয়রানির প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা **—পাপড়ীন নাহার, মার্টিন ভ্যান রিওয়্যাক, রিয়া রিইস**
- স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও গণতন্ত্র—**মিজানুর রহমান খান**
- ভয়ের সংস্কৃতির শিকড়-সন্ধান (বই আলোচনা)—**রেজাউল হক**

১৪তম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬)

- দরিদ্রবান্ধব স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ নেতাদের রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ **—মির্জা হাসান ও সোহেলা নাজনীন**

- দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ—**এম এম আকাশ**
- দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষা : প্রাক-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক আমল **—আলী রীয়াজ**
- বিশ্ব স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ—**শাহাদুজ্জামান**
- মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ : মিথ না রিয়েলিটি?—**আরিফ রহমান**
- জেনোসাইড বাংলাদেশ : আপেক্ষিক বনাম তথাগত দৃষ্টিভঙ্গি—**মো. ফজলে রাব্বি**
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত—**গোলাম মুস্তাফা**

১৫তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৬)

- দুর্নীতি, দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের চালকেরা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ—**নুরুল ইসলাম**
- নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা : বাংলাদেশের সমুদ্র প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এক নিম্নবর্গীয় বয়ান—**পাভেল পার্থ**
- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ—**মোহাম্মদ আতিক রহমান**
- ঢাকায় বাংলাদেশি নবীন এবং শিক্ষিতদের মধ্যে অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা **—অ্যালেন ব্যাল**
- কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে—**আবুল মোমেন**
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসমূলে প্রতিবাদ—**আসজাদুল কিবরিয়া**
- মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড : অমীমাংসিত বিষয় ও মানবতার দায় **—মো. ফজলে রাব্বি**

১৬তম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬)

- একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার **—হায়দার আলী খান**
- নব্য উদারনীতিবাদের ত্রুটিগুলো কীভাবে সারাই করা সম্ভব—**জেসন হিকেল**
- বাংলাদেশে গণতন্ত্র : এলিট বনাম জনগণ—**বদরুল আলম খান**
- সেক্যুলারিজমের রূপ ও রূপান্তর—**আলী রীয়াজ**
- অজয় রায়ের সাক্ষাৎকার : যদি কোনো মতবাদে বিশ্বাস থেকে থাকে মার্ক্সবাদের ওপর বিশ্বাস অবশ্যই আছে—সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মতিউর রহমান**
- বিশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ : আন্তর্দেশীয় থেকে স্বদেশীয় জনপরিসর—**জাকির হোসেন রাজু**
- আইএসের উত্থান ও বিশ্বরাজনীতি—**আইরিন খান**

১৭তম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬)

- জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি—**বদরুল আলম খান**
- শেখ মুজিবুর রহমান : একটি ঝড় ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়—**জন পি থর্প**
- বাংলার ডায়েরি—**বরিস কালিয়াগিন ও ভ্লাদিমির স্কসিরিওভ**
- লীলা নাগ ও তাঁর জীবনসাধনা—**মালেকা বেগম**
- এক তরুণ শিক্ষকের অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার গল্প—**মহিউদ্দিন আহমদ**
- পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ—**মো. ফজলে রাব্বি**

লে খ ক প রি চি তি

আকবর আলি খান

অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক। ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*অন্ধকারের উৎস হতে* (পাঠক সমাবেশ, ২০১০); *পরার্থপরতার অর্থনীতি* (ইউপিএল, ২০০০); *ডিসকভারি অব বাংলাদেশ: এক্সপ্লোরেশন ইনটু ডিনামিকস অব এ হিডেন ন্যাশন* (ইউপিএল, ১৯৯৬); *Some Aspects of Peasant Behavior in Bengal, 1890–1914: A Neoclassical Analysis* (Asiatic Society of Bangladesh, 1982); *আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি* (প্রথমা, ২০১৩); *চাবিকাঠির খোঁজে: নতুন আলোকে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'* (প্রথমা, ২০১৪); *অবাক বাংলাদেশ: বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি* (প্রথমা, ২০১৭)।

নুরুল ইসলাম

একজন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে স্নাতক নুরুল ইসলাম ১৯৫৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে (যা পরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে পরিণত হয়) পরিচালক পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন। ১৯৭৫ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো এবং ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সহকারী মহাপরিচালক ছিলেন। বর্তমানে অধ্যাপক ইসলাম ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (IFPRI) একজন উপদেষ্টা ও ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ২৫টি বই প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন জার্নাল ও বইয়ে অসংখ্য নিবন্ধ, গবেষণা ও নীতিপত্র লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *Development Planning in Bangladesh : A Study in Political Economy* (1979, reprinted in 1993); *Foodgrain Price Stabilization in Developing Countries : Issues and Experiences in Asia* (1996); *Making of a Nation Bangladesh : An Economist's Tale* (2003); *Looking Outward : Bangladesh in the World Economy* (2005); *Corruption, Its Control and Drivers of Change : The Case of Bangladesh* (2016).

ম্যাথিল্ড ম্যাইটরট

ইউনিভার্সিটি অব বার্থ, যুক্তরাজ্যের সামাজিক এবং নীতিবিজ্ঞান বিভাগের টিচিং ফেলো। তিনি ২০১৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তাঁর পিএইচডির বিষয় ছিল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক কার্যসম্পাদন সক্ষমতা। আগ্রহের বিষয়গুলো হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ শিল্প, সিভিল সমাজ, সামাজিক সুরক্ষা, চরম দারিদ্র্য এবং নীতি প্রণয়ন-প্রক্রিয়া।

রাশেদ রাহম

তরুণ গবেষক এবং অনুবাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। *ম্যাসিক লিগ্যাল ইস্যুর* নির্বাহী সম্পাদক। আগ্রহের বিষয় হচ্ছে আইন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান এবং উচ্চশিক্ষা।

পাভেল পার্থ

লেখক ও গবেষক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—মধুপুরের প্রাণবৈচিত্র্য, অরণ্যের লড়াই, খাদ্য-লঙ্ঘন ও লড়াই, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা, কৃষকের বীজ অধিকার ইত্যাদি। ছোট কাগজ, জার্নাল ও নানান স্থানীয় প্রকাশনাসহ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বারসিক নামক লোকজ্ঞানবিষয়ক একটি বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

খলিলউল্লাহ্

লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে (বিসিএএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে *প্রতিচিন্তার* সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গবেষণার বিষয় রাজনৈতিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভূরাজনীতি, সামাজিক উন্নয়নসহ সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তার* গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১